Dated, Agartala, the th March, 1986.

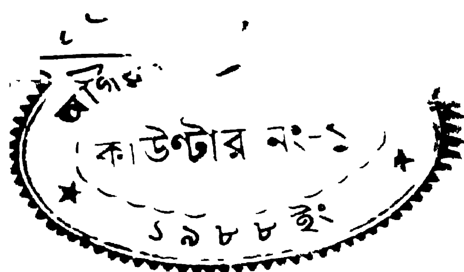
SUB:-Release Order.

Shri/Smt. ____

Head Librarian/Senior Librarian/Librarian/Library Assistant/ Sorter, who reported here on ___________th March,1986(Fore/After Noon) and participated in the 6th Library Seminar on 19th & 20th March,1986 is hereby released to-day the __________th March,1986(Fore/After Noon) from this end to join his/her duties.

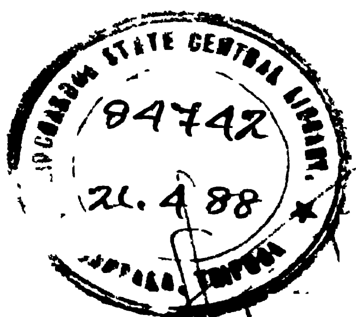
D I R E C T O R,
6th Library Seminar Organising Committe
Agartala,Tripura.

জলসাঘর



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থ পরিচিতি / কার্তিক লাহিড়ী





সুবর্ণরেখা

কলিকাতা

১৩৯৩

JALSAGHAR

a novel by Tarasankar Banerjee

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৮৪

মূল্য : কুড়ি টাকা

প্রচ্ছদপট ॥ সন্দীপ রায়

প্রকাশক ॥ ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ॥ পরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

পরম স্নেহাস্পদ

দুর্গাশঙ্কর ও পার্বতীশঙ্করের

করকমলে

সূচী

রায়বাড়ি	১
জলসাঘর	১৯
পদ্মবউ	৪২
ডাক-হরকরা	৫০
প্রতীক্ষা	৬৮
মধু মাস্টার	৭৮
তারিণী মাঝি	৯২
খাজাঞ্চিবাবু	১০৭
টহলদার	১১৪
ট্যারা	১২৫
রাখাল বাঁড়ুজ্জে	১৪০
নারী ও নাগিনী	১৫৭

গ্রন্থ পরিচিতি

প্রসঙ্গ : জলসাঘর / কার্তিক লাহিড়ী ১৬৫

রায়বাড়ি

১২৭০ সাল—ইংরেজী ১৮৬৩ সালের ঘটনা। সিপাহীযুদ্ধ সবে শেষ হইয়াছে। অগ্নি নিবিয়াছে, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ তখনও সম্পূর্ণরূপে বিকিরিত হয় নাই। দেশের লোকের অসি গিয়াছে, কিন্তু বাঁশের লাঠি তখনও বাঁশীতে পরিণত হয় নাই। তখন লোকে বাবরি চুল রাখিত, কিন্তু বব ছাঁটে নাই। জমিদার তখনও ভূস্বামী, এবং তাঁহাদের সে স্বামিত্বের সত্যকার অর্থ তাঁহারা বজায় রাখিয়াছিলেন।

রাজারামপুরের রায়বাড়ির তখন অসীম প্রতাপ। এখনও একটা কথা প্রচলিত আছে—রায়বাড়ির রাজ্যের মধ্যে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল পান করিত, দুর্দান্ত বাঘকেও নাকি হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রায়-বংশের চতুর্থ পুরুষ রাবণেশ্বর রায় তখন রায়বাড়ির একক উত্তরাধিকারী। ১০৯২ নম্বর লাট হুদা-শ্যামপুরের মাতব্বর প্রজারা আসিয়া সদরে কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল হুজুর, রক্ষা করুন।

হুদা-শ্যামপুরে দুর্দান্ত মুসলমান, বাগদী ও হাড়া লাঠিয়ালের বাস, এবং এখানকার সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন অধিবাসীরা কূট-কৌশলী, পাকা ষড়যন্ত্রী। আজ দুই পুরুষ তাহারা বিনা খাজনায় ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, পঞ্চাশ বৎসর কোন জমিদার এখানে পুণ্যাহ করিতে পারেন নাই। চার-পাচ ঘর জমিদারের হাত-ফের হইয়া অবশেষে হুদা-শ্যামপুর রাবণেশ্বর রায়ের হাতে আসিল। শেষ জমিদার আক্রোশভবে রাবণেশ্বর রায়কে ডাকিয়া পত্তনি বিলি করিলেন। রায় তাঁহার ইষ্টদেবী কালীমাতার সেবায়ত স্বরূপে সম্পত্তি পত্তনি গ্রহণ করিলেন। আজ পূর্ণ এক বৎসর বিরোধ চালাইয়া বোধ হয় ক্লান্ত হইয়াই প্রজারা আসিয়া রায়-দরবারে গড়াইয়া পড়িল।

প্রজারা সংখ্যায় ছিল চল্লিশজন। লাট শ্যামপুরের মধ্যে গ্রামের সংখ্যা ছত্রিশখানি—ছত্রিশখানি গ্রামের ছত্রিশজন মণ্ডল-প্রজা আসিয়াছিল; তাহার উপর সঙ্গে ছিল শ্যামপুরের কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জোতদার রাধানাথ দাস, আর ছিল ঘাঁটিতোড় গ্রামের মুসলমান প্রজাদের মুখপাত্র ওবেদার রহমান ও তিনু মিয়া। বেলা তখন অপরাহ্নেরও শেষ ভাগ, সন্ধ্যা হইতে বিশেষ বিলম্ব ছিল না। রায় সরকারের কাছারি তখন আবার দ্বিতীয় দফায় আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে তকমা-আঁটা হরকরা-চাপরাসীদের যাওয়া-আসার বিরাম নাই, লোকজনে কাছারি গিসগিস করিতেছে। শ্যামপুরের প্রজারা ইহার

পূর্বে কয়েক ঘর জমিদারের সহিত বিবাদ করিয়াছে এবং তাঁহাদের ঘায়েল করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা ছিলেন মধ্যশ্রেণীর জমিদার, এতবড় জমিদার শ্যামপুরের প্রজারা দেখে নাই। কাছারির পরিধি ও গাম্ভীর্য দেখিয়া তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল।

কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত রসিক লোক, সে উঁকি মারিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনাবশ্যকভাবে কাছাটা আর একটু সাঁটিয়া বসিল, কাছারিই বটে রে বাবা—কাছার অরি। কিন্তু হুজুর কই? শ্যামপুরের নির্দিষ্ট গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, হুজুর বসেন দোতলায়। সকলের দৃষ্টি আপনা হইতেই উপরে দোতলার জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল। সুদীর্ঘ অট্টালিকার দ্বিতলে সারি সারি জানালা, আবার ওপাশে নূতন ভারা বাঁধা রহিয়াছে—আরও ঘর তৈয়ারি হইতেছে। রায়-হুজুর শখ করিয়া নাচ-গান-মজলিসের জন্য প্রকাণ্ড একটি ঘর তৈয়ারি করাইতেছেন। প্রজারা সভয়বিস্ময়ে প্রত্যেক জানালার দিকে চাহিয়া তাহাদের কল্পনার মানুষটিকে খুঁজিতেছিল।

গোমস্তা বলিল, এ দোতলায় হ'ল সব নায়েব সেরেস্তা, নায়েববাবুরা বসেন এখানে। হুজুরের কাছারি এখান থেকে দেখা যায় না, ও-পাশে ফুলবাগানের সামনে—

ঠিক এই সময় একজন হরকরা আসিয়া কথায় বাধা দিল, গোমস্তাকে বলিল, নায়েববাবু ডাকছেন আপনাকে।

গোমস্তা চলিয়া গেল।

গুপ্ত হাসিয়া বলিল, দাসজী, দেশে বর্গী এসেছে, দুষ্টু ছেলেদের ঘুম পাড়াও—গোলমাল করলেই বিপদ।

রাধানাথ দাস চিন্তাকুল মুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাই দেখছি।

গুপ্ত এবার ওবেদার রহমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোবা তোবা বল চাচা, মুখে যে মাছি ঢুকছে! বলি, হাঁ করে দেখছ কি?

পিছন হইতে রতন মণ্ডল বলিল, বাহারের লক্কা কেটেছে কিন্তু দালানে গুপ্ত মশায়!

অপর একজন বলিয়া উঠিল, এ যে গোলকধাঁধা রে বাপু, ইদিকে দালান, উদিকে দালান—আড়ে দীঘে ওর নাই রে বাবা—হ-হ!

আসুন, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।—একজন সরকার আসিয়া তাহাদের সকলকে আহ্বান করিল।

গুপ্ত বলিল, আমাদিগে বলছেন?

আজ্ঞে হাঁ, আপনাদের ভার আমার ওপর, আমি কালীমায়ের দেবোত্তরের সরকার।—সরকার অগ্রসর হইল।

গুপ্ত কৃত্রিম ভয়ে বিহ্বলতার ভান করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ও দাসজী, কোথায় নিয়ে যাবে হে বাপু! গারদে, না, একেবারে –

বিরক্তিভরে বাধা দিয়া রাধানাথ দাস কহিল, চুপ কর গুপ্ত, সব সময়েই তোমার ইয়ে—হাঁ!

ওবেদার রহমান হাসিয়া বলিল, ভয় কি চাচা? আমাদের বাড়িও ঘাঁটি-তোড়, লাঠির ডগায় ঘাঁটি তোড়াই হ'ল আমাদের ব্যবসা। ভয় কি? ঘাঁটি ভেঙে তোমাকে পিঠে ক'রে নিয়ে পালাব।

কাছারি পার হইয়া রাধাগোবিন্দজীর মন্দির, তাহার পর জগদ্ধাত্রীর বাড়ি, তাহার পর একেবারে গঙ্গার কূলের উপরেই রায়চৌধুরীদের কালীবাড়ি। গঙ্গা যখন কূলে কূলে পাথার হইয়া উঠে, তখন কালীবাড়ির বাঁধা ঘাটের প্রশস্ত চত্বরের গায়ে গঙ্গার জল ছল-ছল করিয়া আঘাত করে। ভিতরে দক্ষিণমুখা মন্দিরের সম্মুখে সুবৃহৎ সুউচ্চ নাটমন্দির; নাটমন্দিরকে পরিবেষ্টন করিয়া তিন দিকে খিলানের বারান্দাযুক্ত সারি সারি একতলা ঘর। দক্ষিণ দিকে বারান্দার কোণে পাশাপাশি দুইটি ঘরের দরজা খোলা ছিল; খোলা দরজা দিয়া দেখা যাইতেছিল, ঘরে শতরঞ্জির উপর সাদা চাদর ধপধপ করিতেছে, এক দিকে সারি সারি বালিশ পড়িয়া আছে। ঘরের দরজার সম্মুখেই প্রকাণ্ড দুইটা জালায় জল ও বড় বড় ঘটি রাখিয়া দুইজন চাকর অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

সরকার বলিল, এইখানে আপনারা বিশ্রাম করুন। মুসলমান যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্যে ওপাশে ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরে জিনিসপত্র রেখে দিন।

আগন্তুকদের কেহ কোনও উত্তর দিল না, সকলে সবিস্ময়ে দেখিতেছিল ঠাকুরবাড়ি।

হাত-মুখ ধুইয়া নাটমন্দিরে উঠিয়া তাহাদের বিস্ময় বিপুল হইয়া উঠিল। শুধু বিস্ময় নয়, শ্যামপুরের দুর্দান্ত অধিবাসীদলের শরীর কেমন ছমছম করিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড নাটমন্দিরের অসাধারণ উচ্চতা সত্যই মানুষকে কেমন অভিভূত করিয়া ফেলে। তাহার উপর এতবড় নাটমন্দিরটার অভ্যন্তর-ভাগ তখন আধ-আলো, আধ-ছায়ায় যেন থমথম করিতেছিল। চোখের সম্মুখের অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটিয়া পরিবেষ্টনীর সম্পূর্ণ রূপ তাহাদের দৃষ্টিতে ধরা দিতেই তাহারা সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নাটমন্দিরের চারিপাশে থামের গায়ে নানা আকারের বলির

খড়্গ আলোকের অভাবে প্রভাহীন শাণিত রূপ লইয়া ঝুলিতেছিল। মন্দিরের ঠিক সম্মুখেই দক্ষিণে বামে সুবৃহৎ দুই যূপকাষ্ঠ।

দেবীমন্দিরের দ্বার তখন রুদ্ধ ছিল। রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখেই প্রণাম সারিয়া তাহারা আসিয়া বসার ঘরে আশ্রয় লইল। দুর্দান্ত ভয়ে ও আকুল চিন্তায় আচ্ছন্ন নির্বাক হইয়া সব বসিয়া রহিল।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রাধানাথ দাস বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল, কে রে বাপু, ফোঁস ফোঁস করছিস কে?

কেহ উত্তর দিল না। এই সময় একজন চাকর আলো লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সেই আলোয় দেখা গেল, এক কোণে বালিশে মুখ গুঁজিয়া প্রৌঢ় বিপিন মোড়ল ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছে। দাস দাঁত কিসকিস করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই চাকরটা বলিয়া উঠিল, হুজুর আসছেন। বলিতে বলিতেই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ঘরের ছাদের উপর রাবণেশ্বর রায়ের খড়মের শব্দ খট খট করিয়া কঠোর শব্দে বাজিতেছিল, সমস্ত ছাদটা সঞ্চারিত করিয়া একটা কম্পন অনুভূত হইতেছিল। দাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, ওঠ ওঠ সব, নজরের টাকা বার কর। গুপ্ত—গুপ্ত, শেখজীদের সব ডাক হে। আঃ, সব মাটি করলে।

বাহিরে নাটমন্দিরে তখন দেওয়ালগিরিতে ঝাড়-লণ্ঠনে সারি সারি বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রজারা সকলে সারি দিয়া নাটমন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির মুখে রায়-হুজুরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

রাবণেশ্বর রায় নামিতেছিলেন দোতলার সিঁড়ি বাহিয়া। নাটমন্দিরের আলোকমালার ছটার প্রাচুর্যে প্রজারা তাঁহাকে সভয়-বিস্ময়ে দেখিল। দীর্ঘাকার পুরুষ, খড়্গের মত তীক্ষ্ণ দীর্ঘ নাসিকা, আয়ত চোখ, সর্বাঙ্গের মধ্যে স্থূলতার এতটুকু চিহ্ন নাই, কিন্তু সিংহের মত বলিষ্ঠ দেহ—প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটি। বয়স প্রায় চল্লিশ। পরিচ্ছদ ও ভূষণের মধ্যে পরনে গরদের কাপড়, কাঁধে নামাবলী, অনাবৃত বক্ষে শুভ্র উপবীত ও রুদ্রাক্ষের মালা, দক্ষিণ বাহুতে সোনার তাগায় একটি মোটা রুদ্রাক্ষ, হাতের অনামিকায় নবরত্নের একটি আংটি।

হিন্দু প্রজারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, মুসলমান প্রজারা আভূমি নত হইয়া সেলাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠুং ঠুং শব্দ উঠিতেছিল নজরের টাকার।

রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথাকার প্রজা?

কর্তার পিছনে ছিল দেবোত্তরের নায়েব, সে উত্তর দিল, আজ্ঞে হুন্দা-শ্যামপুর

কালীমায়ের নতুন মহাল।

হুন্দা-শ্যামপুর ?

রাবণেশ্বর রায় ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তাঁহার কাঁধের নামাবলীখানা স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। নায়েব তাড়াতাড়ি সেখানা উঠাইয়া লইল। রায় গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তারা — তারা! তারপর ভ্রূক্ষেপহীন পদক্ষেপে নাটমন্দিরের উপরে উঠিয়া গেলেন। সে পদক্ষেপের তাড়নায় নজরের টাকাগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নায়েব দেখিয়া শুনিয়া নজরের টাকাগুলি গুনিয়া-গাঁথিয়া তুলিয়া লইল। ওদিকে তখন দেবী-মন্দিরের দ্বার খোলা হইয়াছে, প্রকাণ্ড কাঁসরখানায় ঘন ঘন শব্দে ঘা পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক কাঁশি শিঙা বাজিতেছিল। পবিত্র ষোড়শাঙ্গ ধূপের গন্ধে নাটমন্দির আমোদিত।

আরতি শেষ হইতেই প্রজারা নীরবে প্রণাম সারিয়া আবার আসিয়া ঘরে আশ্রয় লইল। সরকার আসিয়া আহ্বান করিল, আসুন আপনারা, মায়ের শীতলের প্রসাদ নিয়ে জল খাবেন আসুন।

নাটমন্দির হইতে ডাক আসিল, সরকার!

একজন খানসামাকে ও দেবীমন্দিরের পরিচারককে জলযোগের ব্যবস্থায় নিযুক্ত করিয়া সরকার তাড়াতাড়ি কর্তার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় বসিয়া জলযোগ করিতে করিতে প্রজারা শুনিল, কর্তা প্রশ্ন করিতেছেন, প্রজারা কতজন এসেছেন ?

আজ্ঞে, চল্লিশজন।

খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাছ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে।

কত ?

আজ্ঞে, দশ সের।

হুঁ। দুধ ?

সরকার এবার চুপ করিয়া রহিল। কর্তা আবার প্রশ্ন করিলেন, দুধের ব্যবস্থা হয়েছে ?

আজ্ঞে অবেলায় —। সরকার আর উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কর্তা বলিলেন, অতিথি তিথি মেনে আসে না, বেলা দেখে আসে না। যাও, বাড়িরদুধ নিয়ে এস।

সরকার যেন বাঁচিল, সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল। কর্তা আবার বলিলেন, গিন্নীর কাছে খবর নাও, লক্ষ্মীনারায়ণজীর দরবারে, মা-জগদ্ধাত্রীর দরবারে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না!

সরকার চলিয়া গেল। রায়-কর্তা জপমালা লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন – তন্ত্রমতে সন্ধ্যাতর্পণ জপ করিবেন।

নিস্তব্ধ নাটমন্দির। পরিচারক পূজারার দল নিস্তব্ধভাবে আনাগোনা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে মন্দির-অভ্যন্তর হইতে মোটা ভরাট গলায় রায়-কর্তা ডাকিতেছিলেন, তারা - তারা -

সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটি অকৃত্রিম আবেগ রনরন করিয়া বাজিতেছিল।

অনেকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সরকার ও শ্যামপুরের গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তী আসিয়া ডাকিল, উঠুন সব, খাবারের ঠাঁই হয়েছে।

গুপ্ত নিজে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, মরেছে রে, বেটা চাষারা সব মরেছে। নরম বালিশ মাথায় দিয়েছে, কি মরণ-ঘুমে

গোমস্তা চক্রবর্তী মৃদুস্বরে বলিল, চুপ চুপ, বাইরে হুজুর আছেন।

প্রজারা বাহিরে আসিয়া দেখিল, রায়-কর্তা নিজে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরনে এখন কোঁচানো মিহি থান-ধুতি, গায়ে গিলাকরা পাঞ্জাবি, পায়ে চটি। সকলে মাথা হেঁট করিয়া খাইতে বসিল।

কর্তা বলিলেন, কি হে, হুব্দা-শ্যামপুরের সব বড় বড় বারের কথা শুনেছি, কিন্তু কই, আহার কই সব? খাচ্ছ কই তোমরা?

কর্তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়িত, কিন্তু একটি অনাবিল প্রসন্নতায় হৃদ্য।

গুপ্ত অভয় পাইয়া বলিল, আজ্ঞে হুজুর, মা-লক্ষ্মী বড় কাহিল-কাহিল ঠেকছেন, আমরা ভাল খেতে পারছি না হুজুর।

কর্তা বলিলেন, ভেঙে বল তো বাপু, কি হয়েছে?

আজ্ঞে, এই সরু চালের অন্ন আমাদের কেমন জল-জল লাগছে। এই মোটা আকাঁড়া চালের ভাত ভিন্ন আমাদের মিষ্টি লাগে না হুজুর।

কর্তা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তারপর হুকুম করিলেন, ঠাকুর, মোটা চালের ভাত নিয়ে এস।

সুযোগ বুঝিয়া রাধানাথ দাস বলিয়া উঠিল, হুজুর যদি অভয় দেন তো একটি নিবেদন পাই।

হৃদ্য কণ্ঠস্বরে কর্তা বলিলেন, বল বল

হুজুর, রাজায় প্রজায় সম্বন্ধ হ'ল বাপ আর বেটা।

কর্তার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিলেন, শুনে তো আসছি তাই চিরকাল। কিন্তু বেটায় এত বাপ বদল করে কেন হে? পছন্দ হয় না?

রাধানাথের মাথা হেঁট হইয়া গেল। সকলের আহার শেষ হইলে সমস্ত ঠাকুর-বাড়িগুলি ঘুরিয়া রায়-কর্তা দ্বিতলে উঠিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রজাদের কাছারিতে তলব হইল। মিটমাটের কথাবার্তা সমস্ত সুশেষ করিয়া প্রজারা বিদায় লইল। প্রত্যেকের বিদায় মিলিল ধুতি ও চাদর, এবং ফিরিবার গাড়িভাড়া প্রত্যেককে দেওয়া হইল। গুপ্তকে চিকিৎসক জানিয়া সম্মানীস্বরূপ পাঁচ বিঘা নিষ্কর ভূমির সনন্দ রায়-কর্তা সহি করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নূতন জলসাঘরের নক্‌শাগুলি তিনি দেখিয়া দিবেন।

মাসখানেক পর।

রাবণেশ্বর রায় আহারান্তে দ্বিপ্রহরে অন্দরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। রায়-গিন্নী পাশে বসিয়া পাখার বাতাস দিতেছিলেন। ঝি আসিয়া খবর দিল, কোন্ গোমস্তার পরিবার এসেছে, খুব কান্নাকাটি করছে।

কর্তা উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, উঠে যাও গিন্নী, দেখ কার কি হ'ল!

রায়-গিন্নী উঠিয়া গিয়া একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। স্ত্রীলোকটির কাপড়খানা জীর্ণ নয়, কিন্তু কাদায় ধূলায় মালিন্যের আর তাহাতে শেষ নাই, তাহার কোলে একটি শিশু।

শিশুটিকে রায়-কর্তার পায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া মেয়েটি মূর্তিমতী বিষণ্ণতার মত দাঁড়াইয়া রহিল। গিন্নী সজল চক্ষে কহিলেন, হুদ্দা-শ্যামপুরের গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর স্ত্রী।

মেয়েটি আবার হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কর্তার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কর্তা শশব্যস্তে বলিলেন, ওঠ মা, ওঠ, কি হয়েছে বল?

গিন্নী বলিলেন, প্রজারা চক্রবর্তীকে পুড়িয়ে মেরেছে। নগদী কোন রকমে এদের নিয়ে এখানে এসেছে –

রায়-গিন্নীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দরদরধারে চোখের জলে বক্ষবাস সিক্ত হইয়া উঠিল।

কর্তা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, যুগলা!

যুগল খানসামা দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কর্তা বলিলেন, দেখ্, কাছারিতে কোথায় হুদ্দা-শ্যামপুরের নগদী এসেছে। তাকে নিয়ে আয়।

সবিস্ময়ে যুগল প্রশ্ন করিল, এখানে ?

কর্তা যুগলার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন শুধু। যুগলা আর উত্তরের প্রতীক্ষা করিল না, দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কর্তা ধীরপদক্ষেপে কক্ষের মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে বলিলেন, মৃত্যুর ওপরে হাত নেই মা, কি করব বল ? তবে নিশ্চিন্ত থাক তুমি, আমার ছেলে বিশ্বেশ্বর যদি খেতে পায়, তা হ'লে তোমার ছেলেও পাবে। যাও গিন্নী, ওঁকে স্নান করিয়ে কিছু খেতে দাও। যাও মা, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও।

মেয়েটি ধীরে ধীরে গিন্নীর সহিত চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই যুগলা নগদীকে সঙ্গে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে যাহা বলিল, তাহা এই - প্রজারা এখানে মৌখিক মিটমাটের কথা শেষ করিয়া গেলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছিল। হুজুর নাকি এখানে তাহাদের বাপ তুলিয়া কি গালিগালাজ করিয়াছিলেন! জমিদারপক্ষীয় কেহ কিন্তু তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারে নাই। ঘটনার দিন গোমস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া গুড়-তৈয়ারী-করা উনানের মধ্যে পুড়াইয়া মারিয়াছে। সঙ্গের চাপরাসী দুইজনও জখম হইয়া এখনও সেখানে যে কি অবস্থায় আছে, তাহা সে বলিতে পারে না। তাহার পরই উন্মত্ত প্রজারা আসিয়া কাছারি ঘরে আগুন দেয়। নগদী কোন রকমে গোমস্তার স্ত্রীপুত্রকে লইয়া সদরে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

রায়-কর্তা একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হু।

তারপর পাশের ঘরে গিয়া ঘুমন্ত একমাত্র পুত্র বিশ্বেশ্বরের হার খুলিয়া লইয়া নগদীর হাতে দিয়া বলিলেন, নিয়ে যা। যুগলা, গিন্নার কাছে একে নিয়ে যা, বলবি বিশ্বেশ্বর যা খায়, তাই যেন একে খেতে দেওয়া হয়। নিজে পাশে ব'সে যেন তিনি খাওয়ান। আর কেলে বাগদাকে ডেকে নিয়ে আয় - এখুনি— এইখানে।

কিছুক্ষণ পরে যুগলার পিছন পিছন দীর্ঘ শীর্ণ প্রেতের মত এক মূর্তি অন্দরে একেবারে কর্তার শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদক্ষেপে গিয়া প্রবেশ করিল। কালী বাগদার পদশব্দ নাকি বিড়াল কি বাঘের মত শোনা যায় না। কিন্তু কালী বাগদার অন্দর-প্রবেশে অন্দর-বাসিনীরা সচকিত হইয়া উঠিল। এ ব্যবস্থা অভিনব, রায়-অন্দরে খানসামা ও কদাচিৎ নায়েব ব্যতীত অপর কেহ কখনও প্রবেশ করে নাই। অন্দরের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন গুঞ্জিত হইয়া উঠিল।

রায়-গিন্নী কথাটা শুনিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কালী বাগদার পরিচয়

তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ-মুখেই তিনি শুনিলেন, রায়-কর্তা বলিতেছেন—ছত্রিশ মৌজা কালো ক'রে দিয়ে আসতে হবে। একখানা চালা বাঁচলে তোর মাথা বাঁচবে না, বুঝলি? কেউ যেন এক ফোঁটা জল আগুনে দিতে না পারে।

কালী অত্যন্ত শান্ত স্বরে বলিল, এই বেলাতেই বেরিয়ে পড়ছি আমরা।

রায়-গিন্নী ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, না, তা হবে না, আমি হতে দেব না।

কর্তা বাঘের মত গর্জন করিয়া উঠিলেন, কি হবে না?

গ্রাম পোড়াতে আমি দেব না। প্রজা-শাসন—

রায়-কর্তা বাধা দিয়া বলিলেন, যা বোঝ না গিন্নী, সে বিষয়ে হাত দিতে যেয়ো না।

গিন্নী এবার বলিলেন, কালী, তুই যদি যাবি—

কালীর দিকে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, কই কালী? কালী কখন নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছে।

গিন্নী বলিলেন, ফিরিয়ে আন, ডাক ওকে।

গিন্নী, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। শ্যামপুরের প্রজারা আমার মাথায় পা দিয়েছে।

কেন, আমার বাবাও তো জমিদারি শাসন করেন—

হাসিয়া রায়-কর্তা বলিলেন, বৈষ্ণবী মতে। কিন্তু আমরা শাক্ত গিন্নী, তোমার বাপেদের সঙ্গে আমাদেব মতে মিলবে না। দেখলে তো, সেপাই-হাঙ্গামা কোম্পানি কেমন ক'রে শাসন করলে!

রায়-গিন্নীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। বলিলেন, দেখ, প্রজা না হয় দোষ করেছে, কিন্তু তাদের স্ত্রী-পুত্র—

রায়-কর্তা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, অসময়েই আজ অন্দর হইতে বাহির হইয়া কাছারিতে চলিয়া গেলেন।

দিন পাঁচেক পর। রায়-কর্তা কালীমন্দিরে সন্ধ্যাতর্পণ করিয়া নাটমন্দির হইতে নীচে নামিতেছেন, এমন সময় নাটমন্দিরের থামের সুদীর্ঘ ছায়া যেন কায়া গ্রহণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছায়ার সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—কালী বাগদী। সে আসিয়া প্রণাম করিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কালী?

শান্ত মৃদুস্বরে কালী কহিল, কাজ হয়ে গিয়েছে হুজুর।

কর্তা বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা।

তারপর ডাকিলেন, অক্ষয়! অক্ষয় কালী-মন্দিরের পরিচারক। সে আসিলে বলিলেন, কালীকে মায়ের প্রসাদী কারণ দাও গিয়ে।

আবার বলিলেন, কিছুদিন পর আবার একবার।

কালী নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

রায়-গিন্নীর কাছে সংবাদটা গোপন রহিল না। তিনি কাঁদিয়া কহিলেন, উঃ, এই বোশেখ মাস - কাল-বোশেখীর দুর্যোগ—ছেলেমেয়ে নিয়ে—উঃ!

রায়-কর্তা গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন।

রায়-গিন্নী আবার বলিলেন, লোকের দীর্ঘশ্বাসকে তুমি ভয় কর না? আমার ওই একটি সন্তান—

বাধা দিয়া রায়-কর্তা বলিলেন, রায়-বংশে আমাকে নিয়ে চার পুরুষ, বিশ্বেশ্বর পঞ্চম পুরুষ--ওই এক সন্তানই হয়ে আসছে ব্রজরাণী, আর দুর্দান্ত প্রজাশাসনও এই ধারায় আমাদের হয়ে আসছে। তুমি ওই ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর স্ত্রী পুত্রের দিকে তাকিয়ে কথা বল। জান, দ্রৌপদার বেণী দুঃশাসনের রক্তেই বাঁধা হয়েছিল? কৌরববংশে বিধবার আর সংখ্যা ছিল না।

ব্রজরাণী বলিলেন, কিন্তু গান্ধারীর অভিশাপ? প্রভাসের কথাও স্মরণ কর।

কর্তা স্থির দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজরাণী বলিলেন, জান, আজ কদিন থেকেই আমি স্বপ্ন দেখি—

এবার হা-হা করিয়া হাসিয়া কর্তা বলিলেন, ছেড়ে দাও স্বপ্নের কথা। আর ভবিষ্যৎই যদি স্বপ্নে তুমি দেখে থাক, তবে তো সে ভবিতব্য, মা-তারার—আনন্দময়ীর ইচ্ছা।

তারপর গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা!

রায়-গিন্নী কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাহার পূর্বেই যুগলা খানসামা সাড়া দিয়া সসম্ভ্রমে দরজা খুলিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। দরদালান হইতে হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন—রায়-কর্তার শ্যালক বীজনগরের জমিদার হরিনারায়ণ সরকার। আহ্বানের পূর্বেই তিনি বলিলেন, রাধারাণীর হঠাৎ বিয়ের স্থির হয়ে গেল রায় মশায়। আপনাদের নিতে এলাম।

কর্তা গম্ভীরভাবে বলিলেন, ভগ্নী-ভাগ্নেকে নিয়ে যাও ভাই, আমায় নিয়ে যেয়ো না।

চকিত হইয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, কেন, আমাদের কি অপরাধ হ'ল?

ব্রজরাণীও উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাবণেশ্বর গম্ভীরভাবে বলিলেন, তোমাকে যে আমি ছাড়া অপরে শালা বলবে, এ আমার সহ্য হবে না। আমার সম্মানে শরিক—

কথা সমাপ্ত না হইতেই হরিনারায়ণ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ব্রজরাণীও হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, এখনও শখ আছে নাকি? বল তো সত্যভামার মত আমিই না হয় রাধারাণীকে তোমার রথে তুলে দিই।

কর্তা শ্যালকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, বেশ তো গো সত্যভামা দেবী, তার আগে তোমার নারায়ণ-কর্তার মতটা নাও।

ব্রজরাণী চোখ-মুখ লাল করিয়া বলিলেন, যাও।

মাস দেড়েক পর। আষাঢ় মাস। সেদিন রথযাত্রার পূর্বদিন।

রাধারাণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কর্তা কয়েকদিন পরেই ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু গিন্নী ও পুত্র বিশ্বেশ্বর তখনও ফিরেন নাই। কর্তার শাশুড়ী বলিয়াছিলেন, বাবা, ব্রজর তো আসা বড় একটা ঘটে না, যখন এসেছে, তখন মাসখানেক মায়ের মুখ চেয়ে রেখে যাও।

রাবণেশ্বর সে অনুরোধ ঠেলিতে পারেন নাই, যুগল খানসামা, কালী বাগদী প্রমুখ কয়েকজনকে সেখানে রাখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আগামীকল্য রথযাত্রার দিন রায়বাড়ির সদর পুণ্যাহ হইবে। এই দিনটি পুণ্যাহের জন্য বরাবর নির্দিষ্ট হইয়া আছে। পুণ্যাহের দিন দান-ধ্যান, কাঙালী ভোজন, নাচ-গান, জলসা ইত্যাদি সমারোহের বিপুল আয়োজন হইতেছে সমস্ত রায়বাড়ির এই সময় রঙ ফিরানো হইয়া থাকে। লতায় পাতায় ঠাকুর-বাড়ি সাজানো হইতেছে। কয়েকজন বিখ্যাত গায়ক, ওস্তাদ ও যন্ত্রী আসিয়াছেন —সন্ধ্যায় জলসাঘরে জলসা হইবে। রায়-হুজুর জলসার ও নাচ-গানের জন্য নূতন ঘর তৈয়ারী করাইয়াছেন, সেই ঘরে এই পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে প্রথম মজলিস বসিবে। সমারোহের প্রাচুর্য এবার কিছু বেশি।

আজ ব্রজরাণী ও বিশ্বেশ্বর ফিরিবেন। আগামী কল্য রায়-গিন্নী উপস্থিত না থাকিলেই নয়। রায়-কর্তা কালীবাড়ি হইতে পুণ্যাহের রৌপ্য কলস মাথায় করিয়া রাধাগোবিন্দজীর দরবারে আনিয়া স্থাপন করিবেন, গোবিন্দ-মন্দিরে সে কলসী কাঁখে তুলিবেন রায়-গিন্নী। অন্দরে লক্ষ্মীর সিংহাসনে লইয়া গিয়া সে কলসী তিনি স্থাপন করিবেন; রাত্রে লক্ষ্মীপূজা করিবেন।

রায়-সরকারের ভূ-সম্পত্তি বহুবিস্তৃত, সারা বাংলাময়ই ছড়াইয়া আছে।

প্রত্যেক মৌজায় নিমন্ত্রণপত্র গিয়াছে, পুণ্যাহপাত্র মণ্ডলপ্রজারা সব পুণ্যাহের টাকা লইয়া উপস্থিত হইবে। হুন্দা-শ্যামপুরেও নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইয়াছে, কিন্তু এখনও কেহ উপস্থিত হয় নাই।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে নায়েব আসিয়া বলিল, কই, গিন্নীমায়ের বজরা তো এসে পৌছল না!

রায়-কর্তা একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সময় এখনও যায় নি। কিন্তু হুন্দা-শ্যামপুরের—

কথা শেষ না করিয়াই তিনি নীরব হইলেন।

নায়েব বলিল, কই, এখনও তো কেউ আসে নি।

এ কথার কোনও জবাব না দিয়া কর্তা বলিলেন, জলসাঘরে বাতি দিতে বল, আসর বসবে।

নায়েব বলিল, যে আজ্ঞে। তারপর আবার বলিল, গিন্নীমায়ের বজরা দেখবার ছিপ দুখানা—আজকাল ভরা নদী—

সচকিত হইয়া কর্তা বলিলেন, দাও। পাঠিয়ে দাও।

জলসাঘরে মজলিস চলিতেছিল। প্রকাণ্ড বড় একখানি হল-ঘর, একশত লোকের স্বচ্ছন্দে স্থান সংস্থান হইতে পারে, এক দিকে বড় বড় জানালা ও বারান্দার দিকে বড় বড় দরজা। সেই ঘরের মেঝে জুড়িয়া বহুমূল্য গালিচা পাতিয়া তাহার উপর আসর বসিয়াছে। দেওয়াল ঘেঁষিয়া বড় বড় তাকিয়া দেওয়া আছে। মাথার উপরে সারি সারি বেলোয়ারী ঝাড় ও দেওয়ালে দেওয়ালগিরির বাতির আলোয় সমস্ত ঘরখানা ঝলমল করিতেছিল। দেওয়ালের গায়ে রায়-বংশের পূর্বপুরুষগণের ছবি টাঙানো হইয়াছে। সকলেরই বিলাস-বেশের ছবি। আতর-গোলাপজলের গন্ধে ঘর আমোদিত। বারান্দার উপর দরজার মুখে দাঁড়াইয়া চাকরেরা বড় বড় তালপাখার মৃদু আন্দোলনে ঘরে বায়ুপ্রবাহ সঞ্চারিত করিতেছিল। শ্রোতার দল নিস্তব্ধ, বাহিরে পরিচারকের দল সন্তর্পিত পদক্ষেপে মূকের মত চলাফেরা করিতেছে। একজন সেতারী সেতার লইয়া সুরের জাল বুনিতেছেন। তবলচী তবলায় সঙ্গত করিয়া চলিয়াছেন। যন্ত্র ঝঙ্কারে বাতাসে যেন মৃদু তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে—ঝাড়ের বাতির শিখা মৃদু মৃদু কম্পিত, ঘরের সমস্ত ধাতব পাত্রের মধ্যে সে ঝঙ্কারের রেশ সঞ্চারিত—কর-স্পর্শে বেশ অনুভব করা যায়। সঙ্গীতে যেন ঘরখানা ভরিয়া উঠিয়াছে।

অকস্মাৎ জলসাঘরের বারান্দায় আর্তনাদ করিয়া কে আছাড় খাইয়া পড়িল।

সে আর্তনাদ যত মর্মভেদী, সে কণ্ঠস্বরও তেমনই ভয়াবহ কর্কশ। মুহূর্তে রাক্ষসের মত সে আর্তনাদ পুঞ্জীভূত সঙ্গীত ঝঙ্কারকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ঘরসুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল, অতর্কিতে চকিত যন্ত্রীর যন্ত্রের তার ছিঁড়িয়া গেল।

বীজনগর হইতে আসিবার পথে আকস্মিক একটা ঝড়ের তাড়নায় ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে ঘূর্ণিতে পড়িয়া বজরা ডুবি হইয়াছে। রায়-গিন্নী, বিশ্বেশ্বর—কেহ ফিরেন নাই। ফিরিয়াছে একা কালা বাগদী। বারান্দার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল কর্দমলিপ্ত দীর্ঘাকৃতি প্রেতমূর্তির মত কালী।

রায় গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা—

তারপর অন্ধকার স্তব্ধ রায়বাড়ি। গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে রব উঠিতেছিল, তারা—তারা—

নাটমন্দিরে পদচারণা করিতে করিতে রাবণেশ্বর সহসা স্তব্ধ অন্ধকার পুরীর দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, জলসাঘর—আর ও-ঘরে আলো জ্বলবে না। প্রথম দিনেই নিভে গেল। রায়-বংশ আজ নির্বংশ। জলসাঘর নয়, রায়বংশের সমাধি-গৃহ।

কোনমতে পুণ্যাহ সমাপ্ত হইল। পুণ্যাহের পরদিন রায়-কর্তা নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, শ্রাদ্ধের ফর্দ কর। পুরনো ফর্দে হবে না, নতুন ফর্দ কর। রায়-বাড়িতে এতবড় শ্রাদ্ধ যেন আর কেউ না করে থাকে। দশদিনের মধ্যেই আমি কাজ শেষ করব।

রায়-কর্তা নিজে অন্দরের মধ্যে বসিয়া মুসাবিদা আরম্ভ করিলেন—দান পত্রের। সমস্ত সম্পত্তি দেবত্রে অর্পণ করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন। এ অন্ধকার পুরীতে আর নয়; মা-আনন্দময়ীর প্রজা তিনি, নিরানন্দ রাজ্যে থাকিতে পারিবেন না। বারবার ব্রজরাণীর প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিলেন, তুমি জানতে পেরেছিলে, ঐশ্বর্য তোমায় মত্ত করতে পারে নি। তারা তারা—

ধন এবং জনের অভাব রায়বাড়ির ছিল না, কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রাদ্ধের উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। সময় সংক্ষেপের জন্য সমস্ত ফর্দ শ্রীরামপুর হইতে ছাপা হইয়া আসিল।

দেশ-দেশান্তর হইতে সমাগত ব্রাহ্মণপণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবে রায়-বাড়ি শোকের সমারোহে মুখর হইয়া উঠিল। হাজারে হাজারে সমাগত কাঙালীতে রাজারামপুর ভরিয়া গেল। মহলে মহলে নিমন্ত্রণ গিয়াছিল;

মাতব্বর মণ্ডল-প্রজাও সকলে আসিয়াছিল। পুণ্যাহে না আসিলেও হুন্দা-শ্যামপুরের প্রজারা এবার না আসিয়া পারিল না।

রায় বলিলেন, এসেছ তোমরা, ভালই হয়েছে। গিন্নীর একটা অনুরোধ ছিল তোমাদের কাছে, আমিই সেটা জানাই। তোমরা দুঃখ পেয়েছ, তোমাদের সে দুঃখে তিনি কাতর হয়েছিলেন। তোমাদের যার যা ক্ষতি হয়েছে, সেটা তোমরা গ্রহণ কর।

প্রজারা এবার সত্যই রাজার পায়ে গড়াইয়া পড়িল।

রায়-কর্তা অবিচলিত অশ্রুহীন চক্ষে পত্নী-পুত্রের শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ করিলেন। একে একে সমাগত ব্যক্তিরা বিদায় লইলেন। হরিনারায়ণও আসিয়াছিলেন, তিনি অপরাধীর মত বলিলেন, আমার অপরাধ আমি ভুলতে পারছি না রায় মশায়। আমিই নিমিত্ত হলাম।

রায় হাসিয়া বলিলেন, নিমিত্ত মানে হ'ল: কারণ। আনন্দময়ীর প্রসাদী কারণ একটু খাবে হরিনারায়ণ, তা হ'লে বুঝবে, কারণের মালিক কে?

হরিনারায়ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাবা-মা একটা কথা আপনাকে জানিয়েছেন।

বল।

ইতস্তত করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, বলেছেন – ব্রজরাণীর অভাবে এতবড় রায়বংশ যেন ভেসে না যায়।

তারা তারা!

কর্তা ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন, রায়বংশ-শেষের কথা এই মুহূর্তে হরি-নারায়ণ তাঁহার প্রত্যক্ষ চিন্তার মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন। বহুক্ষণ পরে হরিনারায়ণ আবার বলিলেন, আমার কথা এখনও শেষ হয় নি রায় মশায়।

রায় বলিলেন, বল তুমি হরিনারায়ণ। মাকে ডাকার তো সময় অসময় নেই, ডাকলাম একবার এমনই। বল, কি বলবে বল?

বাবা-মার অনুরোধ, আমারও প্রার্থনা আপনার কাছে—নন্দরাণীকে আপনি—

অর্থাৎ আমার শালা-ডাক তোমার বড়ই মিষ্টি লাগে, কেমন? বলিয়া তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নন্দরাণী হরিনারায়ণের সর্বকনিষ্ঠা বিবাহযোগ্যা ভগ্নী। হরিনারায়ণ কিন্তু এ হাসিতে মাথা নত করিয়া রহিলেন, আর তিনি অনুরোধ করিতে পারিলেন না। সর্বশেষ বিদায় লইলেন তিনি।

রায় এবার নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, সমস্ত এবার চুকিয়ে দাও, আর

বাকি কি ?

আজ্ঞে, হিসেবনিকেশ হতে এখনও কিছুদিন লাগবে। তা ছাড়া, ভাণ্ডারই এখনও ভাঙা হয় নি। সব জিনিসই দেখছি অনেক উদ্‌বৃত্ত হয়েছে—কোন জিনিস ছ-আনা, কোন জিনিস সিকি—

বাধা দিয়া বিরক্তিভরে রায় বলিলেন, থাক্, ভাণ্ডার যেমন আছে তেমনই থাক্। তুমি এই কাগজগুলো একবার দেখে দলিলে চড়িয়ে নিয়ে এস।—এক গোছা কাগজ তিনি নায়েবের হাতে তুলিয়া দিলেন। কাগজ-গোছার একখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া নায়েব সকাতবে প্রভুর দিকে চাহিল। রায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অদূরবর্তী ভরা গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত হইয়া গেল। রায় সেদিন ভাবিতেছিলেন, এগুলি সদরে লইয়া গিয়া পাকা করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু দারুণ বর্ষা নামিয়াছে, বর্ষণের আব বিবাম নাই, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। এই দুর্যোগেব মধ্যে—

সহসা তাঁহার হাসি আসিল, দুর্যোগ! এখনও দুযোগের ভয়!

আবার মনে হইল, আব পাকা করিবাবই বা প্রয়োজন কি? যে বস্তু ত্যাগই করিবেন, তাহাব জন্য আবার মায়া কেন? বন্দোবস্ত কবিয়া ত্যাগের কি কোনও অর্থ আছে? খোলা সিন্দুকের সম্মুখেই দলিলগুলি পড়িয়া রহিল, সিন্দুকের চাবি পড়িয়া রহিল শয্যাব উপর। রায় গঙ্গার দিকের জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলেন। বৃষ্টির ছাটে বাতাসে ঘরখানা বিপর্যস্ত হইয়া গেল, তাঁহাবও সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। তাঁহার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সবিস্ময়ে তিনি গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দুই কূল ভাসাইয়া গঙ্গা পাথার হইয়া উঠিয়াছে। আর কি গর্জন! কিন্তু এত ফেনা কেন? বাশি রাশি পদ্মপুষ্পের মত ফেনা ভাসিয়া চলিয়াছে। বহুকাল গঙ্গার এমন ভৈরবী মূর্তি তিনি দেখেন নাই। থাকিতে থাকিতে সব চিন্তা ডুবাইয়া দিয়া ওই গঙ্গার সলিলরাশির মধ্য হইতে ব্রহ্মাণী ও বিশ্বেশ্বরের মুখ ভাসিয়া উঠিল। গঙ্গার রাক্ষসী-রূপ দেখিয়া তাহাদের কথাই মনে জাগিয়া উঠিল।

হুজুর!

ব্যস্তসমস্ত হইয়া নায়েব আসিয়া বহির্দ্বার হইতে ডাকিল, কিন্তু সে ডাক রায়-কর্তার কানে পৌঁছিল না। সাহস করিয়া নায়েব ঘরে প্রবেশ করিল।

সর্বনাশ হয়েছে হুজুর, ওপরে দীঘলমারীর বাঁধ ভেঙেছে। বানের জল ছুটে

আসছে তালগাছের মত উঁচু হয়ে।

রায়ের কানে গেল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, ওই যে গঙ্গার কল-কল্লোল, ও কি তাঁহার ব্রজরাণীর ডাক? ব্রজরাণী এত মুখরা হইল কি করিয়া?

নায়েব আর একবার ডাকিল, কিন্তু কোনও সাড়া না পাইয়া অগত্যা চলিয়া গেল।

কতক্ষণ পর রায় হঠাৎ ডাকিলেন, কে রয়েছিস?

একজন খানসামা আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, কেলে বাগদীকে পাঠিয়ে দে। সে চলিয়া গেল, রায় তেমনই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালী-চরণ আসিয়া নতমুখে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

রায় বলিলেন, সন্ধ্যের সময় কালীবাড়ির ঘাটে একখানা ডিঙি নিয়ে তৈরী থাকবি। সঙ্গে কাউকে দরকার নেই। আমি ধরব বোটে।

নিঃশব্দে কালাচরণ চলিয়া গেল। ভৃত্যটা এবার সাহস করিয়া বলিল, হুজুর, সর্বাঙ্গ যে ভিজে গেল!

পরম প্রসন্নকণ্ঠে রায় বলিলেন, হ্যাঁ বে, নিয়ে আয়, আমার কাপড় নিয়ে আয়, স্নান সেরে মন্দিরে যাব। তারা—তারা! ও কি! গোলমাল কিসের রে নীচে?

আজ্ঞে, গাঁয়ে বান্ ঢুকেছে, তাই লোকে চিৎকার করছে।

রায় দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন। কালীবাড়ি-গোবিন্দবাড়ির সম্মুখ তখন দরিদ্র নরনারীতে ভরিয়া উঠিয়াছে—সামান্য সম্বল পোঁটলায় বাঁধিয়া, মাথায় করিয়া, শিশু-নারীর হাত ধরিয়া রায়বাড়ির সম্মুখে সকলে দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষুধাতুর শিশু-বালকের চিৎকারে চারিদিক যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।

রায় প্রথমেই বলিলেন, ফটক খুলে দাও, ফটক খুলে দাও।

নায়েব বলিল, সর্বনাশ হয়ে গেল—ওপরে দীঘলমারীর বাঁধ ভেঙেছে।

রায় শিহরিয়া উঠিলেন, সর্বনাশ—তা হ'লে গ্রাম যে ডুবে যাবে! মুহূর্ত চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, এখুনি তুমি বেরিয়ে পড়। গ্রামের সমস্ত ভদ্র পরি-বারকে জোড় হাত ক'রে আহ্বান জানিয়ে এখানে নিয়ে এস। অন্দর সদর সমস্ত মহল খুলে দাও।

ওদিকে ক্ষুধার্তের দল চিৎকার করিতেছিল, রাজাবাবু, খেতে দাও। হুজুর, রক্ষে কর।

রায় নায়েবের দিকে চাহিলেন। নায়েব বলিল, কোনও ভাবনা নেই, গিন্নী-মায়ের শ্রাদ্ধের ভাণ্ডার এখনও পরিপূর্ণ।

রায় উর্ধ্বমুখে ব্রজরাণীকেই স্মরণ করিলেন। এ কি, কে—কে?

নায়েব ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, উঠুন, উঠুন, গাঙুলী মশায়! কি হল, কি?

বৃদ্ধ নবীন গাঙুলী আসিয়া রায়-কর্তার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে।

রায় তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহার প্রতি-প্রণাম করিয়া কহিলেন, বলুন, আমাকে কি করতে হবে?

গাঙুলী বলিল, রক্ষে করুন রায় মশায়, আমার মান ইজ্জত সব গেল। আমার কন্যার আজ বিবাহ। পাত্রপক্ষ এসে গেছে। কিন্তু হঠাৎ বন্যাতে আমার সব পণ্ড হ'ল। তৈরী রান্নার ওপর রান্নাঘর ভেঙে পড়েছে।

রায় নিজেই অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আপনার নয়, আমার কন্যার বিবাহ। ভয় কি! আসুন, বিবাহ হবে রায়বাড়িতে। চলুন, আমি পাত্র নিয়ে আসি।

নায়েব হাঁক দিয়া কহিল, ছাতা ছাতা—

সমস্ত রায়বাড়ির সদর-অন্দর গ্রামের লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চিৎকারে কলরবে গঙ্গার গর্জনও ঢাকা পড়িয়াছে। বন্ধ আছে শুধু রায়-কর্তার শয়নকক্ষ, লক্ষ্মীর ঘর ও জলসাঘর।

রায়-কর্তা ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন, আর মুহুর্মুহু বাহিরের দিকে চাহিতেছিলেন। প্রগাঢ় অন্ধকারের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন।

নায়েব আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, বিবাহের আসর কোথায় হবে? নাটমন্দির সব ভ'রে গেছে। হুকুম হ'লে জলসাঘরে—

কথা সে সমাপ্ত করিতে পারিল না। রায়ের কানে কিন্তু কোনও কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি অন্যমনস্কভাবেই বলিলেন, হুঁ।

নায়েব চলিয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া রায় ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন। পরিধানে একমাত্র বস্ত্র, নগ্ন পদ, কপর্দক পর্যন্ত সম্বল নাই; হাতে শুধু একটি লাঠি লইয়া রায় অন্দরের খিড়কির পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

গভীর অন্ধকার, ভীষণ দুর্যোগ। রায় ঘাটে আসিয়া ডাকিলেন, কেলে!

অন্ধকারে গাঢ়তর অন্ধকারের মত কালীচরণ নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। রায় একবার রায়বাড়ির দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

এ কি, জলসাঘর আলোয় আলোময় হইয়া উঠিয়াছে যে! উন্মুক্ত সুবৃহৎ জানালার মধ্য দিয়া রায় দেখিলেন, জলসাঘরে বিবাহের মণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। এক দিকে দাঁড়াইয়া বর, কন্যা তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। ঘন ঘন হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে জলসাঘর উৎসবময়ী হইয়া উঠিয়াছে। রায় দেখিলেন,

২

বাতিদানের বাতিগুলি সমস্তই ছোট ছোট, প্রায় অর্ধেক। ওঃ, সেদিনের নির্বাপিত অর্ধদগ্ধ বাতিগুলি আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে!

রায় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিলেন, এ কি, পনেরো দিন পূর্বে নির্বংশ রায়-বাড়িতে, আজ এই ঘনায়মান দুর্যোগের মধ্যে পৃথিবী যখন আর্তচিৎকারে ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন কেমন করিয়া সেখানে বিবাহের বাসর সাজিয়া উঠিল অকালে নির্বাপিত দীপমালা, এই দুর্যোগের অন্ধকারে এই পরম মুহূর্তটিকে কে জ্বালাইয়া দিল? তাঁহার চোখে জল আসিল, সজল চক্ষে সেই অন্ধকারের মধ্যে মৃদু বর্ষণ মাথায় করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাশে নির্বাক কালীচরণ।

এদিকে নাটমন্দিরে আহার-তৃপ্ত ক্ষুধার্তেরা ঘন ঘন জয়ধ্বনি তুলিতেছিল—অক্ষয় হোক রায় হুজুরের রাজত্ব. অক্ষয় হোক, আমরা সুখে বেঁচে থাকি। রায় আবার জলসাঘরের দিকে চাহিলেন। দেওয়ালে বিলম্বিত তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণের প্রতিকৃতিগুলি সজল বাতাসে মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। এ কি, ভুবনেশ্বর রায়. ত্রিপুরেশ্বর রায় কি তাঁহাকে ডাকিতেছেন? তিনি গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা তারা - আনন্দময়ী তারা—

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি বলিলেন, ফিরে আয় কেলে।

কালীচরণ নিঃশব্দ দ্রুত পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া কালাবাড়ির রুদ্ধ দ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত করিল।

জলসাঘর

ভোর তিনটার সময় নিয়মিত শয্যাত্যাগ করিয়া বিশ্বম্ভর রায় ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। পুরাতন খানসামা অনন্ত গালিচার আসন ও তাকিয়া পাতিয়া, ফরসি ও তামাক আনিবার জন্য নীচে চলিয়া গেল। বিশ্বম্ভর চাহিয়া একবার দেখিলেন, কিন্তু বসিলেন না। নতশিরে যেমন পদচারণা করিতেছিলেন, তেমনই করিতে থাকিলেন। অদূরে রায়বাড়ির কালীমন্দিরের তলদেশে শুভ্র স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা ক্ষীণধারায় বহিয়া চলিয়াছে।

আকাশের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শুকতারা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিম দক্ষিণ কোণে ওই তারাটির সহিত যেন দীপ্তির প্রতিযোগিতা করিয়াই এ অঞ্চলের হালে-বড়লোক গাঙুলীবাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তিবিশিষ্ট একটি বিজলী বাতি অকম্পিতভাবে জ্বলিতেছিল। ঢং-ঢং-ঢং করিয়া গাঙুলীবাবুদের ছাদে তিনটার ঘড়ি এতক্ষণে পেটা হইল। পূর্বে দুই শত বৎসর ধরিয়া এ অঞ্চলে ঘড়ি বাজিত রায়বাবুদের বাড়িতে, এখন আর বাজে না। এখন বিশ্বম্ভরবাবুর ঘুম ভাঙে অভ্যাসের বশে আর পারাবতের গুঞ্জনে। শুকতারা আকাশে দেখা দিলেই উহাদের কলরব শুরু হয়। ভোরের বাতাসের সঙ্গে একটি অতি মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। বসন্ত সমারোহ করিয়া রায়বাড়িতে আর আসে না। তাহার পাদ্য-অর্ঘ্য দিবার মত শক্তিও রায়বংশের নাই। মালীর অভাবে ফুলের বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। আছে মাত্র কয়টা বড় গাছ মুচকুন্দ, বকুল, নাগেশ্বর, চাঁপা। সেগুলিও এই বংশেরই মত শাখাপ্রশাখাহীন, এই প্রকাণ্ড ফাটল-ধরা প্রাসাদখানার মতই জীর্ণ। সত্য সত্যই কয়টা গাছের কাণ্ডের মধ্যে গহ্বরও দেখা দিয়াছে। সেই জীর্ণ শাখার প্রান্তে বসন্ত দেখা দেয়, না, গাছগুলিই বসন্তকে ধরিবার চেষ্টা করে, কে জানে!

আস্তাবল হইতে একটা ঘোড়া ডাকিয়া উঠিল।

ফরসির মাথায় কলিকা বসাইয়া নলটি হাতে ধরিয়া অনন্ত খানসামা ডাকিল, হুজুর!

বিশ্বম্ভরবাবুর চমক ভাঙিল, বলিলেন, হুঁ।

ধীরে ধীরে গালিচায় বসিতেই অনন্ত নলটি তাঁহার হাতে আগাইয়া দিল। নীচে ঘোড়াটা আবার ডাকিয়া উঠিল।

নলে দুই-একটা মৃদু টান দিয়া বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন, মুচকুন্দ ফুল ফুটতে আরম্ভ হয়েছে, শরবতের সঙ্গে দিবি আজ থেকে।

মাথা চুলকাইয়া অনন্ত বলিল, আজ্ঞে, পাকে নি এখনও পাপড়িগুলো।

ওদিকে আস্তাবলে ঘোড়াটা অসহিষ্ণুভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় ঈষৎ বিরক্তিভরেই বলিলেন, নিতে বেটার কি বুড়ো বয়সে ঘুম বাড়ছে নাকি? যা দেখি, নিতেকে ডেকে দে। তুফান ছটফট করছে। ডাকছে, শুনছিস না?

তুফান ওই ঘোড়াটার নাম। রায়বাড়ির নয়টি আস্তাবলের মধ্যে এই একটা ঘোড়া অবশিষ্ট আছে। বৃদ্ধ তুফান পঁচিশ বৎসর পূর্বের অসমসাহসী জোয়ান বিশ্বম্ভর রায়ের দুর্দান্ত বাহন। সেকালে—সেকালে কেন, দুই বৎসর পূর্বেও দেশ-দেশান্তরের পথচারী বাদশাহী সড়কের উপর প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়ার পিঠে মাথায় পাগড়ি-বাঁধা গৌরবর্ণ বীরবপু আরোহীকে দেখিয়া এ দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করিত, কে হে উনি।

লোকে বলিত, আমাদের রাজা উনি—বিশ্বম্ভর রায়। বড়দরের শিকারী, বাঘ মারা ওঁর খেলা।

অপরিচিত পথিক সসম্ভ্রমে চোখ তুলিয়া দেখিত, সাদা ঘোড়া তাহার আরোহীকে লইয়া দূরান্তরে মিলাইয়া গিয়াছে। দূরে উড়িতেছে শুধু ধূলার একটা কুণ্ডলী, একটা প্রক্ষিপ্ত ঘূর্ণি যেন পাক দিতে দিতে দিগন্তে মিশিবার জন্য ছুটিয়াছে।

নিত্যনিয়মিত দুর্দান্ত তুফান বিশ্বম্ভর রায়কে লইয়া ভোরে বাহির হইত। দুই বৎসর পূর্বে যেদিন মহাজন গাঙ্গুলীরা সমারোহ করিয়া গ্রামে গ্রামে ঢোল-শোহরত দ্বারা দখল-ঘোষণা করিল, সেই দিন হইতে দেখা গেল তুফানের পিঠ সওয়ার শূন্য, নিতাই সহিস মুখের লাগাম ধরিয়া তুফানকে টহল দিয়া ঘুরাইয়া আনিতেছে।

নায়েব তারাপ্রসন্ন একদিন বলিয়াছিল, আপনার এতদিনের অভ্যেস ছাড়লে শরীর—

বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি দেখিয়া তারাপ্রসন্ন কথা শেষ করিতে পারে নাই।

রায় উত্তর দিয়াছিলেন দুটি কথায়, ছি তারাপ্রসন্ন!

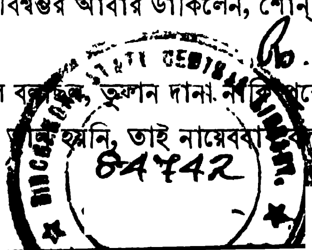
অনন্ত নীচে যাইতেছিল। বিশ্বম্ভর আবার ডাকিলেন, শোন্।

অনন্ত ফিরিল।

রায় বলিলেন, নিতাই কাল বলছিল, তুফান দানা নাকি আরো পাচ্ছে না।

অনন্ত বলিল, ছোলা এবার ভালো হয়নি, তাই নায়েববাবু বললেন—

হুঁ।



আবার ফরসিতে গোটাকয় টান মারিয়া বলিলেন, তুফান কি খুব রোগা হয়ে গেছে ?

অনন্ত মৃদুস্বরে বলিল, না। তেমন কই—

হুঁ।

কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন, দানা পুরোই দিবি, বুঝলি ? নায়েবকে আমার নাম ক'রে বলবি। যা তুই, নিতাইকে ডেকে দে।

অনন্ত চলিয়া গেল। তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া ঊর্ধ্বমুখে বিশ্বম্ভরবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নলটা পাশে পড়িয়া আছে। আকাশের তারাগুলি একের পর এক নিবিয়া আসিতেছিল। বিশ্বম্ভর অন্যমনস্কভাবে বোধ করি আপনার প্রশস্ত বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন এক দুই। প্রথম দিন তুফানের পিঠে সওয়ার হইতে গেলে এই পাঁজরখানাতেই ধাক্কা লাগিয়াছিল ! সেদিনের সে কি রূপ তুফানের ! সে কি দুর্দান্তপনা ! শান্ত হইত সে শুধু বাজনার শব্দে। বাজনা বাজিলে সে কখনও বেতালা পা ফেলে নাই। ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সে কি নৃত্য তাহার !

বিশ্বম্ভরবাবু উঠিয়া পড়িলেন। অতীতের স্মৃতি তারকারাজির মত বুকের আকাশে রায়বংশের মর্যাদার ভাস্কর প্রভায় ঢাকা পড়িয়া থাকে। আজ মমতার ছায়ায় সে ভাস্করে অকস্মাৎ সর্বগ্রাসী গ্রহণ লাগিয়া গেল। স্মৃতির উজ্জ্বলতম তারকা—তুফান, সেই আকাশে সর্বাগ্রে জ্বলজ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। আজ দুই বৎসর তিনি নীচে নামেন নাই। দুই বৎসর পরে তুফানকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। খড়ম জোড়াটা পায়ে দিয়া রায় দোতলায় নামিলেন। চক-মিলানো বাড়ির সুপরিসর সুদীর্ঘ বারান্দা রায়ের বলিষ্ঠ পদের খড়মের শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। বারান্দায় সারি সারি গোল থামের মাথার খড়খড়ি হইতে সচকিত কতকগুলা চামচিকা ফরফর করিয়া উড়িয়া গেল। এপাশে অন্ধকার তালাবন্ধ ঘরগুলার ভিতরেও চামচিকার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। ছাদের সিঁড়ির পাশেই বিছানাঘর। তুলার টুকরা বারান্দায় পড়িয়া আছে। তাহার পরই একটা দুর্গন্ধ। এটা ফরাসঘর। জাজিম, শতরঞ্জি, গালিচা থাকে ঘরটায়। বোধহয় কিছু পচিয়া থাকিবে। পরের ঘরটায় চামচিকার পক্ষতাড়নের শব্দের সঙ্গে ঝুনঝান শব্দ উঠিতেছে। বাতিঘর এটা। বেলোয়ারী ঝাড়ের কলমগুলি বোধ হয় দুলিতেছে। ইহার পরেই এ পাশের কোণের ঘরটা ছিল ফরাশবরদারের। এই সমস্ত জিনিসের ভার ছিল তাহার উপর। ঘরখানা শূন্য পড়িয়া আছে।

পূর্বমুখে রায় মোড় ফিরিলেন। পত্তনিদার মহল এটা। রায়দের দপ্তরে

বিভিন্ন জেলার বড় বড় ধনী পত্তনিদার ছিল। পাঁচ শত হইতে পাঁচ হাজার টাকা খাজনা রাখিত, এমন পত্তনিদারের অভাব ছিল না। তাঁহারা আসিলে এইখানে তাঁহাদের বাসস্থান দেওয়া হইত। বারান্দার দেওয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো রহিয়াছে। মুখ তুলিয়া রায় একবার চাহিলেন। প্রথমখানির ছবি নাই, কাচ নাই, শুধু ফ্রেমখানা ঝুলিতেছে। দ্বিতীয়খানার কাচ নাই। তৃতীয়খানার স্থান শূন্য। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় আবার নতমুখে চলিলেন। উপরে কড়ির মাথায় পায়রাগুলি অবিরাম গুঞ্জন করিতেছে। পূর্বমুখে বারান্দার প্রান্তেই সিঁড়ি। সিঁড়ি বাহিয়া রায় নীচে নামিয়া আসিলেন। দুই বৎসর পর আজ আবার তিনি নীচে নামিলেন। সেরেস্তাখানার সারি সারি ঘরে রায়বংশের রাশি রাশি কাগজ বোঝাই হইয়া আছে।

সাত রায়ের ইতিহাস। বিশ্বম্ভর রায় জমিদার রায়বংশের সপ্তম পুরুষ। অন্ধকারের মধ্যে রায় ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার মনে পড়িল রায়বংশের আদি পুরুষের কথা। তিনি নাকি বলিতেন, মা-লক্ষ্মীকে বাঁধতে হ'লে মা-সরস্বতীর দয়া চাই। কাগজের ওপর কালির গুটির শেকল-ও বড় কঠিন শেকল। হিসেবনিকেশের শেকল ঠিক রেখো—চঞ্চলার আর নড়বার ক্ষমতা থাকবে না। তিনি ছিলেন নবাব দরবারের কানুনগো।

কাগজ, কলম, কালি—সবই ছিল, কিন্তু মা-লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন।

বারান্দার শেষপ্রান্তে একটি কুকুর কোথায় অন্ধকারে শুইয়া ছিল, সেটা ঘেউ ঘেউ শব্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। রায় গ্রাহ্য করিলেন না, অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কুকুরটার ঘেউ ঘেউ থামিয়া গেল। সে লেজ নাড়িয়া বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া রায়কে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। কুকুরটা শখ করিয়া কেহ পোষে নাই। রায়বাড়ির উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের সন্ততি কেহ।

কাছারির দেউড়ি পার হইয়া দক্ষিণে গোশালা, বামে আস্তাবল।

তাহার ওদিকে দেবতাদের মন্দির।

রায় ডাকিলেন, নিতাই!

সসম্ভ্রম কণ্ঠের জবাব আসিল, হুজুর!

তুফানের উচ্চ হ্রেষারবে সে জবাব ঢাকা পড়িয়া গেল। ওদিক হইতে একটা হাতির গর্জন শোনা গেল।

রায় অগ্রসর হইয়া তুফানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অস্থিরভাবে পা ঠুকিয়া ডাক দিয়া বৃদ্ধ তুফান শিশুর মত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মুখে হাত

বুলাইয়া রায় বলিলেন, বেটা !

তুফান মাথাটা মনিবের হাতে ঘষিতে লাগিল। ওদিকে হাতিটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমাগত ডাকিয়া ডাকিয়া সে পায়ের শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। মাহুত রহমৎ প্রভুর সাড়া পাইয়া উঠিয়া আসিয়া আপনার হাতির নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। সে অতি মৃদু অনুযোগের স্বরে বলিল, হুজুর, ছোটগিন্নী শিকলি ছিঁড়ে ফেলবে।

হস্তিনীটির নাম ছোটগিন্নী। বিশ্বম্ভরবাবুর মায়ের বিবাহের যৌতুক এই ছোটগিন্নী। তখন নাম ছিল মতি। কিন্তু কর্তা ধনেশ্বর রায় শিকার করিয়া ফিরিয়া মতি বলিতে পাগল হইয়া উঠিলেন। মতি একটা চিতাবাঘকে শুঁড়ে ধরিয়া পদদলিত করিয়াছিল। মতির প্রতি যত্নের আধিক্য দেখিয়া বিশ্বম্ভরের মা তাহার নাম দিয়াছিলেন, সতীন। কর্তা বলিয়াছিলেন, সেই ভাল রায়গিন্নী, ওর নামও থাকুক—গিন্নী।

বিশ্বম্ভরবাবুর মা বলিয়াছিলেন, শুধু গিন্নী নয়, ছোটগিন্নী, ও তোমার দ্বিতীয় পক্ষ।

রহমতেব কথায় বিশ্বম্ভরবাবু তুফানকে ছাড়িয়া ছোটগিন্নীর সম্মুখে গেলেন। পিছনে তুফানের অসন্তুষ্ট হ্রেষারব ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রায় ছোটগিন্নীকে বলিলেন, কি গো মা লক্ষ্মী ? ছোটগিন্নী আপনার শুঁড়খানি বাঁকাইয়া রায়ের সম্মুখে ধরিল। এটুকু তাঁহাকে সওয়ার হইবার জন্য অনুরোধ ; রায় হাতিতে উঠিতেন শুঁড় বাহিয়া।

রায় তাহার শুঁড়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, এখন নয় মা।

ছোটগিন্নী কথা বুঝিল। সে শুঁড়খানি রায়ের কাঁধের উপর রাখিয়া লক্ষ্মী মেয়েটির মতই শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রায় কহিলেন, নিতাই, তুফানকে ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।

একান্ত সঙ্কোচভরে নিতাই বলিল, তুফান আর যাবে না আজ হুজুর। আপনাকে দেখেছে, আপনি সওয়ার না হ'লে—

রায় এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। ছোটগিন্নীর শুঁড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, লক্ষ্মী মেয়ে, মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে !

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ প্রত্যুষের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিচিত্র সঙ্গীতে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। সচকিত রায় ছোটগিন্নীর শুঁড়খানি নামাইয়া দিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যাণ্ড বাজে কোথায় রে ?

নিতাই মৃদুস্বরে জবাব দিল, গাঙুলীবাড়িতে বাবুর ছেলের ভাত।

অভ্যাসমত রায় বলিলেন, হুঁ।

তুফান তখন ঘাড় বাঁকাইয়া তালে তালে নাচিতে শুরু করিয়াছে। রায় মৃদু হাসিয়া তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। পিছনে ছোটগিন্নীর পায়ের শিকলও তালে তালে নূপুরের মত বাজিতেছিল, ঝুম ঝুম ঝুম।

রায় দেউড়ি পার হইয়া অন্ধকার পুরীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, এককালে ভোরের নহবতের সঙ্গে এমনই করিয়া নিত্য নাচিত – এক দিকে তুফান, অন্য দিকে ছোটগিন্নী।

দোতলায় উঠিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত!

হুজুর।

নায়েবকে ডেকে দে।

রায় ছাদে গিয়া বসিলেন। প্রৌঢ় নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া নীরবে সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, মহিম গাঙ্গুলীর ছেলের অন্নপ্রাশন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিমন্ত্রণপত্র করেছে বোধ হয়?

কুণ্ঠিতভাবে তারাপ্রসন্ন বলিল, হ্যাঁ।

একখানা গিনি আর থালা একখানা কাঁসার থালাই পাঠিয়ে দেবে।

তারাপ্রসন্ন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহার ছিল না। কিন্তু ব্যবস্থাটাও বেশ মনঃপূত হয় নাই।

রায় বলিলেন, মোহর একখানা আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো।

নায়েব চলিয়া গেল। রায় নীরবে বসিয়া রহিলেন। অনন্ত আসিয়া কলিকা পাল্টাইয়া দিয়া নলটি ধরিয়া বলিল, হুজুর!

রায় অভ্যাসমত হাতটি বাড়াইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, ছোটগিন্নীর পিঠের গদি, জাজিম, ঘণ্টা বের ক'রে দিবি। নায়েব যাবেন গাঙ্গুলীবাড়ি লৌকুতো দিতে।

তিন পুরুষ ধরিয়া রায়েরা করিয়াছিলেন সঞ্চয়। চতুর্থ পুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণসমুদ্রে তলাইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। শুধু এই মাত্রই নয়। রায়বংশ এই সপ্তম পুরুষে নির্বংশও হইয়া গেল। জেলার জজকোর্ট হাইকোর্টের বিচারের নির্দেশমত রায়বংশের লক্ষ্মী তখন ঝাঁপি হাতে দুয়ারে দাঁড়াইয়াছেন। অপেক্ষা

মাত্র প্রিভি কাউন্সিলের আদেশের।

পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষ্যে বিপুল উৎসবে রায়বাড়ি মুখরিত হইয়া উঠিল। দানভোজন বিলাসব্যসন চলিয়াছিল পূর্ণিমার জোয়ারের মত। তারপরই পড়িল ভাটা। ভাটার টানে রায়বংশের সমস্ত প্রবাহটুকু নিঃশেষ হইয়া গেল। সাত দিনের দিন বিলাস হইয়া উঠিল বিষ। বাড়িতে কলেরা দেখা দিল। তাহার পর সাত দিনের মধ্যে রায়-গিন্নী, দুই পুত্র, এক কন্যা, কয়েকজন আত্মীয় সব শেষ হইয়া গেল। শুধু বিশ্বম্ভর রায় বিন্ধ্যগিরির অগস্ত্য-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষার মত নতশিরে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ভুল বলা হইল। মৃত্যুর প্রতীক্ষা সেই দিন হইতে করিয়াছিলেন কিনা কে জানে, কিন্তু নতশির সেদিনও তিনি হন নাই। নতশির হইলেন আরও দুই বৎসর পরে। প্রিভি কাউন্সিলের রায় যেদিন বাহির হইল, সেই দিন। নতুবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যুর পরও এ বাড়িতে জলসাঘরে বাতি জ্বলিয়াছে, সেতার সারেঙ্গ ঘুঙুর বাজিয়াছে। বিপুল হাস্যধ্বনিতে নিশীথরাত্রি চকিত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ছোটগিন্নীর পিঠে শিকারের হাওদা চড়িয়াছে। তুফান সেদিনও রোষে ক্ষোভে দড়াদড়ি ছিঁড়িয়াছে।

যাক, প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে রায়বংশের ভূসম্পত্তি সব চলিয়া গেল। রহিল বাড়িঘর ও লাখরাজের কায়েমী বন্দোবস্তটুকু। রায়বংশের আদিপুরুষ এইটুকু কাগজের উপর কালির শিকলে এমন করিয়া বাঁধিয়াছিলেন যে, সেইটুকুতে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও হইল না। ওই বন্দোবস্তে দেবসেবা চলে, ছোটগিন্নীর বরাদ্দ চাল আসে, রহমতের বেতন হয়। মোট কথা, এখনও যেটুকু আছে, সে সেই বন্দোবস্তেরই কল্যাণে। এখন মাসের প্রথমেই চাল আসে—মাসবরাদ্দ বাদশাভোগ চাল, নিত্য প্রাতে লাখরাজ বিল বন্দোবস্তের দরুন আসে মাছ, ওই বিল হইতেই জলচর পাখীর বন্দোবস্তের ফলে আসে পাখী। এ সমস্ত অতীত, কিন্তু স্মরণাতীত নয়। তাই এই জীর্ণ ফাটল-ধরা রায়বাড়ির নাম এখনও রাজবাড়ি, শ্রীভ্রষ্ট বিশম্ভর রায়ের নামই এ অঞ্চলে রায়হুজুর।

সেটুকুই হইল নূতন ধনী গাঙুলীবাবুদের ক্ষোভের কারণ। তাঁহারা সোনার দেউল তুলিয়াছেন মরা-পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবী দেখে ওই মরা-পাহাড়কেই, সোনার দেউলের দিকে কেহ চায় না। তাঁহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধা হস্তিনীর খাতির বেশী।

মহিম গাঙুলী ভাবে, মরা-পাহাড়ের চুড়ো ভাঙতেই হবে আমায়।

ছোটগিন্নীর পিঠে ঘণ্টা উঠিতেই, সে গরবিণীর মত গা দোলাইতে আরম্ভ করিল। ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, ঢং—ঢং ঢং

নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। বিশ্বম্ভরবাবু বসিয়া ছিলেন অন্দরের হল-ঘরে। এখন এই একখানি ঘরই তিনি ব্যবহার করেন। দেওয়ালে রায়বংশের কর্তা-গিন্নীদের ছবি টাঙানো। সকলেরই প্রৌঢ় বয়সের প্রতিকৃতি। সকলেরই গায়ে কালী-নামাবলী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে জপমালা। বিশ্বম্ভরবাবু সেই ছবির দিকে চাহিয়া ছিলেন। নায়েবকে দেখিয়া ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া ডাকিলেন, অনন্ত, হাতবাক্সটা দে তো।

হাত-বাক্স হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি লইয়া সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিলেন। সিন্দুকের উপরের থাকে রায়বাড়ির লক্ষ্মীর ঝাঁপি শোভা পাইতেছিল। নীচের থাকে দুই-তিনটি বাক্স। রায় টানিয়া বাহির করিলেন একটি অতি সুদৃশ্য বাক্স। এটি তাঁহার মৃতা পত্নীর গহনার বাক্স। রায় বাক্সটি খুলিলেন। বাক্সটির গর্ভ প্রায় শূন্য। অলঙ্কারের মধ্যে একটি সিঁথি রহিয়াছে। এই সিঁথিটি সাতপুরুষের বধূবরণের মাঙ্গলিক সামগ্রী। ওইটি ছাড়া সব গিয়াছে। পাশের একটি খোপে কয়খানি মোহর।

এগুলির কয়খানি রায়-গিন্নীর আশীর্বাদের মোহর, কয়খানা যুবক বিশ্বম্ভরের পত্নীকে প্রথম উপহার। বিবাহের বৎসরে প্রথম তিনি মহালে যান। নজরানার মোহর হইতে কয়খানা তিনি পত্নীকে উপহার দিয়াছিলেন। তাহারই একখানা লইয়া নায়েবের হাতে তিনি নিঃশব্দে তুলিয়া দিলেন। নায়েব চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ছোটগিন্নীর ঘণ্টার শব্দ সুউচ্চ হইয়া উঠিল। রায় আসিয়া জানালায় দাঁড়াইলেন।

ছোটগিন্নীর মাথায় তেল দেওয়া হইয়াছে—ললাটে তৈলসিক্ত অংশটুকু ঘিরিয়া সিঁদুরের রেখা আঁকা। ছোটগিন্নী হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে।

অপরাহ্নে গাঙুলীদের ঝকঝকে মোটরখানা আসিয়া লাগিল রায়বাড়ির ভাঙা দেউড়িতে। গাড়ি হইতে নামিলেন মহিম গাঙুলী নিজে। নায়েব তারাপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আসুন, আসুন।

অনন্তও দোতালা হইতে ঘটনাটা দেখিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া রায়বাড়ির খাস বৈঠকখানার দরজাটা খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মহিম কহিল, ঠাকুরদা কোথায় দেখা করব যে!

গাঙুলীবংশ চিরদিন রায়-দপ্তরের এলাকায় মহাজনি করিয়াছে। মহিমের

পিতা জনার্দন পর্যন্ত রায়বাড়ির কর্তাকে বলিয়াছে হুজুর। তারাপ্রসন্ন মহিমের কথার ভঙ্গীতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মুখে মিষ্টভাবেই বলিল, হুজুর এখনও ওঠেন নি। খেয়ে শুয়েছেন।

মহিম বলিল, ডেকে তুলতে ব'লে দিন।

তারাপ্রসন্ন শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, সে সাহস আমাদের কারও নেই। আপনি বরং ব'লে যান আমাকে কি বলতে হবে, আমি বলব।

অসহিষ্ণুভাবে মহিম বলিল, না, আমাকে দেখা করতেই হবে।

অনন্ত আসিয়া রূপার গ্লাসে গাঙুলীর সম্মুখে শরবত ধরিল।

গ্লাসটি লইয়া মহিম অনন্তকে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদা উঠেছেন রে?

উঠেছেন। আপনার খবর দিয়েছি। ডাকছেন আপনাকে তিনি।

শরবত পান করিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, চমৎকার গন্ধটুকু তো! কিসের শরবত রে?

অনন্ত মিথ্যা কথা বলিল, আজ্ঞে, কাশীর মসলা, আমি জানি না ঠিক।

দোতলায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই মহিম বলিল, কই ঠাকুরদা, আপনি যে খেতে গেলেন না?

বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিলেন, এস এস, বস ভাই।

মহিম বলিল, আমার ভারি দুঃখ হয়েছে ঠাকুরদা।

তেমনই হাসিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, বুড়ো ঠাকুরদাদা ব'লে ভুলে যাও ভাই। বুড়ো মানুষ, নিয়মের ব্যতিক্রম দেহে সহ্য হয় না।

মহিম বলিল, সে দুঃখ ভুলব কিন্তু রাত্রে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।

বিশ্বম্ভর ফরসি টানার ভানে নীরব রহিলেন।

মহিম বলিয়া গেল, শখ ক'রে লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজী আনিয়েছি। তাদের গানের কদর আপনি ভিন্ন আমরা বুঝব না।

কিছুক্ষণ নীরবে তামাক টানিয়া নলটি রায় রাখিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, শরীর আমার বড় খারাপ ভাই মহিম, বুকে একটা ব্যথা হয়েছে ইদানীং, সেটা মাঝে মাঝে বড় কাতর করে আমাকে।

মহিম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তা হ'লে উঠি ঠাকুরদা। আমায় যেতে হবে একবার সদরে। সাহেব-সুবোদের নিয়ে আসতে হবে আবার, তাঁরা সব আসবেন কিনা।

বিশ্বম্ভর শুধু বলিলেন, দুঃখ ক'রো না ভাই।

মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বারান্দায় একবার দাঁড়াইয়া সহসা

বলিয়া উঠিল, বাড়িটা ক'রে রেখেছেন কি ঠাকুরদা, মেরামত করানো দরকার যে।

সে কথার কেহ জবাব দিল না।

অনন্ত শুধু বলিল, আসুন হুজুর।

গাঙুলীবাড়িতে নাচের আসর আলোর ঐশ্বর্যে ঝকমক করিতেছিল। চাঁদোয়ার চারিপাশে নানা রঙের আলো। গাঙুলীদের নিজেদের 'ডায়নামো'। ইলেক্ট্রিক তারের লাইন বাড়াইয়া আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খুঁটিগুলি গাছের পাতা ও ফুল দিয়া সাজানো। রঙিন কাগজের মালা চারিপাশে বেড়িয়া ঝুলিতেছে। নীচে শতরঞ্জির উপর চাদর বিছাইয়া আসর পড়িয়াছে। এক দিকে সারি সারি চেয়ার, অন্য দিকে ঢালা বিছানায় সাধারণ শ্রোতাদের বসিবাব স্থান। খানিক দূরে মেয়েদের আসর।

রাত্রি আটটার মধ্যেই আসর ভরিয়া গেল। তবলচী, সারঙ্গী আপন আপন যন্ত্রের সুর বাঁধিতেছিল। দুইজন পশ্চিমা নর্তকী পেশোয়াজ-ওড়নায়-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া আসরে আসিয়া বসিল। আসরের কোলাহল মুহূর্তে নীরব হইয়া গেল। হাঁ, রূপ বটে!

গান আবন্ত হইল। ওদিকে চেয়ারে বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে মহিম গাঙুলী বসিয়া।

দুইজন নর্তকার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা উঠিয়া গান ধরিয়াছিল। দীর্ঘ সুরে রাগিণীর আলাপে আসরখানা যেন ঝিমাইয়া আসিল। শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু কথাবার্তা শুরু হইয়া গেল। বিশিষ্ট শ্রোতামহলে কি একটা হাস্যপরিহাস চলিতেছিল। গাঙুলীবাড়ির চাপরাসীর দল সাধারণ শ্রোতাদের পিছনে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া উঠিল, চুপ চুপ!

গান শেষ হইবার মুখে মহিম ভদ্রতা করিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ—বাঃ! নর্তকীর নৃত্যগতি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। গান শেষ করিয়া সে বসিয়া পড়িল। তরুণীটির সহিত মৃদু হাসিয়া কি কয়টা কথা বলিয়া এবার তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল।

দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। চপলগতির কণ্ঠসঙ্গীতে ও চটুল নৃত্যভঙ্গীতে যেন একটা পাহাড়ী ঝরনা আসরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারিফে তারিফে আসরের মধ্যে একটা কলরোল উঠিল। বিশিষ্ট শ্রোতামহল হইতে টাকা নোট বকশিশ আসিল।

তারপর আবার - আবার - আবার। আর আসর অলসমন্থর হয় নাই। আসর ভাঙিলে মহিম ডাকিয়া বলিল, সকলে খুব খুশী হয়েছেন।

সেলাম করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, আপনাদের মেহেরবানি।

সত্যই মহিমের মেহেরবানির অন্ত ছিল না। তিনদিন বায়নার স্থলে পাঁচদিন গাওনা হইয়া তবে শেষ হইল।

বিদায়ের দিন আরও মেহেরবানি সে করিল। বিদায় করিয়া বলিয়া দিল, এখানে আমাদের রাজবাড়ি আছে, একবার ঘুরে যেয়ো। বিশ্বম্ভর রায় সমঝদার অমীর লোক। গাওনা হয়তো হতে পারে।

বয়োজ্যেষ্ঠা সম্ভ্রমভরে কহিল, ওঁর কথা আমরা শুনেছি হুজুর। জরুর যাব রাজাবাহাদুরের দরবারে। সে মতলব আমার প্রথম থেকেই আছে।

তারাপ্রসন্ন মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল, এ ওই কুটিল মহিম গাঙুলীর কূট চাল। অবশেষে একটা বেশ্যাকে দিয়া অপমানের চেষ্টা করিয়াছে। সে গম্ভীরভাবে বলিল, বাবুর তবিয়ৎ অচ্ছা নেই - নাচগান এখন হবে না।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাইজাটি বলিল, মেহেরবানি করকে—

বাধা দিয়া তারাপ্রসন্ন বলিল, সে হয় না।

বাইজী দুঃখিতভাবে বলিল, মেরে নসীব।

তাহারা উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

এমন সময় দোতলা হইতে হাঁক আসিল, তারাপ্রসন্ন!

তারাপ্রসন্ন আসিতেই বিশ্বম্ভর বলিলেন, কে ওরা?

নতমুখে তারাপ্রসন্ন উত্তর দিল, গাঙুলীদের বাড়ি ওরাই এসেছিল মুজরো করতে।

হুঁ। তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, শুধু ফিরিয়ে দিলে?

সেলাম পৌঁছে হুজুরকো পাশ।—মুসলমানী কায়দায় আভূমিনত অভিবাদন করিয়া বাইজী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কাছারিঘর হইতে এদিকের বারান্দা ও ঘরের খানিকটা দেখা যায়। বিশ্বম্ভরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাইজী তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিয়াছে।

এত্তালা না দিয়া উপরে উঠিয়া আসার জন্য বিশ্বম্ভর রুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে রাগ রহিল না। বাইজীর রূপ তাঁহার চিত্ত কোমল করিয়া দিল।

বাইজী আবার অভিবাদন করিয়া বলিল, কসুর মাফ করতে হুকুম হয়

মেহেরবান, এত্তালা না দিয়ে এসে পড়েছি।

বিশ্বম্ভর দেখিতেছিলেন বাইজীর রূপ। দাড়িমের দানার মত রঙ, সুর্মা-আঁকা টানা দুইটি চোখ মাদকতা-ভরা চাহনি, গোলাপের পাপড়ির মত দুই ঠোঁট, ঈষৎ দীর্ঘ দেহখানি, ক্ষীণ কটি, নৃত্য যেন আলস্যভরে দেহখানিতে বিরাম লইয়াছে। এ চঞ্চল হইলেই সে মুখর হইয়া উঠিবে।

বিশ্বম্ভর প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, বৈঠিয়ে।

অদূরবর্তী গালিচার উপর বাইজী সসম্ভ্রমে বসিয়া বলিল, হুজুর বাহাদুরের দরবারে বাঁদা গান শোনাবার জন্য হাজির।

বিশ্বম্ভর বলিতে গেলেন, তাঁহার তবিয়ৎ খারাপ। কিন্তু কেমন লজ্জা হইল, একটা তওয়াইফের সম্মুখে মিথ্যা বলিতে বুঝি ঘৃণা হইল।

বাইজী বলিল, সবাব মুখে শুনেছি, এখানকার বড ভারি সমঝদার হুজুর বাহাদুর। গাঙ্গুলীবাবুও বললেন আমীর, এখানকার রাজা আপনি।

রায়ের নলের ডাক বন্ধ হইয়া গেল। মৃদু হাসিয়া বাইজীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হবে মজলিস সন্ধ্যার সময়। তারপর ডাকিলেন, অনন্ত!

অনন্ত বাহিরেই ছিল। সম্মুখে আসিতেই বলিলেন, এঁদের বাসা দিয়ে দে। নীচে তালুকদারের ঘর একখানা খুলে দে।

অনন্ত বলিল, আসুন।

বাংলা বলিতে না পারিলেও বাংলা বুঝিতে বাইজীর কষ্ট হইল না। উঠিয়া অভিবাদন করিয়া সে কহিল, বহুৎ নসীব মেরে—বহুৎ মেহেরবানি হুজুরকো।

অনন্তকে অনুসরণ করিয়া সে চলিয়া গেল।

নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া ছিল—নির্বাক হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে কহিল, গাঙ্গুলীদের বাড়ি এক শো টাকা ক'রে রাত্রি নিয়েছে ওরা।

হুঁ।

কয়বার নলে টান দিয়া বলিলেন, তোমার তহবিলে কি—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি আবার নলে টান দিতে আরম্ভ করিলেন। তারাপ্রসন্ন বলিল, দেবোত্তরের তহবিলে শুধু শ-দেড়েক টাকা আছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া রায় উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া বাহির করিলেন সেই বাক্সটি। বাক্সের মধ্য হইতে রায়-বংশের মাঙ্গলিক সিঁথিখানি তুলিয়া তারাপ্রসন্নের হাতে দিয়া বলিলেন, দেবোত্তরের খাতায় খরচ লেখ—আনন্দময়ীর জন্য জড়োয়া সিঁথি খরিদ, দাম ওই দেড় শো টাকা।

আনন্দময়ী রায়-বংশের ইষ্টদেবী পাষাণময়ী কালী।

বহুদিন পর নিস্তব্ধ রায়বাড়ি তালা খোলার শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। জলসাঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া গেল। বাতিঘরের তালা খুলিল। ফরাশঘরে আলোক প্রবেশ করিল।

অনন্ত ঘর-দুয়ার ঝাড়িতেছিল। সাহায্য করিতেছিল নিতাই ও রহমৎ। ঠাকুরবাড়ির পুরানো ঝি মাজিতেছিল—আসাসোঁটা, গড়গড়া, বড় বড় পরাত, গোলাপপাশ, আতরদান। নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া সমস্ত দিকের তদারক করিতেছিল।

অনন্ত বলিল, সদরে লোক পাঠাতে হবে নায়েববাবু।

নায়েব বলিল, ফর্দ করেছি আমি। শোন দেখি, কিছু ভুল হল কি না?

ফর্দ শুনিয়া অনন্ত কহিল, সবই হয়েছে, বাদ পড়েছে দুটো জিনিস। ভরি দুই আতর আর বিলিতী বোতল কটা।

নায়েব বলিল, ছিল তো একটা।

তাতে আর খানিকটা আছে। মাঝে মাঝে একটু একটু এক-এক দিন খান তো। কিন্তু আজ যদি চান, তবে একটা বোতলে হবে না নায়েববাবু।

নায়েব বলিলেন, কিন্তু পাঠাই কাকে? পায়ে হেঁটে সন্ধ্যের আগে কি ফিরবে?

অনন্ত দ্বিধাভরে বলিল, তুফানকে নিয়ে নিতাই-ই নয় যাক।

নিতাই বলিল, হুজুর হুকুম না করলে --

নায়েব বলিল, আচ্ছা, আমি বলে আসছি।

বিশ্বম্ভরবাবু শুইয়া ছিলেন। নায়েব গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম। একবার গাঙুলীবাড়িতে যাও, মহিমকে নিমন্ত্রণ করে এস। আর গ্রামে ভদ্রলোক বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করতে হবে। গাঙুলীবাড়ি যাও তুমি নিজে।

নায়েব বলিল, তাই যাব।

রায় বলিল, ছোটগিন্নীর পিঠে গদি দিতে বল।

নায়েব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, তুফানকে নিয়ে নিতাইকে পাঠানো দরকার সদরে।

হুঁ।

কিছুক্ষণ পরে রায় বলিলেন, তাই যাক।

আরও কিছুক্ষণ পর তুফানের হ্রেষা শুনিয়া রায় সম্মুখের জানালাটা খুলিয়া

দিলেন। বাড়ির পিছন দিয়া দেবদারুছায়াচ্ছন্ন রায়েদের নিজস্ব পথখানি পরিষ্কার দেখা যায়। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ সে পথে বাজিয়া উঠিল। রায় দেখিলেন, ঘাড় বাঁকাইয়া দীপ্ত পদক্ষেপে তুফান দুর্দান্তপনা করিতে করিতে চলিয়াছে। তেমনই বাঁকানো ঘাড়, তেমনই পদক্ষেপ।

আরও কিছুক্ষণ পর ছোটগিন্নীর পিঠের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

রায় উঠিয়া বসিলেন। জানালা দিয়া দেখিলেন, গরবিণী ছোটগিন্নী চলিয়াছে। রায় বিছানা ছাড়িয়া ঘরের মেঝের উপর পদচারণা আরম্ভ করিলেন। দেহ-মন কেমন তাঁহার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

সমারোহ! রায়বাড়িতে বহুদিন পরে সমারোহ!

ওদিকের জলসাঘর হইতেই বোধ করি শব্দ আসিতেছিল - ঠুং—ঠাং - ঠুং - ঠাং। বেলোয়ারী ঝাড়ের শব্দ। রায় ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলেন। অনন্ত ঝাড় দেওয়ালগিরি হুকে হুকে টাঙাইতেছিল। পদশব্দে দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুয়ারে দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর রায়। তিনি চাহিয়া আছেন দেওয়ালের ছবিগুলির দিকে। প্রকাণ্ড হলের চারিদিকের প্রাচীর-বিলম্বিত রায়বংশের মালিকদের যুবাবয়সের প্রতিকৃতি। আদিপুরুষ ভুবনেশ্বর রায় হইতে তাঁহার নিজের পর্যন্ত—সকলেরই বিলাস ও ব্যসনে মত্ত প্রতিকৃতি। প্রপিতামহ রাবণেশ্বর রায় দাঁড়াইয়া আছেন - শিকার-করা বাঘের উপর পা রাখিয়া, হাতে সড়কি-বল্লম, পিঠে ঢাল। পিতা ধনেশ্বর বসিয়া আছেন গদির উপর, পাশে বসিয়া ছোটগিন্নী। যুবক বিশ্বম্ভর তুফানের উপর আরূঢ়।

রায়বংশ এই ঘরে ঝড়ের খেলা খেলিয়া গিয়াছেন। রায়ের মনে পড়িল কত কথা। দুর্দান্ত রাবণেশ্বর এ বংশের প্রথম ভোগী পুরুষ। তিনিই এই জলসাঘর তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। কিন্তু ভোগ করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। প্রথম যে দিন এই জলসাঘরে তিনি মজলিস করিয়াছিলেন, সেই দিনই রাবণেশ্বরের স্ত্রী-পুত্র সব শেষ হইয়াছিল। বাতিদানের বাতি অর্ধদগ্ধ অবস্থাতেই নিবিয়াছিল। তারপর আর তিনি সাহস করিয়া জলসাঘরের দুয়ার খোলেন নাই।

সেই দিন রায়বংশের শেষ হইলেই যেন ভাল হইত। কিন্তু রাবণেশ্বর রায়-বংশের মমতায় পুনরায় আপনার শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, এ তাঁহার আনন্দময়ীর আদেশ। তাঁহারই পুত্র তারকেশ্বর এই জলসাঘরের দুয়ার খুলিয়া আবার বাতি জ্বালিয়াছিলেন। তিনি এক রাত্রে এই ঘরে এক আমীর বন্ধুর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পাঁচ শত মোহর এক বাইজীকে বকশিশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথা মনে পড়িল—চন্দ্রা,

চন্দ্রাবাই! আসর ভাঙার পর বন্ধুদের লুকাইয়া চন্দ্রার সহিত আলাপ বুকের মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে। ফুলের স্তবকের মত চন্দ্রা!

অনন্তের হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনিবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাত আর সরিতেছিল না। রায়ের মুখখানা থমথমে রাঙা—যেন কোন রুদ্ধমুখ শিরা খুলিয়া আবদ্ধ রক্তধারা সে মুখে উৎসের মত আজ উথলিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্বে অনন্ত পরাতের উপর রূপার গ্লাসে শরবত বসাইয়া রায়ের সম্মুখে নিঃশব্দে ধরিয়া দিল। রায় চাহিয়া দেখিলেন, অনন্তের অঙ্গে জরিদার চোপদারের উর্দি, কোমরে পেটি, মাথায় পাগড়ি, বুকে রায়বাড়ির তকমা। তিনি নিঃশব্দে গ্লাসটি উঠাইয়া লইলেন। অনন্ত চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সম্মুখে কোঁচানো ধুতি, শুভ্র ফিনফিনে মিহি মুসলমানী ঢঙের পাঞ্জাবি, রেশমের চাদর নামাইয়া রাখিল। রায় চিনিলেন, পাঁচ বৎসর পূর্বে মুরশিদাবাদে জমিদার বন্ধুর বাড়ি যাইবার সময় এই পোশাক তৈয়ার হইয়াছিল।

প্রশ্ন করিলেন, সব ঠিক আছে?

মৃদুস্বরে অনন্ত বলিল, বাতি জ্বালা হচ্ছে।

লোকজন?

অনন্ত বলিল, নাখরাজদার ভাণ্ডারীরা বাপ-বেটায় এসেছে। দেবোত্তরের নাখরাজদার পাইক এসেছে চারজন, তারা দেউড়িতে আছে।

নীচে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল।

অনন্ত ত্রস্তপদে নীচে চলিয়া গেল। মহিম গাঙুলী আসিয়াছে। সিঁড়ির বুকে চলা-ফেরার শব্দ শোনা যায়। নীচের তলায় অতিথি-অভ্যর্থনার সাদর সম্ভাষণ, পরস্পরের সহিত আলাপের গুঞ্জন উঠিতেছে। ক্রমে জলসাঘরে তারের যন্ত্রের মৃদু সুর জাগিয়া উঠিল। তবলার ধ্বনিও শোনা গেল। সুর বাঁধা হইতেছে।

অনন্ত আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, হুজুর!

বিশ্বম্ভর বেশ পরিবর্তন করিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছিলেন। উত্তর দিলেন, হুঁ?

আসর বসতে পারছে না।

হুঁ।

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি বলিলেন, জুতো দে।

অনন্ত ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটু ইতস্তত করিয়া নীরবে কোণের টেবিলের

দেরাজ খুলিয়া বোতল ও গ্লাস বাহির করিল। দেরাজের উপরে সেগুলি নামাইয়া দিয়া সে জুতা বাহির করিয়া ঝাড়িতে বসিল। রায় একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আবার পায়চারি শুরু করিলেন। নীচে যন্ত্রসঙ্গীতের সুর ক্রমশ উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল।

অনন্ত ডাকিল, হুজুর!

রায় শুধু বলিলেন, হুঁ।

আবার কয়বার তিনি ঘুরিলেন। সে গতি যেন ঈষৎ দ্রুত। অনন্ত প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে রায় টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, সোডা।

প্রকাণ্ড বড় হলটার তিন দিকে লম্বা ফালির মত গদি পাতিয়া তাহাব উপর জাজিম বিছাইয়া শ্রোতাদের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। পিছনে সারি সারি তাকিয়া। হলের ছাদে পাশাপাশি তিনটি বেলোয়ারী ঝাড়ে বাতি জ্বলিতেছিল। দেওয়ালে দেওয়ালে দেওয়ালগিরিতে বাতির আলো বাতাসে ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ঝাড় ও দেওয়ালগিরির কতকগুলি শেজ না থাকায় বাতাসে বাতিগুলি নিবিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে তাই মধ্যে মধ্যে স্বল্পম্লান ছায়াবেখা দীর্ঘাকারে জাগিয়া উঠিতেছে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার মত।

আসর বসিয়াছে—কিন্তু গতি এখনও অতি মৃদু। যন্ত্রবাদ্যের ঝঙ্কার অঙ্কুরের মত সবে দেখা দিয়াছে। চারিপাশের আসরে বসিয়া ত্রিশ চল্লিশজন ভদ্রলোক মৃদু গুঞ্জনে আলাপ করিতেছেন। চার-পাঁচটা গড়গড়া-ফরসিতে তামাক চলিতেছে। তওয়াইফ দুইজন নীরবে বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে কেবল মহিম গাঙ্গুলীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সিগারেটে টান দিয়া সে নিবন্ত বাতি-গুলার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কটা বাতি নিভে গেল যে হে! কেহ এ কথার জবাব দিল না। সে ডাকিল, নায়েববাবু! তারাপ্রসন্ন দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে বলিল, দেখুন আলো বেশ খোলে নি। আমার ড্রাইভারকে ব'লে দিন, দুটো পেট্রোম্যাক্স নিয়ে আসুক।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল। বয়োজ্যেষ্ঠা নর্তকীটি কেবল উর্দুতে বলিল—যেন স্বগতোক্তি করিল, এ ঘরে সে আলো মানায় কি!

বাহিরে ভারী পায়ের জুতোর আওয়াজে নায়েব পিছনে চাহিয়া দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত পরেই অনন্তের পিছনে দরজার সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইলেন বিশ্বম্ভর রায়। বাইজী দুইজন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মজলিসের সকলেও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মহিমও আপনার অজ্ঞাতসারে অর্ধোত্থিত হইয়া হঠাৎ আবার বসিয়া পড়িল।

রায় স্বল্প হাসিয়া বলিলেন, আমার একটু দেরি হয়ে গেল। তারপর তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া মহিম সেটাকে সরাইয়া দিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাকিয়াটাকে কয়েকবার ঝাড়িয়া লইয়া বিরক্তিভরে সে বলিল, বাপরে বাপ, কি ধুলো! তারাপ্রসন্ন আতর বিলি করিয়া গেল। সমস্ত গড়গড়া-ফরসির কলিকা বদল করিয়া রায়ের সম্মুখে তাঁহার নিজের ফরসি নামাইয়া অনন্ত হাতে নল তুলিয়া দিল।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাইজী কুর্নিশ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। সেই দীর্ঘ মন্থর গতিতে রাগিণীর আলাপ। কিন্তু একটু বৈচিত্র্য ছিল। আসর আজ নিস্তব্ধ। রায় চোখ মুদিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। গানের দীর্ঘ মন্থর গতির সমতায় বিশাল দেহ তাঁহার ঈষৎ দুলিতেছে। থাকিতে থাকিতে তাঁহার বাম হাতখানি উদ্যত হইয়া পাশের তাকিয়াটির উপর একটি মৃদু আঘাত করিল। ঠিক ওই সঙ্গে তবলাটির চর্মবাদ্য ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। রায় চোখ মেলিলেন, বাইজীর পায়ের ঘুঙুর মৃদু সাড়া দিয়াছে। নৃত্য আরম্ভ হইল। কলাপীর নৃত্য। আকাশে মেঘ দেখিয়া উতলা ময়ূরীর মত নৃত্যভঙ্গী! গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়াছে, দুই হাতে পেশোয়াজের দুই প্রান্ত আবদ্ধ, পেখমের মত তালে তালে নাচিতেছে। চরণে ঘুঙুর বাজিয়া উঠিল।

রায় বলিয়া উঠিলেন, বাঃ!

সঙ্গে সঙ্গে নর্তকীর নৃত্যমুখর চরণচাপল্য স্থির হইয়া গেল। ওদিকে তবলায় পড়িল সমাপ্তির আঘাত।

মহিম সরিয়া আসিয়া রায়ের কানে কানে বলিল, ঠাকুরদা, আসর যে জমছে না, গলা শুকিয়ে এল! কৃষ্ণাবাই সব ঠাণ্ডা ক'রে দিলে যে!

কৃষ্ণাবাই ঈষৎ হাসিল, বোধ করি সে বুঝিল। অনন্ত শরবত আনিয়া মহিমের সম্মুখে ধরিয়াছিল। মহিম কহিল, থাক, কদিন রাত্রি জেগে সর্দি ক'রে আছে আমার।

রায় ঈষৎ হাসিয়া অনন্তকে ইঙ্গিত করিলেন।

অনন্ত ফিরিয়া গিয়া বড় একটা পরাতের উপর হুইস্কি, সোডার বোতল, গ্লাস লইয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

পানীয় প্রস্তুত করিয়া অনন্ত মহিমকে দিয়া দ্বিতীয় গ্লাস তুলিয়া আসরের

দিকে চাহিল। সকলে নতশির হইয়া বসিয়া ছিল। সে বিশ্বম্ভরবাবুর সম্মুখে সসম্ভ্রমে পানীয় অগ্রসর করিয়া ধরিল। নীরবে রায় গ্লাসটি ধরিলেন। মহিম অনেকক্ষণ ধরিয়া তরুণী বাইজীকে লক্ষ্য করিতেছিল, একটু নড়িয়া বসিয়া বলিল, পিয়ারীবাই, এবার তুমি একবার আগুন ছড়িয়ে দাও দেখি!

পিয়ারী গান ধরিল। জলদ গতি রায় চোখ মুদিয়া ছিলেন, একবার কেবল ফাঁকের ঘরে বলিলেন, জেরা ধীরসে।

কিন্তু অভ্যাসের বশে পিয়ারী চটুল নৃত্যে, চপল সঙ্গীতে মজলিসের মধ্যে যেন অজস্র লঘু ফেনার ফানুস উড়াইয়া দিল। মহিম মুহুর্মুহু হাঁকিতে লাগিল, বহুৎ আচ্ছা!

রায়-কর্তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিমের সঙ্গতি ছাড়া উচ্ছ্বাস তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল।

কিন্তু তবু তিনি দুলিতেছিলেন সঙ্গীতমুগ্ধ অজগরের মত। দেহের মধ্যে শোণিতের ধারা রায়বংশের শোণিতের অভ্যস্ত উগ্রতায় বেগবতী হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী নাচিতেছে বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতির মত। পিয়ারীকে দেখিয়া মনে পড়ে লক্ষ্ণৌয়ের জোহরার কথা। কৃষ্ণার সঙ্গে সাদৃশ্য দিল্লীওয়ালী চন্দ্রাবাইয়ের। চন্দ্রাবাই তাঁহার জীবনের একটা অধ্যায়। পিয়ারীর নৃত্য শেষ হইল। রায় ভাবিতেছিলেন অতীতের কথা। চিন্তা ভাঙিয়া গেল টাকার শব্দে। মহিম পিয়ারীকে বকশিশ দিল। মহিম নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। প্রথম ইনাম দিবার অধিকার গৃহস্বামীর। চকিত হইয়া রায় সম্মুখে পাশে চাহিলেন। নাই সম্মুখে রূপার পরাত নাই—আধারও নাই, আধেয়ও নাই। মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণাবাই তখন গান ধরিয়াছে। আসরের এক প্রান্ত পর্যন্ত তরঙ্গের মত তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া ফিরিতেছিল। তাহার গতি-তাড়িত বায়ুতরঙ্গ শ্রোতাদের বুকে আঘাত করিতেছে। সে গাহিতেছিল—কানাইয়ার বাঁশী বাজিয়াছে; উচ্ছ্বসিত যমুনা উজানে ফিরিল; তরঙ্গের পর তরঙ্গাঘাতে তটভূমি ভাঙিয়া কানাইয়াকে সে বুকে টানিয়া লইতে চায়। সে সঙ্গীত ও নৃত্যের উচ্ছ্বাস অপূর্ব! রায় সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গত শেষ হইল। রায় বলিয়া উঠিলেন, বহুৎ আচ্ছা চন্দ্রা!

কৃষ্ণা সেলাম করিয়া কহিল, বাঁদীকে নাম কৃষ্ণাবাই।

ওদিক হইতে মহিম ডাকিল, কৃষ্ণাবাই, থোড়া ইনাম ইধার।

রায় উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। ধীর পদক্ষেপে মজলিস অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বারান্দার বুকে পাদুকাশূন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া

মিলাইয়া গেল।

মহিম বলিল, পিয়ারীবাই, এবার তোমার আর একখানা।

কৃষ্ণা বলিল, হুজুর-বাহাদুরকে আনে দিজিয়ে।

মহিম বলিল, আসছেন তিনি, তার আর কি! ওই—ওই বোধ হয় আসছেন তিনি।

রায় নয়—প্রবেশ করিল নায়েব তারাপ্রসন্ন। একটি রূপার রেকাবি আসরে সে নামাইয়া দিল। রেকাবের উপর দুইখানি মোহর।

নায়েব বলিল, বাবু ইনাম দিলেন।

মহিম অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, তিনি কই?

তাঁর বুকে ব্যথা ধরেছে। তিনি আর আসতে পারবেন না। আপনারা গান শুনুন। তিনি মাফ চেয়েছেন সকলের কাছে।

মজলিসের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন উঠিল।

মহিম উঠিয়া তাচ্ছিল্যময় আলস্যভরে একটা আড়মোড়া ভাঙিয়া বলিল, উঠি তারাপ্রসন্ন। কাল আবার সাহেব আসবেন।

তারাপ্রসন্ন আপত্তি করিল না। অপর সকলেও উঠিয়া পড়িল। মজলিস ভাঙিয়া গেল।

ঘরের মেঝের উপর রায়-গিন্নার হাতবাক্সটা খোলা পড়িয়া ছিল। গর্ত তাহার শূন্য। রায় নিজে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন উন্নতশিরে। রায়বাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উত্তেজনায়, সুরার উগ্রতায় দেহের রক্ত যেন ফুটিতেছিল। স্থান কাল আজ সব ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। অন্যমনস্কভাবে তিনি ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। জলসাঘরের আলোকের দীপ্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। আবার আসিয়া তিনি জলসাঘরে প্রবেশ করিলেন। শূন্য আসর। দেওয়ালের বুকে শুধু জাগিয়া আছেন রায়বংশধরগণ। বিশ্বম্ভর খোলা জানালার দিকে চাহিলেন। জ্যোৎস্নায় ভুবন ভাসিয়া গিয়াছে। বসন্তের বাতাসের সর্বাঙ্গে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ মাখা। কোথায় কোন্ গাছে বসিয়া একটা পাপিয়া অশ্রান্ত ঝঙ্কার তুলিয়া ডাকিতেছে, পিউ-কাঁ-হাঁ—পিউ-কাঁ-হাঁ! রায়ের মনের মধ্যে সঙ্গীত গুঞ্জন করিয়া উঠিল। বহুদিনকার ভুলিয়া-যাওয়া চন্দ্রার মুখের বেহাগ শুনু যা শুনু যা পিয়া -। মাথার উপরে চাহিয়া দেখিলেন, চাঁদ মধ্যগগনে। পদশব্দে পিছন ফিরিলেন। অনন্ত বাতি নিবাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

রায় নিষেধ করিলেন, বলিলেন, থাক্।

অনন্ত চলিয়া যাইতেছিল। রায় ডাকিলেন, এস্রাজটা এনে দে আমার।

অনন্ত এস্রাজ লইয়া আসিল। জানালার সম্মুখে এস্রাজ-কোলে রায় বসিয়া বলিলেন, ঢাল্।

পরাতের উপর খোলা বোতল পড়িয়াছিল রায় ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন। পানীয় দিয়া অনন্ত চলিয়া গেল।

এস্রাজের তারের বুকে ছড়ির টান পড়িল। নিস্তব্ধ পুরীর মধ্যে সুর জাগিয়া উঠিল। বিভোর হইয়া রায় এস্রাজ বাজাইয়া চলিয়াছেন। এস্রাজ কি কথা কহিয়া উঠিল? মৃদু ভাষা যে স্পষ্ট শোনা যায়।

গানের কথাগুলি রায়ের কানে বাজিতেছিল – নিশীথরাত্রে হতভাগিনী বন্দিনী, দুয়ারের পাশে প্রহরায় জাগিয়া বিষাক্ত ননদিনী! নয়নে আমার নিদ্রা আসে না, নিদ্রার ভানে আমি তোমারই রূপ ধ্যান করি, হে প্রিয়, এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে?

রায় এস্রাজ ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মৃদুস্বরে তিনি ডাকিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা!

তাঁহার চন্দ্রা! এ গানও যে চন্দ্রার! বাহির হইতে মিঠা গলায় কে ডাকিল, জনাব!

রায় ব্যগ্রভাবে ডাকিলেন, চন্দ্রা চন্দ্রা, আও, ইধর আও। দোস্ত লোক চলা গিয়া। চন্দ্রা!

কৃষ্ণা স্মিত সলজ্জ মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া অতি মধুর করিয়া যে গানটি তিনি এস্রাজে বাজাইতেছিলেন, তাহার শেষ চরণ গাহিল—হে প্রিয় এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে? হাসিয়া রায় তাঁহার মোটা গলা যথাসম্ভব চাপিয়া গান ধরিলেন, ওগো প্রিয়া, এমন রাত্রি, বুকে আমার বিজয়োল্লাস, একা কি আজ থাকা যায়?

রায় বোতলের ছিপি খুলিতেছিলেন। হাত বাড়াইয়া কৃষ্ণাবাই বলিল, জনাবকে হুকুম হোয়ে তো বাঁদী দে শক্তে হেঁ। মৃদু হাসিয়া রায় বোতল ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণা বোতল খুলিয়া দিল। মদ ঢালিয়া গ্লাস রায়বাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

আবার এস্রাজের সুর উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা মৃদুস্বরে গান ধরিল। কৃষ্ণা গাহিতে গাহিতে নাচিতে আরম্ভ করিল। সে গাহিল—হে প্রিয়, ঝরা ফুলের মালা আমি গাঁথি না; উচ্চ শাখায় ওই যে ফুলের স্তবক, ওই আমায় দাও;

আমায় তুমি তুলিয়া ধর, আমি নিজে চয়ন করিব তোমার জন্ত। ঊর্ধ্বমুখে হাত দুইটি বাড়াইয়া সে নাচিতেছিল। রায় এস্রাজ ফেলিয়া টপ করিয়া হাতের মুঠাতে কৃষ্ণার পা দুইটি ধরিয়া উচ্চে তুলিয়া তালে তালে তাহাকে নাচাইয়া দিলেন। গান শেষ হইল। কৃষ্ণা পড়িয়া যাইবার ভানে চিৎকার করিয়া উঠিল। পর-মুহূর্তে সে নামিয়া পড়িল। সুরামত্ত রায় আদর করিয়া ডাকিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা - পিয়ারী!

গানের পর গান চলিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরা। একটা বোতল শেষ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বোতলটাও শেষ হয়-হয়। একটু পরেই বাইজীর অবশ দেহ এলাইয়া পড়িল—ফরাশের উপর। বিশ্বম্ভর তখনও বসিয়া মত্ত নীলকণ্ঠের মত। বাইজীর অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। একটা তাকিয়া সযত্নে তাহার মাথায় দিয়া ভাল করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন। তারপর এস্রাজ টানিয়া লইয়া আবার বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় বোতলটা শেষ হইতে চলিল। কিন্তু রাত্রি শেষ হইল না। এমন সময় গাঙুলীবাড়ির তিনটার ঘড়ি বাজিয়া উঠিল, ঢং - ঢং ঢং।

রায়বাড়ির খিলানে খিলানে পারাবতের গুঞ্জন উঠিল। রায়ের চমক ভাঙিল। নিত্য এই শব্দে নিদ্রা ভাঙে—তিনি উঠিয়া পড়িলেন। একবার শুধু নিদ্রিতা কৃষ্ণাকে আদর করিলেন, চন্দ্রা - চন্দ্রা - পিয়ারী। তারপর বারান্দায় বাহিরে আসিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত!

অনন্ত গিয়াছিল ছাদে প্রভুর জন্য তাকিয়া গালিচা পাতিতে। নীচে নামিয়া আসিতেই রায় তাহাকে বলিলেন পাগড়ির চাদর, সওয়ারের পোশাক দে। নিতাইকে ব'লে দে তুফানের পিঠে জিন দিতে—জলদি।

সবিস্ময়ে অনন্ত প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, রায় গোঁফে চাড়া দিতেছেন।

এ মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়, কিন্তু বহুদিন দেখে নাই। সে মৃদুস্বরে বলিল, মুখে হাতে জল দিন।

কিছুক্ষণ পরই তুফানের হর্ষপূর্ণ হ্রেষায় শেষরাত্রির বুক ভরিয়া উঠিল। তারাপ্রসন্নের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। জানালা হইতে সে দেখিল—তুফানের পিঠে বিশ্বম্ভর রায়। পরনে চোস্ত, পায়জামা, গায়ে আচকান, মাথায় সাদা পাগড়ি। অন্ধকারে সম্পূর্ণ না দেখিলেও তারাপ্রসন্ন কল্পনা করিল—পায়ে জরিদার নাগরা, হাতে চামর দেওয়া চাবুক। তুফান নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল।

মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া ধূলাব ঘূর্ণি উডাইয়া তুফান তুফানেব বেগে ছুটিয়াছিল। শেষরাত্রিব শীতল বায়ু হু-হু কবিয়া রায়ের উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছিল। সুরার উগ্রতা ধীবে ধীবে শান্ত হইয়া আসিতেছিল। প্রান্তর শেষ হইয়া গ্রাম—গ্রামখানার নাম কুসুমডিহি পাশ দিয়া তরকারি-বোঝাই একখানা গাডি চলিয়াছে। আবোহী তাহাতে দুইজন। বোধ হয় তাহাবা হাটে চলিয়াছিল। কয়টা কথা তাঁহাব কানে আসিয়া পৌছাইল, গাঙ্গুলীবাবুবা কিনে থেকে –

রায় সজোরে লাগাম টানিয়া তুফানের গতিবোধ করিলেন।

তখনও গাডির আবোহী বলিতেছিল, খাজনা দিযে লাভ কিছু আব থাকে না। সুখ ছিল রায় বাজাদেব আমলে

চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া বায় চমকিয়া উঠিলেন।

তুফানের পিঠেব উপব। কোথায়। এ তিনি কোথায়! ক্রমে চিনিলেন, হারানো লাট কীতিহাট সম্মুখে। মুহূর্তে সোজা হইয়া, লাগাম টানিয়া তুফানকে ফিরাইয়া সজোবে তাহাকে কশাঘাত কবিলেন। আবাব কশাঘাত। তুফান বিপুল বেগে ছুটিল। আস্তাবলেব সম্মুখে আসিযা বায চাবিদিক চাহিযা দেখিলেন, পূর্বদিকে আলোব বেশ ফুটিতেছে। বজনী এখনও যায় নাই।

রায় ডাকিলেন, নিতাই।

তিনি হাঁপাইতেছিলেন। অনুভব কবিলেন, তুফানও থরথব কবিযা কাঁপিতেছে। রায় নামিয়া পডিলেন। দেখিলেন, লাগামেব টানে তুফানেব মুখ কাটিয়া গিয়াছে। তাহাব সমস্ত মুখটা বক্তাক্ত। শ্রান্ত তুফান কাঁপিতেছিল। রায় তাহাব মাথায় হাত বুলাইযা বলিলেন, বেটা বেটা।

তুফান মুখ তুলিতে পাবিল না। সুবাব মোহ বোধ করি তখনও তাঁহাব সম্পূর্ণ যায় নাই। বলিলেন, ভুল বেটা, তোবও ভুল, আমারও ভুল। লজ্জা কি বেটা তুফান! ওঠ্‌-ওঠ্‌।

নিতাই পিছনে দাঁডাইয়া ছিল। সে বলিল, বড হাঁপিয়ে পডেছে, ঠাণ্ডা হলেই উঠবে।

চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বায় দেখিলেন, নিতাই। নিতাইয়েব হাতে তুফানকে দিয়া ত্বরিতপদে বায় বাডিব মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলেন, জলসাঘর তখনও খোলা। উঁকি মারিয়া দেখিলেন, ঘর শূন্য, অভি-সারিকা চলিয়া গিয়াছে। সুরার শূন্য বোতল আসরে গডাগডি যাইতেছে। ঝাড়-দেওয়ালগিরির বাতি তখনও শেষ হয় নাই। এখনও আলো জ্বলিতেছে।

দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায়বংশধরগণ, মুখে মত্ত হাসি। সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ এই ঘরে জমিয়া আছে।

দরজা হইতেই তিনি ফিরিলেন। রেলিঙে ভর দিয়া ভীতার্তের মত তিনি ডাকিলেন, অনন্ত—অনন্ত!

অনন্ত সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রভুর এমন কণ্ঠস্বর সে কখনও শোনে নাই। সে আসিয়া দাঁড়াতেই রায় বলিয়া উঠিলেন, বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে - জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর্ - জলসাঘরের—

আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।

পদ্মবউ

চন্দ্রমশায়ের পাঠশালা। শীতকালের সকালবেলা খোলা আঙিনায় তালপাতার চাটাই বিছাইয়া ছেলেরা সারি দিয়া বসিয়া গিয়াছে। উঠানের কোণে প্রকাণ্ড বড় একটা নিমগাছ। তাহারই গোড়ায় মাটি দিয়া বাঁধানো একটা বেদীর উপর চন্দ্রমশায়ের আসন। বেদীতে বসিয়া চন্দ্রমশায় একখানা সংস্কৃত বই পড়িতেছিল। বীভৎস মূর্তি! দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে; কেমন মমতাও হয়, আবার রোগের নির্মমতায় রূপের বিকৃত পরিণতি দেখিয়া ভয়ও হয়।

চন্দ্রমশায়ের সর্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধির নিষ্ঠুর আক্রমণ। নাক মোটা হইয়া ফুলিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে; চোখের নীচের পাতা দুইটি কেমন ঝুলিয়া উলটাইয়া পড়িয়াছে, সে পাতার ভিতরের বিবর্ণ রক্তিমা সর্বদা ক্লেদসিক্ত, সমস্ত শরীর বন্ধুর ধারায় ফুলিয়াছে; সাদা কালো দাগে দেহচর্ম ছাইয়া গিয়াছে।

সেরূপ বিকৃতি দেখিয়া শিশুদের আতঙ্ক হয়। বালক-কিশোরদের শঙ্কা হয় —রোগ-বিকৃতি দেখিয়া।

তবুও চন্দ্রমশায়ের পাঠশালা চলে। চন্দ্রমশায়ের শিক্ষাপদ্ধতির খ্যাতি আছে, তাহার জ্ঞানস্পৃহা অসীম। তাহার অবলম্বন শুধু এই পাঠশালা, পুস্তক আর তাহার স্ত্রী। পরিণত-সমাজের মধ্যে সে বহুকাল বাহির হয় নাই। কেহ আসিলে দেখা হয়, কিন্তু চন্দ্রমশায় কথা বলে যেন কত অপরাধী।

যাক, ছেলেরা নিজ নিজ পড়া পড়িতেছিল। একজন হাঁ করিয়া দেখিতেছিল, বাড়ির পুকুরের পাড়ের বড় শিমুলগাছটার মাথায় টিয়াপাখীর ঝাঁকের খেলা। স্লেট আড়াল দিয়া একজন আর একজনকে ভেংচি কাটিতেছিল। আব দুইজনে স্লেটে দাগ দিয়া খেলিতেছিল 'দাগামিল'-খেলা।

বৎসর আষ্টেকের একটি ছেলে পার্শ্ববর্তীর উপর অকস্মাৎ লাফাইয়া পড়িয়া এক থাবায় নাকটা তাহার রক্তাক্ত করিয়া দিল। পাঠশালার শান্তিভঙ্গ হইয়া গেল। ছেলেরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। চন্দ্রমশায় মুখের বইখানা নামাইয়া নিমের ডালের ছড়িগাছটা আস্ফালন করিয়া বলিল, ছাড, এই চারু, ছেড়ে দাও।

চন্দ্রমশায়ের স্ত্রী ছিল রান্নাশালে, সে দ্রুতপদে আসিয়া ছেলে দুইটিকে পৃথক করিয়া দিল এবং অতি মৃদুস্বরে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে বলিল, ছি, ঝগড়া করে না। পড় নি—'কদাচ কাহারও সহিত বিবাদ করিও না'?

মশায়-গিন্নীর স্বভাব - দীর্ঘ অবগুণ্ঠন দিয়া থাকা, আর ওই মৃদুস্বরে কথা। মশায়-গিন্নীর মুখ ছেলেরাও ভাল করিয়া কখনও দেখে নাই, উচ্চকণ্ঠের কথাও

কখনও শুনে নাই। চারু রাগে ফুলিতেছিল, সে বলিল, ও আমার বাবাকে কোলাব্যাঙ বলবে কেন ?

আহত নিশাকর শুধু কাঁদিতেই ছিল, অঁ্যা-অঁ্যা – আমার নাকে অঁ্যা-অঁ্যা —রক্ত অঁ্যা—

মশায়-গিন্নী বলিল, চারু, তুমি তো ব'লে দিলেই পারতে, নিজে মারলে কেন ?

চারু বলিল, আমার বাবাকে কেন বলবে ও ?

চন্দ্রমশায় বলিল, সমস্যার কথা পদ্মবউ – পিতৃভক্তির পুরস্কার দিই, না সাজা দিই ?

মশায়-গিন্নী অভ্যাসমত মৃদুস্বরে বলিল, চারু, তুমি আজ ছুটি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাক। আর নিশাকর, তুমি যাও চারুর বাপের কাছে, তাঁকে সব ব'লে তাঁর মাফ চেয়ে এস।

চন্দ্রমশায় বলিল, ভাল বিচার হয়েছে, বাঃ! – বলিয়া আবার সে বইখানা মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

মশায়-গিন্নী বলিল, আবার বই নিয়ে বসলে কেন ? ছেলেদের পড়া নিয়ে ছুটি দিয়ে দাও। জল গরম হয়ে গেছে, স্নান ক'রে ফেল।

আকাশের দিকে চাহিয়া চন্দ্রমশায় বইখানা রাখিয়া দিয়া বলিল, বেলা অনেক হয়েছে বটে। তারপর অল্প হাসিয়া আবার বলিল, কিন্তু বেলা যে শেষ আর হ'ল না পদ্মবউ, আর যে পারি না।

মশায়-গিন্নী কোনও উত্তর দিল না, ছোট ছেলেদের ডাকিয়া বলিল, আয়, তোদের পড়া ধরব আয়।

মশায়-গিন্নী ছাত্রবৃত্তি-পাস-করা মেয়ে – স্বামীর পাঠশালে সে ছোট ছেলেদের পড়াইয়া থাকে। ছেলেরা তাহাকে ডাকে – সেকেন-মাস্টার। চন্দ্রমশায় তাহাদের হেডমাস্টার। বড় ছেলেরা থাকিয়া থাকিয়া চন্দ্রমশায়ের সম্মুখে স্লেট ধরিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রমশায় তাহাদের অঙ্কের উপর চোখ বুলাইয়া কাহাকেও বলে, রাইট ; কাহাকেও বলে, ভুল হয়েছে।

চন্দ্রমশায় ছেলেদের খাতা কাগজ স্লেট কি পেন্সিল স্পর্শ করে না, সমস্ত দেখা হইয়া গেলে নিমগাছে ঝোলানো বোর্ডখানায় নিজে অঙ্কটা কষিয়া দিয়া যায়, আর বুঝাইয়া দেয়—ছোট বন্ধনীর কাজ সকলের আগে শেষ করতে হয়, এই নিয়ম ; সুতরাং ছয়ের পাঁচ যুক্ত—

মশায়-গিন্নী তখন প্রশ্ন করিতেছিল, বল দেখি, সবুজ রঙের কি কি আছে

আমাদের বাড়িতে ?

ছুটি হইয়া গিয়াছে। রাস্তায় ছেলেদের কলরব তখনও শোনা যাইতেছিল। মশায়-গিন্নী এতক্ষণে ঘোমটা খুলিল। দেখিতে নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, বরং কালোই বলা যায়।

মশায়-গিন্নী ঝাঁটাগাছটা লইয়া উঠানটা পরিষ্কার করিতে লাগিল। ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, ওসব কথা তুমি কেন আমায় বল ?

চন্দ্রমশায় বইখানা হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, কি বললাম ? কিছু তো বলি নি !

মশায়-গিন্নী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বললে না, বেলা যে আর — ?

চন্দ্রমশায় ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, সত্যি পদ্মবউ, আর যে পারছি না !

পদ্মবউয়ের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, সে নীরবেই উঠানটা ঝাঁট দিতে লাগিল। ঝাঁট দেওয়া শেষ হইলে সে উঠানে একটা জলচৌকি, গামছা ও বালতি পাতিয়া দিল। নিমের তেলের শিশি ও গামছা নামাইয়া দিয়া বলিল, মাখ, তেল মাখ।

চন্দ্রমশায় তেল মাখিতে বসিল, পদ্মবউ লইয়া আসিল জলের হাঁড়ি— নিমপাতা ফুটানো গরম জল। হাঁড়ির মুখে গামছা দিয়া গামছায় জল ঢালিয়া সে হাতের তালু স্বামীর সম্মুখে পাতিয়া বলিল, দাও দেখি একটু, পিঠে দিয়ে দিই মালিশ ক'রে।

চন্দ্রমশায় বলিল, থাক্। নিয়েছি পিঠে আমি।

পদ্মবউ বলিল, ওই তোমার এক স্বভাব—কাপড় ছুঁতে দেবে না, শরীর নাড়তে দেবে না। দেখ, ছুঁলেই যদি রোগ হ'ত, তা হ'লে আর বাকি থাকত না। ও হ'ল অদৃষ্টের কথা।

চন্দ্রমশায় বলিল, তুমি জান না পদ্মবউ। থাক না, কি হবে ওতে আর, ওষুধ তো অনেকই হ'ল !

পদ্মবউ বলিল, রবিবার-ব্রত তুমি ছাড়লে কেন বল দেখি ? রবির স্তবও আর কর না !

এবার চন্দ্রমশায় বলিল, ওসব মিছে কথা পদ্মবউ, কিছুতে কিছু হয় না। করলাম তো অনেক, ও সব ফাঁকি।

পদ্মবউ বলিল, না না, ধর্ম কি কখনও মিছে হয় ? দেখ, ভগবানের কোপ

ভিন্ন এ রোগ হয় না ; ভগবান প্রসন্ন হ'লেই ভাল হবে ; ভগবানকে ভুলো না।

চন্দ্রমশায় নীরবে স্নান করিতে লাগিল।

পদ্মবউ দাওয়ার উপর আহারের ঠাঁই করিয়া দিয়া ভাত বাড়িতে বসিল। আহার শেষ করিয়া চন্দ্রমশায় বলিল. তোমাকে দেখে ধর্মকে মানতে ইচ্ছে হয়। পদ্মবউ, ভগবানের কাছে আমি কামনা করি কি জান ? তুমি যেন সুস্থ নীরোগ শরীরে অনেক দিন বেঁচে থাক।

পদ্মবউ ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, আমি আপনার নিজের কাজ করছি, পরকালের কাজ করছি, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না বাপু। তুমি নিজের জন্য কই ভগবানকে ডেকো দেখি।

কিন্তু দশ বৎসর পূর্বে যেদিন চন্দ্রমশায়ের এই ব্যাধির সূত্রপাত প্রথম আবিষ্কৃত হয়, সেদিন পদ্মবউ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। শুনিয়া সে রান্নাঘরের চালার খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল আপনার হতভাগ্যের কথা। চন্দ্রমশায় তখন ঘরের মধ্যে উপুড় হইয়া পড়িয়া শুধু কাঁদিতেছিল। পদ্মবউয়ের মনে পড়িল তাহাদের গ্রামের সেই গলিতকুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিক্ষুকটার কথা। কি বীভৎস মূর্তি, আর কি দুর্গন্ধ তাহার সর্ব শরীরে! টপটপ করিয়া জল চোখ হইতে মাটির উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। রান্না অর্ধেক হইয়াছিল, সে রান্না শেষ হইল না পুড়িয়া গেল। চন্দ্রমশায়ও খাইল না। সমস্ত দিন পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় উঠিয়া বসিয়া ডাকিল, পদ্মবউ!

কেহ উত্তর দিল না। আবার সে ডাকিল, পদ্মবউ!

সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝিপোকা ডাকিতেছিল শুধু, মানুষের সাড়া পাওয়া গেল না।

পদ্মবউ তখন পলাইয়া গিয়াছে। ক্রোশ চারেক দূরে তাহার বাপের বাড়ি, সেখানে সে তখন মায়ের কোলের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। মাও কাঁদিতেছিল।

পদ্মর বাপ কিন্তু ভিন্নপ্রকৃতির লোক। সে শুনিয়া বলিল, ছি মা, বড় অন্যায় কাজ করেছ তুমি। চল, আজই তোমায় সেখানে রেখে আসব আমি।

পদ্ম ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, না না, আমি পারব না বাবা, সে আমি পারব না।

মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া বাপ কহিল, তুমি তো না-জান নয় মা, রামায়ণ মহাভারত সব তো পড়েছ তুমি। কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে নিয়ে সতীর বেশ্যার বাড়ি

যাওয়ার গল্প তো জান !

পদ্ম কাঁদিতেছিল, সে ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল, না না, সে পারিবে না। বাপ বলিল, নিতান্ত মন্দভাগ্য, পূর্বজন্মের বহু দুষ্কৃতি না থাকলে এ রোগ কারও হয় না মা। কিন্তু তুমি কেন এ জন্মে সে দুষ্কৃতি সঞ্চয় করবে ? পরজন্মের কর্মও তো ক'রে রাখতে হবে। ছি, ঘৃণা করে যদি তুমি স্বামীকে পরিত্যাগ কর, পরজন্মে কে বলতে পারে যে, তোমার ঐ ব্যাধি হবে না ! পরজন্ম কেন, এই জন্মের কথা—

বিরক্তিভরে পদ্মব মা বলিয়া উঠিল, কি যে তোমার কথার ছিরি, ওইগুলে, খুব ভাল কথা বুঝি ?

সমস্ত রাত্রি মনেব সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পদ্ম পরদিন প্রভাতে পিতাকে প্রণাম করিয়া কহিল, আমার সঙ্গে তুমি চল বাবা।

তারপর পদ্ম আসিয়া যে নিষ্ঠার সহিত স্বামীসেবা আরম্ভ করিল, সত্যই তাঁহার তুলনা হয় না। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা শুধু বিস্মিতই হইল না যে বিপুল শ্রদ্ধা তাহাকে অঞ্জলি দিল, সেও অতুলনীয়।

পদ্ম কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও কবিল না।

অকস্মাৎ কিন্তু জীবনে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। চন্দ্রমশায়ের পাঠশালাটি উঠিয়া গেল। অধিকাংশ ছাত্রই পাঠশালা পরিত্যাগ করিল। কোথা হইতে আসিল এক নূতন পাস করা ডাক্তার, সে চন্দ্রমশায়কে পাঠশালার শিক্ষকরূপে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে বাবুদের বৈঠকখানায় বলিল, এ করছেন কি মশায় ? এই সব নীরোগ শিশু, এদের দেহে এই বয়স থেকে লেপ্রসির বীজ ঢুকলে আর রক্ষে আছে ? কুষ্ঠরোগ যে ছোঁয়াচে !

একজন বলিল, তা—আমাদের চন্দ্রমশায় খুব সাবধানী লোক, উনি ছেলেদের কখনও ছোঁন না, নাড়েন না। বই-কলম-স্লেট পর্যন্ত না। মশায়ের বোর্ড পর্যন্ত মুছে দেন ওঁর স্ত্রী।

ডাক্তার বলিল, আরে মশাই, ওর ইন্‌ফেক্‌শন হয় নিশ্বাসের সঙ্গে। নাকের মধ্যেই রোগটার প্রথম সূত্রপাত।

একজন বলিল, তা বটে, নাকই তো প্রথম কোলে বাপু !

চন্দ্রমশাই শুধু নীরব হইয়া রহিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল না, দুঃখ করিল না, ভবিষ্যতের জন্য কোন আকুলতা তাহার হইল বলিয়াও বোধ হইল না।

সে শুধু যে কয়টি ছাত্র আসিয়াছিল তাহাদিগকে বলিল, পাঠশালা আর হবে

না, তোরাও আর আসিস না।

মশায়-গিন্নী কিন্তু ডাক্তারের উপর ক্রোধে সারা হইল। চন্দ্রমশায় বলিল, ওর ওপর রাগ ক'রে ফল কি পদ্ম? সে তার জ্ঞানমত সত্যি কথাই বলেছে।

পদ্ম বলিল, কি জ্ঞানী লোক সে ডাক্তার! জ্ঞান থাকলে এ কথা সে বলত না। আজ আমি এতদিন অহরহ তোমার সঙ্গে বাস করছি, তা হ'লে তো আমারই আগে হওয়া উচিত ছিল।

চন্দ্রমশায় বলিল, দুঃখ বা রাগ ক'রো না পদ্ম, ভগবানকে স্মরণ কর। তোমার ভগবানই আজ আমার ভরসা।

পদ্ম এবার কাঁদিয়া ফেলিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সে চোখ মুছিয়া বলিল, দেখো তুমি, তিনি কোন কষ্ট আমাদের দেবেন না।

তারপর আরম্ভ হইল ভীষণ জীবন-সংগ্রাম। পদ্ম ধান ভানিয়া, চাল কুটিয়া জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা করিল।

চন্দ্রমশায় কঠোর পরিশ্রম-পরায়ণা পদ্মর দিকে নীরবে চাহিয়া থাকে, কোন কথা বলে না। সেদিন পদ্ম অকস্মাৎ ঢেঁকিশাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দাওয়ার উপর শুইয়া পড়িল।

চন্দ্রমশায় জিজ্ঞাসা করিল, এমন করছ যে পদ্ম?

হাঁপাইতে হাঁপাইতে পদ্ম বলিল, বুকটা কেমন ক'রে উঠল গো!

চন্দ্রমশায় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, তুমি রাগ ক'রো না পদ্ম। ভগবানের কাছে আর তোমার আয়তি কামনা তুমি ক'রো না। আমার মুক্তি কামনাই কর।

পদ্ম প্রতিবাদ করিল না, সে শুধু কাঁদিল মাত্র।

অপরাহ্ণের দিকে পদ্মর অল্প জ্বর দেখা দিল। সকালে সে যখন উঠিল, তখন শরীর যেন কত দুর্বল! বাড়িতে চাল ছিল না। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রতিবেশী মুখুজ্জেদের বাড়ি চলিল চাল ধার করিতে।

মুখুজ্জে-গিন্নী বলিল, এস, ব'স।

পদ্ম বলিল, না দিদি, বসব না। কাল থেকে জ্বর। ঘরে চাল নেই, তাই—

এমন সময় হুলুধ্বনি দিয়া মুখুজ্জে বাড়ির বধূরা আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। কোন মানসের জন্য 'ঠারগুয়া' মানত ছিল, তাই আজ দেওয়া হইল। মুখুজ্জে-গিন্নী বলিল, ওগো বড়বউমা, পদ্মকে সিঁদুর ঠেকিয়ে দাও—সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী; পান দাও, সুপুরি দাও, দিয়ে পেন্নাম কর, পায়ের ধুলো নাও।

ঠাকরগুয়ার রেকাবি হাতে বড়বউ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। পদ্ম আপনার অবগুণ্ঠন তুলিয়া সীমন্ত উন্মুক্ত করিয়া দিল। বড়বউ সিঁদুর পরাইয়া দিয়া পদ্মর হাতে পান-সুপারি তুলিয়া দিল।

মুখুজ্জে-গিন্নী বলিল, থাক, আর পেন্নাম করতে হবে না, পেসাদী হাত আবার তোমার। মনে মনে কর, তা হ'লেই হবে। আর চাল দাও তো পদ্মকে সের চারেক বউমা।

বড়বউ চলিয়া গেল। মুখুজ্জে-গিন্নী পদ্মকে বলিল, এ তোর কবে থেকে হ'ল পদ্মবউ ?

পদ্ম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কি দিদি ?

বড় রোগ ?

পদ্ম সবিস্ময়ে মুখুজ্জে-গিন্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

মুখুজ্জে-গিন্নী বলিল, দেখি, তোর হাত-পা দেখি !

পদ্ম সভয়ে হাত দুইটি মেলিয়া ধরিল নিজের চোখের সম্মুখে। চোখে যাদুর অঞ্জন দিয়া কে যেন প্রেতলোকের দ্বার তাহার দৃষ্টির সম্মুখে খুলিয়া দিল। স্ফীত করাঙ্গুলি রৌদ্রসম্পাতে তৈলাক্তের মত চকচক করিতেছে। পদ্মর মনে হইল, অসংখ্য কৃমিকীট প্রতি লোমকূপের মধ্যে কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে। পা দেখিতে তাহার সাহস হইল না।

বাড়িতে আসিয়া সে নিবিষ্টচিত্তে পা দুইটি বাহির করিয়া দেখিতে বসিল। পায়ের আঙুলও ফুলিয়াছে। চেটোর উপর বার বার আঙুল টিপিয়া দেখিল, প্রত্যেক স্থানটি বীভৎস গহ্বর সৃষ্টি করিতেছে।

মুখ দেখিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি আয়না আনিয়া বসিল। আয়নার ঢাকনা খুলিয়াই কিন্তু সভয়ে সেটাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। তারপর অকস্মাৎ ধুলার উপর লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু আশ্চর্য, চোখে তাহার জল ছিল না।

চন্দ্রমশায় প্রাতঃকৃত্যের জন্য বাহিরে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, পদ্ম !

পদ্ম মাথার কাপড় খুলিয়া উন্মত্তার মত বলিল, দেখ, দেখ, হ'ল তো !

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চন্দ্রমশায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে মাথা নত করিয়া রহিল।

সমস্ত দিন পদ্ম উঠিল না, চন্দ্রমশায়ও ডাকিল না। নিমতলায় একখানা বই লইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া গেল ; যাইবার

সময় বলিল, পদ্ম, ওঠ, উঠে মুখে হাতে জল- দাও।

বাড়ি যখন ফিরিল, তখন পদ্ম আলো জ্বালিয়া সম্মুখে আয়না ধরিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতেছে।

চন্দ্রমশায় ডাকিল, পদ্ম!

অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে পদ্ম স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, স'রে যাও বলছি, স'রে যাও তুমি আমার সামনে থেকে।

কোনরূপে চারটি মুড়ি চিবাইয়া চন্দ্রমশায় দাওয়ার উপরে শুইয়া রহিল। পদ্ম তখনও তেমনই আয়না সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া ছিল। সম্মুখের লণ্ঠনটা অপরিমিত বর্ধিত শিখার কালিতে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। পদ্ম শিখাটাকে আরও বাড়াইয়া দিল।

নিশীথরাত্রে ঝনঝন শব্দে চন্দ্রমশায়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। গাঢ় অন্ধকার রাত্রি, সম্মুখের লণ্ঠনটার কাঁচ ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহারই মশালের মত লাল আলোয় খানিকটা শুধু দেখা যাইতেছিল। পদ্ম সেখানে ছিল না। চন্দ্রমশায় উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। গৃহাভ্যন্তরে আবার শব্দ উঠিল, ঝনঝন—ঝনঝন।

চন্দ্রমশায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পদ্ম নির্মম আক্রোশে দেওয়ালের দেবদেবীর ছবিগুলি চুরমার করিয়া দিতেছে। ঘরখানা কাচের টুকরায় ভরিয়া গিয়াছে। পদ্মর মুখ রক্তাক্ত।

সে সভয়ে ডাকিল,—পদ্ম—পদ্ম!

পদ্ম দৃক্‌পাত করিল না। সে আর একটা ছবিতে আঘাত করিল। চন্দ্রমশায় এবার তাহার বাহু ধরিয়া ডাকিল, পদ্ম—পদ্মবউ!

পদ্মবউ একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে চাহিয়া হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মাটির উপর ভারকেন্দ্রচ্যুত মাটির প্রতিমার মতই সশব্দে পড়িয়া গেল।

সে মূর্ছা পদ্মর আর ভাঙিল না।

ডাক্তার খানিকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া বলিল, নিউট্রিশনের অভাবে এঁর বেরিবেরি হয়েছিল।

ডাক-হরকরা

ডাক্তার ডাকে চলিয়াছে।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহার উপর আকাশে দুর্যোগ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তারা নাই, সাধারণ অন্ধকারের মধ্যে থাকে যে স্বল্প স্বচ্ছতা, তাহাও নাই; ঘন মেঘের কালো ছায়ায় প্রগাঢ় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবী যেন হারাইয়া গিয়াছে। চারিপাশে শুধু অজস্র সঞ্চরমাণ জোনাকির দীপ্তি জ্বলে আর নেবে—জ্বলে আর নেবে, যেন অসীম অনন্ত গাঢ় মৃত্যু-পরিব্যাপ্তির মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী জীবনদীপ্তি জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া বিকাশ পাইয়া পাইয়া চলিয়াছে।

অকস্মাৎ রাস্তার একটা কাদা-ভরা গর্তে গরুর গাড়িখানা পড়িয়া একটা ঝাঁকুনি খাইতেই ডাক্তারের চিন্তার ঘোর কাটিয়া গেল। চারিপাশে জল-ভরা মাঠে ব্যাঙের চিৎকার, আশেপাশে বৃক্ষপল্লবের মধ্যে ঝিঁঝির ডাক, তাহারই সঙ্গে গরুর গাড়িখানার চাকার বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নার সুরের মত একটি সকরুণ দীর্ঘ শব্দ বেশ শোভনভাবেই মিশিয়া গিয়াছে। রাস্তার পাশের গাছ-গুলির পাতায় পাতায় জল ঝরিতেছে টুপটাপ –টুপটাপ! ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা রাস্তার নুড়ি-পাথরের কঠিন বন্ধুরতার উপর দিয়া গাড়িখানা মন্থরগতিতে চলিয়াছে। ডাক্তার একদৃষ্টে সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছিল। দূরে যেন একটা জোনাকি অনির্বাণ দীপ্তিতে জ্বলিতেছে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেটা এই দিকেই আসিতেছে।

ডাক্তার গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি আলো অটল?

বর্ষার রাতে অটল ঘুমে ঢুলিতেছিল, সে একবার জোর করিয়া চোখ খুলিয়া দেখিয়া বলিল, কে জানে মশাই! অঁই—অঁই ই গরুকে কি বলতে হয় বল দেখি!—বলিয়া গরু দুইটিকে একবার তাড়না করিয়া আবার ঢুলিতে আরম্ভ করিল।

হাঁ, আলোই ওটা, ক্রমশ দীপ্তিটা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে, বিন্দুর আকার হইতে ক্রমশ আকারে বড় মনে হইতেছে। আলোটা দ্রুতবেগে এই দিকেই আসিতেছে। ডাক্তার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই দুর্যোগ মাথায় করিয়া কে এমন ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। রোগীর বাড়ির লোক নয়তো!

ঝুন-ঝুন-ঝুন—মৃদু ঘণ্টার শব্দ ডাক্তারের কানে আসিল। ডাক্তার হাঁকিল কে? কে? কে আসছে?

উত্তর আসিল, ডাক—সরকার-বাহাদুরের ডাক। ডাক-হরকরা আমি।—বলিতে বলিতে লোকটি নিকটে আসিয়া পড়িল। ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, লোকটির হাতের আলোতেই ডাক্তার দেখিল—বেঁটে, কালো, আধা-বয়সী এক জোয়ান কাঁধের উপর মেল-ব্যাগ ঝুলাইয়া সমান একটি তাল বজায় রাখিয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। তাহার মাথায় ছেঁড়া একটি মাথালি, এক হাতে একটি বল্লম; ওই বল্লমটারই ফলার সঙ্গে ঝুলানো ঘণ্টা ঝুনঝুন শব্দে বাজিতেছে।

ডাক্তার প্রশ্ন করিল, কে রে—দীনু?

দীনু ডোম ডাক-হরকরা - মেল-রানার, সাত মাইল দূরবর্তী আমদপুর স্টেশন হইতে ডাক লইয়া চলিয়াছে হরিপুর পোস্টআপিসে।

সচল দীনু উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতটা রাত্রি হ'ল বল্ দেখি দীনু?

আজ্ঞে, তা রাত ভেঙে এসেছে, তিন পহর গড়িয়ে এল আর। - দীনুর কথার শেষ অংশের সাড়া আসিল গাড়ির পিছন দিক হইতে। মেল-রানার সমান বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কথা বলিতে বলিতেই সে গাড়ি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঘণ্টার শব্দ ক্রমশ মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল, আলোর শিখাটা ক্রমশ আবার পরিধিতে হ্রাস পাইয়া বিন্দুতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

অটল কখন জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তার-বাবু, ওই বস্তার ভিতরে কি থাকে?

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, চিঠি রে চিঠি। কত দেশ-দেশান্তরের খবর, বুঝলি? একশো দুশো পাঁচশো ক্রোশ দূরে যা সব ঘটছে, সেই সব খবর ওই ব্যাগের মধ্যে থাকে।

অটল নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। দেশ-দেশান্তরের খবর! কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিল না। অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, সাধে বলে বায়ের আগে বাত্তা ছোটে!

বায়ুরও আগে বার্তা নাকি ছুটিয়া চলে। ডাক্তার পিছনের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ওই কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে ডাক-হরকরার সন্ধান করিতে চেষ্টা করিল। ঘণ্টার শব্দ আর শোনা যায় না, অসংখ্য খদ্যোৎদীপ্তির মধ্যে ডাক-হরকরার আলোক জোনাকির আলোর মতই ক্ষুদ্র হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। ডাক্তার অটলকে বলিল, বায়ের আগে বাত্তা ছোটে—কথাটা বেশ অটল।

ডাক্তারের গাড়ি অন্ধকার পথ ধরিয়া যেন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

ডাক-হরকরা তাহার অভ্যস্ত নির্দিষ্ট গতিতে ছুটিতে ছুটিতে চলিতেছিল। হাতের হারিকেনটার শিখা দ্রুতগমনের জন্য কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধোঁয়ায় চিমনি-টাকে প্রায় কালো করিয়া তুলিয়াছে। দীনুর হাতের বল্লমটা বেশ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। মাথায় মাথালিটা দড়ি দিয়া চিবুকে বাঁধা। ইহাতে শুধু মাথাই বাঁচিয়াছে, দীনুর সমস্ত শরীর জলে ভিজিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বৃষ্টিটা জোরে নামিল।

দীনু কিন্তু সমান বেগে চলিতেছিল। এই ছুটিয়া চলাটা তাহার বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাহার কাঁধে সরকারী ডাক, পথে তাহার এক মিনিট বিশ্রাম করিবার উপায় নাই হুকুম নাই। গতি পর্যন্ত শিথিল করিতে পারিবে না। ডাকবাবু বলেন, এক মিনিটের ফেরে হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে দীনু।

দীনুর বুকটা শঙ্কায় কেমন গুরগুর করিয়া উঠে। আবার একটু গৌরবও অনুভব করে।

তাহাদের পাড়ায় নোটন ডোম চৌকিদারি কাজ করে, দীনু তাহাকে বলে, এ বাবা তোমাদের চৌকিদারি কাজ লয় যে, ঘরে শুয়েই জানালা থেকে দুটো হাঁক মেরেই খালাস, চাকরি হয়ে গেল! এ হ'ল সরকারী ডাকের কাজ, এক মিনিট দেরি হ'লেই বাস, হাতে হাতকড়া।

আজ সাত বৎসর দীনু ডাক-হরকরার কাজ করিতেছে, প্রত্যহ রাত্রে সে ডাক লইয়া যায়, লইয়া আসে; কিন্তু কোনদিন তাহার এক মিনিট বিলম্ব হয় নাই। বরং সেবার পুল ভাঙিয়া একদিন কলিকাতার ডাকগাড়ি আসে নাই। একদিন পথে মালগাড়ি ভাঙিয়া রাস্তা বন্ধ হওয়ায় পশ্চিমের ডাকগাড়ি আসিতে পাঁচ ঘণ্টা দেরি হইয়াছিল, কিন্তু দীনু ঠিক সময়ে যায়, ঠিক সময়ে আসে।

শ্রাবণ-রাত্রির আকাশে মেঘ যেন জমাট অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে সে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া অজগর-জিহ্বার মত বিদ্যুৎরেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া খেলিয়া যাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার মেঘের গম্ভীর মৃদু গর্জন, দূরে পুলের উপর ডাকগাড়ির শব্দের মত দীনুর মনে হয়। অকস্মাৎ একটা সুতীব্র নীল আলোকে দীনুর চোখ যেন ঝলসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ কঠোর বজ্রধ্বনিতে সমস্ত যেন থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্তের জন্য ত্রাসে বিহ্বল হইয়া দীনু বলিয়া উঠিল, রাম—রাম—রাম!

দূরে কোথায় বাজ পড়িয়াছে। মুহূর্তপরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া দীনু আবার তাহার অভ্যস্ত গতিতে ছুটিয়া চলিল। বল্লমের ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ করিল—

ঝুনঝুন—ঝুনঝুন।

ডাকঘরে যখন সে পৌঁছিল, তখন ভোর হইয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পুঞ্জিত মেঘস্তর পরিষ্কাররূপে চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ডাক নামাইয়া দীনু একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, উঃ, বাজ যা আজ একটা পড়ল বাবু, সাঙিন বাজ! বাপ রে, বাপ রে!

পোস্টমাস্টার বলিলেন, ওঃ, বিছানাতে থেকেই আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম দীনু। তারপর, দীনুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এঃ, ভিজে গিয়েছিস যে রে—অ্যাঁ! দাঁড়া বাবা, ইনসিওর-রেজিস্ট্রিগুলো দেখে নিয়ে তোর ছুটি ক'রে দিই, তুই বাড়ি গিয়ে কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে ফেল।

দীনু বলিল, তামাক দেন কেনে একটুকু, সাজি একবার। উঃ, বড্ড কাঁপুনি লেগেছে মশায়।

অতঃপর পোস্টমাস্টার ইন্‌সিওর-রেজিস্ট্রি লইয়া বসিলেন, পিয়ন চিঠিগুলির উপর খটখট শব্দে ছাপ মারিতে আরম্ভ করিল, দীনু আপন মনে তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল। তাহার শীত করিতেছিল, কিন্তু উপায় নাই, ডাক না মিলিলে তাহার ছুটি হইবে না।

কই হে, কাগজখানা দাও দেখি, যুদ্ধের খবরটা একবার দেখি!—ইহারই মধ্যে, এই ভোরেই জনকয়েক লোক পোস্ট-আপিসের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালীবাবুর সংবাদপত্রের সংবাদের জন্য উৎকট নেশা, তিনি হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আর ছিল গোবিন্দ রায়। লোকটি স্কুলমাস্টার, তাহার নেশা যত ফ্রী-স্যাম্প্‌লের। 'বিনামূল্যে' দেখিলেই গোবিন্দ রায় সেখানে চিঠি লিখিয়া বসিবে। জার্মানি হইতে বিনামূল্যে সে তাহার কোষ্ঠী তৈয়ারি করাইয়া আনিয়াছে। সে প্রত্যহ আসে, পাছে তাহার স্যাম্প্‌ল্ গোলমাল করিয়া অন্য কেহ লইয়া যায়। আর আসিয়াছিল-আঁকাবাঁকা হাতের লেখা চিঠির জন্য কয়জন যুবক। প্রৌঢ় রামনাথ চাটুজ্জেও আজ আসিয়াছিল, দূর দেশে তাহার জামাইয়ের খুব অসুখ; চাটুজ্জে উৎকণ্ঠিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। প্রত্যেকখানির চিঠির ঠিকানা পিয়ন পড়িয়া শেষ করে, এ দিকে চাটুজ্জে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এ চিঠি তাহার নয়।

ইন্‌সিওর-রেজিস্ট্রির কাজ শেষ হইয়া গেল। দীনুর এবার ছুটি, সে বাড়ি চলিল। হাতে তাহার খান-দুই রাঙন খাম—কাহার ছেঁড়া চিঠির ফেলিয়া-দেওয়া খাম, সে-কয়খানা সে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছিল।

পোস্টমাস্টার বলিলেন, গরুটার ঘাস দিতে এত দেরি করিস কেন দীনু?

'একটু সকালে সকালে দিস।

ডাকবাবুর গরুর জন্য ঘাস দীনুকে দিতে হয়।

তাই আনব। বলিয়া দীনু চলিয়া গেল।

পথে রামনাথ চাটুজ্জের বাড়িতে তখন মেয়েদের বুক-ফাটা কান্নার রোল উঠিয়াছে। সে ধ্বনির মর্মচ্ছেদী বেদনাস্পর্শে এই প্রভাতেও শ্রাবণের আকাশ যেন কাঁদি-কাঁদি করিতেছিল।

দীনু চলিতে চলিতেই একবার আপন মনে বলিল, আহা!

বাড়িতে আসিয়া পাঁচ বছরের মেয়ে লক্ষ্মীর হাতে খাম দুইখানি দিয়া দীনু বলিল, কেমন খাম এনেছি, দেখ্‌, নক্ষী! কেমন ছবি, আবার কেমন সুবাস উঠছে, দেখ! বেলাত থেকে এসেছে চিঠি।

লক্ষ্মী খাম দুইখানি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিল, চিঠি কি বাবা?

কালি দিয়ে কাগজে সব নেকা থাকে মা।

কি নেকা থাকে বাবা?

এই—তুমি কেমন-আছ, আমি ভাল আছি।

আর?

আর কি থাকে - দীনুর মনে সেটা যোগাইল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

মেয়ে আবার প্রশ্ন করিল, আর?

অকারণে বিরক্ত হইয়া দীনু এবার বলিল, জানি না যা। আবার কি থাকবে?

লক্ষ্মী শান্ত মেয়ে, বাপের বিরক্তি দেখিয়া সে আর প্রশ্ন করিল না, খাম দুইখানি লইয়া চলিয়া গেল।

দীনু স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল, নেতাই কোথা, মাঠে গিয়েছে?

নিতাই দীনুর একমাত্র পুত্র। স্ত্রী বলিল, জানি না বাপু, কাল সন্‌জেতে সেই বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নাই। সারা রাত আখড়াতে মদ খেয়েছে, আর ঢোল বাজিয়ে সব চেঁচিয়েছে। দুবার আমি ডাকতে গেলাম তো, আমাকে তেড়ে মারতে এল।

দীনুর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল, সে রুক্ষস্বরে বলিল, লবাবের বেটা লবাব! হারামজাদা আমার রোজগারে খাবেন আর টেরি কাটিয়ে লব্বাগি ক'রে বেড়াবেন! তাকে আমার ঘরে ঢুকতে দিও না ব'লে দিচ্ছি, হ্যাঁ।

নিতাইয়ের মা বলিল, সে তুমি ব'লো বাপু, আমি লারব।

দীনু উত্তরোত্তর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে আরও রুক্ষস্বরে বলিল, কেনে, লারবি কেনে, শুনি?

ব'লে কে মার খাবে বাপু? ছেলের চোখ যেন লাল কুঁচ, আর লাটাই-ঘোরা হয়ে ঘুরছেই।

দীনু চিৎকার করিয়া উঠিল, মারবে! সে হারামজাদা কত বড় মরদের বেটা দেখে লোব আমি।—বলিয়া সে কোদাল এবং ঘাস কাটিবার জন্ত কাস্তে ও ঝুড়ি লইয়া মাঠে যাইতে উঠিয়া পড়িল। স্ত্রী পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, এই দেখ, নিজের করণটা একবার দেখ—খাওয়া নাই, কিছু নাই, মরদ চললেন বাগ ক'রে। খেয়ে যাও বলছি। সারারাত দোড় দিয়ে হাঁটা।

দীনু ফিরিল, বলিল, ট্যাক-ট্যাক করা তোর এক স্বভাব! দে তাই, মদের ভাঁড়টা বার করে দে—ওই খেয়েই যাই এখন। যে জল সমস্ত রাত, জমির আল-টাল আর কি আছে! সময়ে না দেখলে খাবি কি ধুমসী?

দীনুর স্ত্রী স্থলাঙ্গী। বলিল, এই দেখ, গতর খুঁড়ো না বলছি।—মদের ভাঁডটা স্বামীর হাতে দিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, তা বাপু, গতর যদি একটুন কমে তো বাঁচি।

নিঃশেষে ভাঁড়ের মদটুকু পান করিয়া দীনু বাহির হইয়া গেল। ডাক লইয়া ফিরিয়া প্রাতঃকালে এটুকু তাহার না হইলেই নয়। সে বলে, এ আমার চা।

ঘণ্টা-ডুয়েক পরে কর্দমাক্ত দেহে মাথায় ঝুড়িতে এক বোঝা ঘাস ও আঁচলে এক আঁচল কই-মাগুর মাছ লইয়া সে বাড়ি ফিরিল। মাঠে মাছগুলি সে ধরিয়াছে। বাড়ির বাহির হইতেই সে শুনিল, তাহার 'লবাবপুত্তুর' নিতাই বেশ জড়িতস্বরে উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া দিয়াছে—

হায় কি কঠিন রোগ উঠেছে ওলাউঠো—
লোক মরিছে অসম্ভব।

মাছ পাইয়া দীনুর মেজাজ বেশ খুশী হইয়া উঠিয়াছিল, আর খালি পেটে মদের নেশাটাও আজ জমিয়াছে ভাল। সে ছেলেকে কোন কটু কথা বলিল না, ঘরে ঢুকিয়া বেশ হাসিয়া বলিল, গানের ছিরি দেখ দেখি বেটার! তাই, একটা ভাল গান গা রে বাপু। বলিয়া সে নিজে আরম্ভ করিল—

ওরে আমার কালো মেয়ে ভোবন করেছে আলো।

নিতাই বলিয়া উঠিল, থাম, থাম বাপু, ষাঁড়ের মত আর চেঁচিও না তুমি। আমি গাই, শোন—

দীনু অত্যন্ত চটিয়া গেল, সে গান থামাইয়া বলিল, রাখ্‌, তোর গান।

বলি—আমার কথার জবাব দে দেখি আগে। মাঠ যাস নাই কেনে, শুনি?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে নিতাই জবাব দিল, ধ্-বো মাঠ গিয়ে কি হবে? মাঠ গিয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে, শুনি?

দীনু অবাক হইয়া গেল।

নিতাইয়ের কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল, এই একবাশ ধান বেচলে তবে তোর একটা টাকা! ধ্ রো মাঠ গিয়ে কি হবে?

নিতাইয়ের মা বলিল, ওরে লবাবেব বেটা লবাব, খুব যে মুখে টাকা দেখাইছিস, বলি একটা পয়সা কখনও এনেছিস তুই?

নিতাই ট্যাঁক খুলিয়া ঠং কবিয়া একটা টাকা ছু ড়িয়া ফেলিয়া দিল—যেন নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু সেটা। তাবপব বলিল, ওই লে, ফেব যদি টিকটিক কববি, তো বুঝতে পারবি।

মা তাহাব অবাক হইয়া গেল। দীনু কিন্তু গম্ভীব স্ববে বাললা, তুই টাকা কোথায় পেলি রে নেতাই?

হি-হি করিয়া হাসিয়া নিতাই উত্তব দিল, বাজাবা মানিক কোথা পায়?

দীনু গম্ভীরস্ববে বলিল, হাসি তামাশা নয় নেতাই। বল্ তুই টাকা কোথায় পেলি?

নিতাই বিরক্তিভবে উঠিয়া বাড়ি হইতে বাহিব হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, মর্ তুই ওইখানে বকবক ক'বে, হ্যাঁ।

দীনু উঠিয়া পিছন পিছন দুয়াব পযন্ত আসিয়া তাহাকে ডাকিল, নেতাই, শোন্, শুনে যা, ফিবে আয় বলছি।

নিতাই তখন গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া আখড়ায় চলিয়াছে—

পীরিতি হ'ল শূল সখী, পীবিতি হল শূল।
ও আমি বসিলে উঠিতে লাবি, আমার হাত ধ'রে তুল গো।

দীনু ফিরিয়া আসিয়া দাওয়াব উপব অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখে বসিয়া বহিল। নিতাইয়ের ভাবগতিক তাহাব বেশ ভাল লাগে না। তাহাব পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার ও বিড়ি-সিগাবেটের প্রাচুর্য দেখিয়া দীনু সন্দেহ কবিত স্ত্রীকে—সে-ই বোধ হয় নিতাইকে গোপনে পয়সা-কড়ি দিয়া থাকে। কিন্তু আজ পুরা একটা টাকা এমন তাচ্ছিল্যভরে ফেলিয়া দেওয়ায় দীনুব চিত্ত সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, শেষ পর্যন্ত চিন্তা করিতে করিতে সে শঙ্কিত না হইয়া পারিল না।

স্ত্রী বলিল, মুড়ি দিয়েছি, খাও। খেয়ে একটুকুন গড়াও, বিছানা ক'রে দিয়েছি। ঘাস আমি মাস্টারবাবুর বাড়িতে দিয়ে আসছি।

দীনু স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, নেতাই টাকা কোথা পেলে বল দেখি?

স্ত্রী বলিল, ভ্যালা মানুষ তুমি বাপু! ওই নিয়ে তুমি ভাবতে বসলে? বেটাছেলে, কোথাও হয়তো পেয়েছে।

দীনু কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না।

অপরাহ্ণে আহারের সময় পিতাপুত্রে আবার সাক্ষাৎ হইল। তখন দীনুর মদের নেশা কাটিয়াছে, কিন্তু নিতাইয়ের চোখ তখনও লাল। দীনু নিতাইয়ের আপাদমস্তক বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। দীনুর চোখ জুড়াইয়া গেল। ভরা জোয়ান হইয়াছে নিতাই! সুন্দর সুগঠিত সবল দেহখানি কে যেন কালো পাথর কুঁদিয়া তৈয়ারী করিয়াছে! সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা অস্থির চঞ্চলতা খেলা করিতেছে, মনে হয়, ইচ্ছা করিলে নিতাই আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে। দীনু পরিতুষ্ট চিত্তে স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বরে বলিল, এইবার তো জোয়ান হয়েছিস নেতাই, এবার একটা কাজে-কম্মে লেগে যা। ডাকঘরের কাজেই লেগে পড়্। নতুন ডাকঘর হচ্ছে আবার রামনগরে - এই ফাঁকে লেগে যা!

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ঢের লোক আছে তোর কাজ করবার। উ কাজ আমি লারব। বাবাঃ সারা পথ ধুকুর-ধুকুর ক'রে ছোটা, উ কি মানুষে পারে?

নিতাইয়ের মা বলিল, কেনে, তোর বাবা পারে, আর তুই পারবি না কেনে? আব তোর বাবা কি মানুষ লয় নাকি?

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিল: উ একটা আস্ত ভূত। লইলে, হাঁঃ—

দীনু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, লইলে কি?

যাও যাও, ব'কো না বেশি তুমি। বুদ্ধি থাকলে এতদিন বড়নোক হয়ে যেতে তুমি কোন্ দিন।

তার মানে?

মানে আবার কি? বললাম, তুমি ভেবে দেখ কেনে! বলিয়া নিতাই হাত-মুখ ধুইয়া শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল। দীনু নির্বাক স্তম্ভিত হইয়া তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্ত্রী বলিল, হতভাগা উ কি বললে বল দেখি?

দীনু সে কথার কোন উত্তর দিল না, তাহার আর সময় ছিল না, সে বল্লম পেটি মাথালি ও লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া গেল। ডাক যাইবার সময় হইয়াছে।

ঝুনঝুন—ঠুনঠুন।

ডাক-হরকরা মৃদুতালে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। এই গতি তাহাকে বরাবর

সমানভাবে বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। পথে একদণ্ড বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, গতি শিথিল করিবার উপায় নাই, সামান্য বিলম্ব ঘটিলে কি হইবে দীনু কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভয় হয়। তাহার উপর পথে কোথাও ওভারসিয়ার হয়তো লুকাইয়া আছে, কোন জঙ্গলের মধ্যে কিংবা কোন গাছের ডালে বসিয়া ডাক-হরকরার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। সামান্য একটু শৈথিল্য দেখিলেই সে রিপোর্ট করিয়া বসিবে, সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে জরিমানার হুকুম আসিয়া পড়িবে।

দীনু একবার মাত্র জরিমানা দিয়াছে। গতি-শৈথিল্যের জন্যও নয়, পথে সে বিশ্রামও করে নাই, তবুও তাহাকে জরিমানা দিতে হইয়াছে। তখন সে নূতন কাজে ভর্তি হইয়াছে, বয়সও তাহার তখন অল্প। ওভারসিয়ারকে সে ঠকাইয়াছিল। সেদিন যে পথে ওভারসিয়ার লুকাইয়া থাকিবে—এ সংবাদ হরিপুরের পিয়ন তাহাকে পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছিল: দীনু, আজ সাবধান, পথে আজ থাকবে। কে থাকিবে, সে কথা দীনু, পিয়নের ভ্রূ নৃত্য দেখিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল। পথে সে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই সেদিন আসিতেছিল। সেদিন চাঁদনী রাত্রি—পৃথিবী যেন দুধে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। সুন্দীপুরের বুড়া-বটতলার অল্প দূরে আসিয়া দীনুর মনে হইল, গাছের একটা ডাল যেন অল্প অল্প দুলিতেছে। তরুণ দীনুর তরল চিত্তে দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল, সে পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের পথে নামিয়া পড়িল। গাছটাকে পাশে খানিকটা দূরে ফেলিয়া স্থানটা সন্তর্পণে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। বল্লমের ঘণ্টাটা হাতের মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল, ঘণ্টারও কোন শব্দ হইল না। তারপর ও-পাশে আবার পাকা রাস্তায় উঠিয়া স্টেশনে ছুটিল। সেদিন খুব একচোট হাসিয়া সে আপন মনেই বলিয়াছিল, থাক বাবাজীবন, পথের পানে তাকিয়ে গাছের ওপর ব'সে।

ওভারসিয়ার এদিকে গাছের উপর বসিয়া ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছিল, নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া গেল, তবু মেল-রানার আসিল না দেখিয়া সে চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে সে নিজেই ছুটিতে ছুটিতে হরিপুর পোস্ট-আপিসে আসিয়া হাজির হইল। সেখানে আসিয়া তাহার চিন্তার পরিমাণ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, কোথায় গেল মেল-রানার! সে আবার আমদপুর স্টেশন রওনা হইল। দীনু তখন সেখানকার ডাক লইয়া নির্দিষ্ট সময়েই হরিপুরে ফিরিয়া আসিতেছে। ওভারসিয়ার রিপোর্ট করিয়া বসিল। মিথ্যা বলিলে দীনুর জরিমানা হইত না, বরং ওভারসিয়ারেরই লাঞ্ছনা হইত। কিন্তু দীনু মিথ্যা বলিতে পারে নাই।

পিয়ন তাহাকে বার বার বলিয়া দিয়াছিল, তুই বলবি আমি ঠিক গিয়েছি হুজুর, ইস্টিশানের টাইম দেখুন ; আবার ঠিক সময়ে ফিরেছি, এখানকার টাইম দেখুন। ওভারসিয়ারবাবু হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

দীনু চিন্তিত মুখে উত্তর দিয়াছিল, তা আজ্ঞে, কি ক'রে বলব আমি ?

সুন্দীপুরের বটতলার নিকট আসিয়া দীনুর প্রায়ই কথাটা মনে পড়ে। সে অল্প একটু হাসে। আরও কতবার এইখানে ওভারসিয়ারের সহিত তাহার দেখা হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্য হইতে এখনও কোন কোন দিন কণ্ঠস্বর শোনা যায়, ডাক-হরকরা ?

দীনু উত্তরে প্রশ্ন করে, টায়েন ঠিক আছে বাবু ?

জঙ্গলের ভিতর হইতেই উত্তর আসে অথবা হাসিতে হাসিতে ওভারসিয়ার রাস্তার উপর আসিয়া বলে, ঠিক আছে রে। তোর কিন্তু এক দিনও দেরি হ'ল না দীনু।

ডাক-হরকরা কিন্তু দাঁড়ায় না, ওভারসিয়ারের এ ছলটুকুও সে জানে। সে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াই যায়। তাহার বর্শার ফলায় বাঁধা ঘণ্টা ঝুনঝুন শব্দে বাজিতেই থাকে।

ঝুনঝুন—ঝুনঝুন।

আজও দীনু নিয়মিত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল। ওভারসিয়ারের কথা মনে পড়ায় নিতাইয়ের চিন্তা ভুলিয়া সে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি, আজও আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। তারকা-দীপ্তিহীন মেঘলা আকাশ যেন অন্ধকারের মধ্যে মাটির বুকে নামিয়া আসিয়াছে। দীনুর হাতের আলোটা ধোঁয়ার কালিতে অন্ধ চক্ষুর মত জ্যোতিহীন পাণ্ডুর।

অন্ধকার বটবৃক্ষের তলদেশ হইতে একটি মানুষ আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইল। দীনু প্রশ্ন করিল, উপস্থারবাবু ?

উত্তরে লাঠির আঘাতে তাহার হাতের লণ্ঠনটা চুরমার হইয়া গেল।

ডাকাত ডাক লুটিতে আসিয়াছে।

মুহূর্তে দীনু ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া দাঁড়াইয়া হাতের বল্লমটা উঁচু করিয়া ধরিল ; বলিল, খবরদার, সরকারের ডাক।

এই দেখ, বস্তাটা দাও বলছি।

দীনুর হাতের বল্লমটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে বিকৃত কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল, কে—নেতাই ?

নিতাই ধাঁ করিয়া দীনুর কম্পিত হস্ত হইতে বল্লমটা কাড়িয়া লইল।

পর-মুহূর্তে সে শিকারী পশুর মত মেল-ব্যাগের উপর লাফাইয়া পড়িল। দীনু পড়িয়া গেল, মাথার মাথালিটা গড়াইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তবুও দীনু সবলে মেল-ব্যাগ নিজের বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, সর্বনাশ হবে নেতাই —কালাপানি – ফাঁসি হয়ে যাবে –

নিতাই ক্ষুধার্ত পশুর মত ব্যাগটা ধরিয়া টানিতেছিল, টানিতে টানিতেই হিংস্রভাবে সে বলিল, তখন বললে না কেনে – বলে রেখে দিলাম এমন ক'রে ? দাও বলছি, রাতারাতি দেশ ছেড়ে পালাব, চল।

দীনু এবার উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, ডাকাত – ডাকাত !

নিতাই বিপুল হিংস্রতায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

সহসা একটা আলোকরশ্মির আভাসে গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল। চমকিয়া উঠিয়া নিতাই সেই দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল একটা ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল আলো দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ক্রমশ আলোর প্রভায় স্থানটা প্রদীপ্ততর হইয়া উঠিতেছে। সে এবার শেষ চেষ্টা করিল, হাতের লাঠিটা কুড়াইয়া লইয়া সজোরে দীনুর মাথায় বসাইয়া দিল। মুহূর্তে ফিনকি দিয়া কালো একটা তরল ধারা ছুটিয়া বাহির হইয়া দীনুর মুখখানাকে বীভৎস করিয়া তুলিল। দীনু কাতর স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, বাবা গো !

আলোটা অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, নিতাই ব্যস্তভাবে আর একবার ব্যাগটা ধরিয়া আকর্ষণ করিল, কিন্তু দীনুর জ্ঞান তখনও লুপ্ত হয় নাই, অগত্যা নিতাই ব্যাগটা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

আলোটা একটা বাইসিক্লের আলো। আরোহী পথিক রক্তাক্ত দীনুকে দেখিয়া ভয়ে চিৎকার আরম্ভ করিল। অন্ধকার দুর্যোগের মধ্যেও মানুষের প্রয়োজনের শেষ নাই, পথে পথিকের পথ-চলার বিরাম নাই, কিছুক্ষণ পরেই দূরে মানুষের সাড়া আসিল। কে যেন সাড়া দিল।

দীনুর জ্ঞান হইলে সে দেখিল, প্রকাণ্ড একটা পাকা ঘরে একখানা লোহার খাটের উপর সে শুইয়া আছে, মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা, কপালে হাত দিয়া অনুভব করিল, কাপড় দিয়া মাথাটা তাহার বাঁধিয়া দিয়াছে। তাহার খাটের পাশেও সারি সারি লোহার খাটে আরও কত লোক শুইয়া আছে। দীনু বুঝিল, এটা হাসপাতাল। সে পূর্বে কয়বার শহরে আসিয়া হাসপাতাল দেখিয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে দীনুর সব মনে পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরই পোস্ট-আপিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন, এই যে, জ্ঞান হয়েছে তোমার।

দীনু সাহেবকে চিনিত, কিন্তু এখন সে তাঁহার মুখপানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল শুধু। সাহেব বলিলেন, খুব বাহাদুর তুমি। সরকার তোমার ওপর খুশী হয়েছেন। তুমি যে নিজের মাথা দিয়েও সরকারের ডাক বাঁচিয়েছ, এর জন্যে তুমি রিওয়ার্ড—মানে পুরস্কার পাবে।

দীনু তবুও নির্বাক।

সাহেব তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, কতজন ছিল তারা? কাউকে তুমি চিনতে পেরেছ?

দীনু এবার ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সাহেব নিজে পাখাটা লইয়া বাতাস দিয়া বলিলেন, ভয় কি, কাঁদছ কেন? কোনও ভয় নেই, শীগগির ভাল হয়ে যাবে তুমি। ডাক্তার বলেছেন, কোনও ভয় নেই তোমার।

তিনি নিজে রুমাল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, আচ্ছা, সুস্থ হয়ে ওঠ তুমি, আমি আবার আসব, রোজ এসে তোমায় দেখে যাব। ও-বেলায় ফল পাঠিয়ে দেব আমি।

দীনু অকস্মাৎ যেন বলিয়া উঠিল, হুজুর!

কিছু বলবে আমায়? কি বলবে বল?

দীনু অতি কষ্টে বলিল, হুজুর আমার ছেলে -

তোমার ছেলে তোমার ছেলেকে তুমি দেখতে চাও?

দীনু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কহিল, হাঁ হুজুর।

আচ্ছা।

সাহেব চলিয়া গেলেন।

তাহার পর আসিল পুলিস। পুলিসের বড় সাহেব নিজে আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিন্তু ডাকসাহেবের মত এত সহজে দীনুকে নিষ্কৃতি দিলেন না। বার বার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কাউকে তুমি চিনতে পার নি?

দীনু উত্তর দিল, অন্ধকার হুজুর।

কতজন ছিল তারা?

ভাবিয়া-চিন্তিয়া দীনু আবার বলিল, অন্ধকার হুজুর।

আচ্ছা, কি রকম দেখতে বল তো? খুব জোয়ান?

• আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক, কি ছোটলোক ?

দীনু চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, কি বলিবে, কাহার নাম সে করিবে! মিথ্যা করিয়া অন্য কাহারও নাম –

দীনু শিহরিয়া উঠিল।

সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীনুকে লক্ষ্য করিতেছিলেন ; তিনি বলিলেন, দেখ, তুমি তাদের জান, চিনতে পেরেছ , বল তুমি, সে কে ?

দীনু বিবর্ণ মুখে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সাহেব এবার রক্তচক্ষু হইয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, বল।

দীনু বিহ্বলেব মত চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বলিল, হুজুর, আমার ছেলে নেতাই।

সাহেব বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন না, তবুও সামান্য বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না, বলিলেন, সে তোমাব ছেলে ?

উপরের দিকে মুখ তুলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে দীনু বলিল, হাঁ৷ হুজুর।

আর ? আর কে ?

আর কেউ না।

পুলিস কিন্তু নিতাইকে পাইল না। সেই রাত্রি হইতেই নিতাই নিরুদ্দেশ। তাহার উদ্দেশ করিতে পুলিস উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল।

তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল—এগারো বৎসর। দীনু আজও ডাক-হরকরাব কাজ করিতেছে। অন্ধকারে জ্যোৎস্নায়, বাদলে বর্ষায়, দুরন্ত শীতের রাত্রে এখনও সে তেমনই কোমরে পেটি বাঁধিয়া বল্লম আলো হাতে ডাক লইয়া যায় আসে। এখনও তেমনই তাহার ঘড়ির কাঁটার মত গতি।

নিতাই কিন্তু সেই যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, আজও তাহার কোনও সন্ধান মিলে নাই। সরকারের মুলুকে সর্বত্র থানায় থানায় নাকি তাহার আকৃতির বিবরণ দিয়া হুলিয়া বাহির করা হইয়াছে। কিন্তু কোথায় নিতাই!

দীনুর স্ত্রী সময় সময় ঘরের মধ্যে অতি মৃদুস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে, দীনু বাড়িতে থাকিলে নির্বাক হইয়া বাহিরে দাওয়ার উপর দুই হাতে মাথা ধরিয়া মাটির দিকে চাহিয়া থাকে। সান্ত্বনাও দিতে পারে না, বিরক্তিও প্রকাশ করে না।

পাড়াপড়শীরা দীনুর নাম দিয়াছে—যুধিষ্ঠির। তাহাদের অশিক্ষিত জড়তাযুক্ত

জিহ্বায় তাহারা বলে যুজিষ্টির।

লজ্জায় দীনুর মাথা নুইয়া আসে। মাথা হেঁট করিয়া পাড়ার পথে সে যাওয়া-আসা করে। পোস্ট-আপিসেও তাহার সম্মান খুব বাড়িয়া গিয়াছে। যে কেহ নূতন ডাকবাবু কি ডাকসাহেব আসেন, তিনিই জিজ্ঞাসা করেন দীনু কে?

দীনু মাথা হেঁট করিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়ায়। সেদিন সে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া উঠে, অকারণে পিয়নদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া বসে। সেদিন তাহাদের বাসন মাজিয়া দেয় না, ডাকবাবুর গরুর ঘাস আসে অত্যন্ত কম।

পিয়ন বলে, এত গরম ভাল নয় রে, বুঝলি?

সেদিন কার্তিক মাসের একটি স্বল্প শীতকাতর রাত্রি। কার্তিক মাসেই শীত এবার ঘন হইয়া আসিয়াছে। দীনু ডাক লইয়া নির্দিষ্ট সময়েই আমদপুর পোস্ট-আপিসে হাজির হইল। এই আমদপুরেই রেলওয়ে স্টেশন, এখানকার পোস্ট-আপিস হইতে আবার ডাক লইয়া দীনু হরিপুর ফিরিবে। ডাক ফেলিয়া দিয়া সে তাহার নির্দিষ্ট চটখানা বিছাইয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িল। আপ-ডাউন মেল-ট্রেন চলিয়া গেলে ডাক লইয়া তাহাকে আবার রওনা হইতে হইবে। পাশে আরও কয়েকজন মেল-রানার শুইয়া আছে। তাহারা গল্প করিতেছিল ওভারসিয়ারকে লইয়া। জরিমানার প্রত্যক্ষ কারণ এই লোকটি কখনই ভাল লোক নয়, এই তাহাদের প্রতিপাদ্য ছিল। ও-পাশে দুইজন বোধ হয় ঘরের সুখ-দুঃখের কথা কহিতেছিল।

ওদিকে স্টেশনে আপ-মেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

দীনু বিরক্তভাবে বলিল, একটুকুন ঘুমো বাপু সব। পশ্চিমের ডাকগাড়ির ঘণ্টা হয়ে গেল। কলকাতার গাড়ি এলেই তো আবার সেই তল্পি কাঁধে তোল।

একজন ব্যঙ্গ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, চুপ চুপ, ধম্মপুত্তুর যুজিষ্টির রেগেছে।

চাপা হাসির গুঞ্জনের শব্দে দীনু স্তব্ধ হইয়া গেল। সে কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। মনে পড়িয়া গেল নিতাইকে। নিতাই মরিয়া গেলে দীনু এতদিনে হয়তো তাহাকে ভুলিত। জীবন্ত মানুষ হারাইয়া যাওয়ার চেয়ে সে শতগুণে ভাল; এ যে প্রতি প্রভাতে মনে হয়, আজ সে আসিবে; দিন ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কাল সে আসিবে।

সকলের চেয়ে বড় আক্ষেপ দীনুর—নিতাইয়ের সন্ধান সে করিতে পাইল না। সেদিন একজন যাত্রী এই স্টেশনে একটা আনি হারাইয়া সমস্ত রাত্রি

পথের ধুলা ঘাঁটিয়া খুঁজিয়াছে। আর একটা মানুষ –

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। সে ঘুম ভাঙিল তাহার পিয়নদের ডাকে। ডাউন মেল-ট্রেন চলিয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে বিভিন্ন পোস্ট-আপিসের জন্য ডাক বাঁধা হইতেছিল। হরকরারা আপন আপন পেটি বল্লম লণ্ঠন লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। প্রস্তুত হইয়া দীনু তামাক সাজিতে বসিল। ওদিকে ছোকরারা একটা আগুন জ্বালাইয়া হাত-পা গরম করিতে বসিয়াছে।

ঘরের ভিতর হইতে পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, ও দীনু, আফ্রিকাতে তোর কে আছে রে, অ্যাঁ—ইন্‌সিওর ক'রে টাকা পাঠাচ্ছে ?

দীনু আশ্চর্য হইয়া গেল, বলিল, সি আজ্ঞে, কোথা বটেন ?

ওঃ, সে জাহাজে ক'রে যেতে হয় রে, সমুদ্দুর পেরিয়ে ! কাফ্রীর মুলুক সে, মানুষে সেখানে মানুষ খায়, প্রকাণ্ড বড বড বন, সিংহী গণ্ডার বাঘ ভাল্লুকে ভর্তি সেসব।

দীনু আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, সে দেশের নামই আমি শুনি নাই কখুনও !

দাঁড়া দাঁড়া, কে পাঠাচ্ছে দেখি। এ যে দেখছি সাউথ আফ্রিকান স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি—জাহাজ-কোম্পানি ! ওঃ, এ যে অনেক টাকা রে—সাডে পাঁচ শো টাকা।

দীনু অবাক হইয়া ভাবিতেছিল। সহসা সে বলিল, আজ্ঞে দেখি বাবু একবার।

পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, দেখে আব কি করবি বাবা, একেবারে হবিপুব পোস্ট-আপিসেই গিয়ে নিবি।

ডাক বাঁধিয়া দীনুর কাঁধে তুলিয়া দিয়া দীনুকে তিনি বিদায় করিয়া দিলেন। আকাশে শেষরাত্রির জ্যোৎস্না তখন ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে। চাঁদ পাণ্ডুর, 'সাত ভাই তারাগুলিও ডুবিল বলিয়া। শেষরাত্রির বাতাসে যেন হিম ঝরিতেছে। দীনু জনহীন পথে চলিয়াছে, ঝুনঝুন ঝুনঝুন। চলিতে চলিতে সে ভাবিতেছিল—কোন্ দেশ-দেশান্তর হইতে জাহাজ-কোম্পানি তাহাকে টাকা পাঠাইল, কিসের জন্য।

অল্প টাকা নয়, সাড়ে পাঁচ শো টাকা উঃ, সে কত টাকা ! ব্যাগটা যেন দীনুর ভারী মনে হইতেছিল। সহসা দীনুর খেয়াল হইল এ কি, সে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে যে! সে আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। চলিতে

চলিতে সে পথের কোন্‌খানে কতদূর আসিল বুঝিতে পারিল না, কিন্তু মন তাহার দেশ-দেশান্তরের এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গেল। কে সে কোম্পানি? কিসের জন্ত তাহাকে এত টাকা পাঠাইয়াছে সে? সে যেন দেখিতেছিল— বিশাল অন্ধকার অরণ্য, বাঘ সিংহ ভালুক সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কোম্পানি কই? দীনু তাহার পিছনটা দেখিতেছে, সে যেন পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে।

সহসা তাহার মনে হইল, ওই কোম্পানি তাহার নেতাই নয়তো? নিতাই হয়তো দেশান্তরে পলাইয়া গিয়া অগাধ ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে। পাকা বাড়ি গাড়ি ঘোড়া চাকর। কল্পনার গভীর অরণ্যে মুহূর্তে গড়িয়া উঠে বাবুদের চুনকাম-করা পাকা বাড়ির মত বাড়ি।

দীনুর সর্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, হিম-শীতল রাত্রির শীতজর্জর সেই শেষ প্রহরেও সে ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল। কাঁধের কাগজের বস্তা যেন সোনায় বোঝাই বস্তার মত গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে। একটি পরম উত্তেজিত মুহূর্তে কাঁধ হইতে ব্যাগটা ধপ করিয়া মাটির উপর ফেলিয়া সে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাহার পাশে দাঁড়াইল। চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছে। বুকের মধ্যে উৎকণ্ঠার পরিমাণ হয় না, হৃৎপিণ্ডটা শরবিদ্ধ পশুর মত যেন ছটফট করিতেছে। দীনুর ইচ্ছা হইল, এই মুহূর্তে এইখানেই ব্যাগটা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া লয়।

পর-মুহূর্তে সে আবার ব্যাগটা ঘাড়ে তুলিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল, প্রাণ-পণে ছুটিল।

এ কি, পাখিরা কলকল করিয়া ডাকিয়া উঠিল যে! ভোর কি হইয়া গেল নাকি? কই, আকাশে 'ভুক্কো' তারা কই? কিন্তু দীনুর যে এখনও অনেক পথ বাকি। এ তো ষোল মাইলের পাথর সে পার হইল! এখনও যে তিন মাইল পথ তাহাকে যাইতে হইবে!

দীনু যখন হরিপুর পোস্ট-আপিসে পৌছিল, তখন বেলা সাড়ে সাতটা, প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরী হইয়া গিয়াছে। পোস্ট-মাস্টার, পিয়ন, সংবাদপ্রার্থীর দল উৎকন্ঠিত প্রতীক্ষায় দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। দীনু ক্লান্তভাবে ব্যাগটা ফেলিয়া দিয়া অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, এত দেরি কেন হ'ল রে? এ কি, তোর কি অসুখ করেছে দীনু?

দীনু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, ডাকটা কেটে ফেলেন বাবু।

আচ্ছা আচ্ছা, ব'স্, শিগগির তোর ছুটি ক'রে দিচ্ছি।

ডাক কাটিয়া পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, এ কি রে, তোর নামে যে একটা ইন্সিওর দীনু! টাকাও তো কম নয়, সাড়ে পাঁচশো! ওঃ, এ যে আফ্রিকা থেকে আসছে দেখছি!

দীনু কথা কহিতে পারিল না, শুধু হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, হাতটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

পোস্ট-মাস্টার হাসিয়া বলিলেন, দাঁড়া একটু, জমা ক'রে নিই।

পিয়ন বলিল, আমাদের কিন্তু পাঁচ টাকা দিতে হবে, মিষ্টি খাব।

দীনু নির্বাক। জমা করিয়া লইয়া পোস্ট-মাস্টার বলিলেন, এইখানে একটা টিপ-ছাপ দে তো দীনু। হ্যাঁ—নে, এই নে।

খামখানা হাতে লইয়া দীনু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, জাহাজের ছবি আঁকা সুন্দর খাম, ছাপার হরফে নাম লেখা।

মাস্টার বলিলেন, দে, দেখি খুলে।

সন্তর্পণে ছুরি দিয়া খামখানা কাটিয়া সর্বাগ্রে তিনি নোট কয়খানা দেখিয়া বলিলেন, নে, ঠিক আছে সব। এ নোট আবার তোকে ভাঙাতে হবে। এই যে চিঠিও রয়েছে।

চিঠিখানা তিনি মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ওদিকে পিয়ন ডাক বিলি করিতেছিল

পরম কল্যাণীয়া জগত্তারিণী দাসী, কুড়িগ্রাম।

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে বাঁড়ুজ্জে মশায়, চিঠি।

এটা আবার হিন্দী। কি? ডাংখানা হরিপুর। সু—সুখন চৌবে।

দীনু বলিল, বাবু!

বাবু ভাবিতেছিলেন, কি বলিবেন। নিতাইয়ের সংবাদ, নিতাই সেখানে জাহাজের খালাসীর কাজ করিত, সে মারা গিয়াছে। কোম্পানি তাহার অন্তিম-নির্দেশমত তাহার সঞ্চিত অর্থ দীনুকে পাঠাইয়াছে।

দীনু আবার প্রশ্ন করিল, বাবু?

কি লিখেছে ভাল বুঝতে পারছি না রে! আচ্ছা, নিতাই কে? নিতাই তো তোর সেই ছেলে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেমন আছে সে? কোথা আছে?

পোস্ট-মাস্টার নীরবে মাথা নত করিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিয়া দীনু বলিল, নেতাই নেই?

পোস্ট-মাস্টার নীরব হইয়াই রহিলেন। দীনুও মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। চোখ দিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটির বুকে ঝরিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছিল। কত কথা এলোমেলোভাবে তাহার শোকাতুর মনে জাগিয়া উঠিতেছিল—সবই নিতাইয়ের কথা।

পোস্ট-মাস্টার অপরাধীর মত বলিলেন, আনন্দ ক'রে চিঠিটা খুললাম দীনু, কিন্তু শেষে আমিই তোকে এই খবরটা দিলাম।

দীনু চমকাইয়া উঠিল, তাহার মনে পড়িল, সে নিজেই তো চিঠিখানা আনিয়াছে।

থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, উঃ, এমন সংবাদ এই দীর্ঘ-কাল ধরিয়া নিত্য নিত্য কত সে বহিয়া আনিয়াছে। কত—কত—কত—সংখ্যা হয় না। মনে হইল, আজও পর্যন্ত যত রোদনধ্বনি সে শুনিয়াছে, সে সমস্ত দুঃসংবাদ সে-ই বহন করিয়া আনিয়াছে।

চোখের জল মুছিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি আর কাজ করব না বাবু, কাজে জবাব দিলাম।

প্রতীক্ষা

সংসারে কালোরও একটা রূপ আছে। রূপশিখায় দীপ জ্বলে না, অন্ধকার আলো হয় না, কিন্তু মন-পতঙ্গ পুড়িয়া মরে। বাউরীর মেয়ে পরীর নিকষ-কালো বর্ণ, কিন্তু তবু তাহার রূপকে অস্বীকার করা চলে না। তাহার কালো দেহখানি ঘেরিয়া যে রূপশিখা একদিন যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে বহুজনের মন-পতঙ্গই উন্মত্তের মত ঝাঁপ দিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। অবিরাম তাহারা সে শিখাকে বেষ্টন করিয়া উড়ে।

কিন্তু পরী আলো নয় আলেয়া; ভাস্বর প্রভায় রাত্রির পথিকের চোখ ধাঁধিয়া দেখা দেয়, ইশারায় ডাকে, কিন্তু ধরা দেয় না, নিঃসাড়ে সরিয়া যায়।

মানুষের মন লইয়া সে খেলা করে।

নিতান্ত তুচ্ছ কৌতুকে সে হাসির কলধ্বনি তোলে, একান্ত অপ্রয়োজনেই সে চকিত চাহনি হানিয়া লঘুগতিতে চঞ্চল হরিণীর মত দেহে হিল্লোল তুলিয়া ছুটিয়া যায়। বারবার তাহার কোঁকড়া চুলের রাশি এলাইয়া পড়ে, সে কৃত্রিম বিরক্তিতে দুই হাতে এলো খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে বলে, বাবা রে, বাবা রে, মনে হয়, বঁটি দিয়ে চুলের আপদ কেটে ফেলি।

পতঙ্গের দল উন্মত্ত হইয়া উঠে, বিবাহার্থীর দল ভিড় করিয়া আসে। পরী হাসিয়া বলে, মরদের মুরদ কত শুনি? কে কি গয়না দিবি বল্?

রূপের বিনিময়ে রূপায় তাহার মন উঠে না, সে চায় সোনার গহনা।

দিন-মজুরদের ছয় আনা দৈনিক আয়, তাহাতে সোনার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের মতই ভয়াবহ, তাহারা মুখ কালো করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া যায়।

পরী গালে টপ করিয়া আলগোছে একটা পান ফেলিয়া চওড়া লালপেড়ে মিহি শাড়িখানি পরিয়া ঝুড়ি-কাঁখে রাজমিস্ত্রী গনি মিঞার কাছে রোজ খাটিতে যায়। থাকবন্দী ইট মাথায় অবলীলাক্রমে মই বাহিয়া উঠিতে উঠিতে গান গায়—

মিহি শাড়িখানি পরিতে না জানি, না জানি বাঁধিতে কেশ।

পরীর শাড়ির মূল্যের মহার্ঘতা লইয়া পাড়ায় তর্ক হয়। তাহার চাল-চলনের সমালোচনা হয়। অবশেষে একদিন বাউরী-পঞ্চায়েত প্রকাশ্যভাবে পরীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাহার পিতাকে ডাকিয়া সমাজচ্যুত করিয়া দিল।

গিরিশিখর আঘাতে টলে, ভাঙে; কিন্তু গিরিকন্যা তরঙ্গিণী আঘাতে উছলিয়া উঠে, রঙ্গিণী রঙ্গ করিতেও ছাড়ে না, স্রোতও বন্ধ হয় না। এ আঘাতে

পরীর বাপ মাথা হেঁট করিল, কিন্তু পরী সেই পরী, সে সেই তেমনই বিলাস করিয়া রোজ খাটিতে যাইতে যাইতে গান গায় -

পোড়ামুখী কলঙ্কিনী রাই লো!

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই হাসিয়া ভাঙিয়া পড়ে।

ভাদ্র মাসে ইন্দ্রপূজার সময়েই, 'ভাজো পরব' – নৃত্যে গীতে সুরে সঙ্গীতে এই বাউরী জাতি সুররাজের উপাসনা করে। দিবারাত্রি সুরার স্রোত বহিয়া যায়।

ফুলে পাতায় মণ্ডপ সাজাইয়া ইন্দ্রদেবতার বেদী প্রস্তুত করে। ঢোল কাঁসি বাজাইয়া মেয়েরা গান গাহিতে গাহিতে জল ভরিতে যায়, তাহারা চুলে পরে শালুক ফুলের মালা, গলায় দোলায় লাল সাদা হরগৌরী ফুলের হার।

পরী এবার 'সাজার ভাঁজো'য় স্থান পাইল না। কিন্তু সে দমিবার মেয়ে নয়, মুখ বাঁকাইয়া উপেক্ষাভরে সে বলিয়া উঠিল, তবে তো মাটিতে ফাটল ধরল লো, আমি তাতে সেঁদিয়ে যাব।

বলিয়া সে বাড়িতে আসিয়া ভাজোর মণ্ডপ সাজাইয়া তুলিল, ঢোল কাঁসির বায়না দিল।

পূজার দিন।

ঢোল ও কাঁসির বাজনার সঙ্গে মেয়েদের গানে ভাদ্র মাসের সজল সন্ধ্যা মুখরিত হইয়া উঠিল।

পরীর উঠানে আলোর আড়ম্বরে উৎসবের সমারোহ। সে একটা হেজাক বাতি জ্বালাইয়াছে। পানওয়ালা নাক-কাটা ফকিরের কাছে আট আনায় আলোটা সে ভাড়া করিয়া আনিয়াছে। উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে বিলাসিনী পরী গান গাহিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে সমাজচ্যুতের ঘরে সমাজ জমিয়া উঠিল।

বাজনদার ঢুলীটারও নেশা জমিয়াছে। তালের পরিবর্তে বেতাল তাহার ঘাড়ে ভর করিয়া বসিয়াছে, ঘন ঘন তাহার বাজনায় তাল কাটিতেছিল। অকস্মাৎ গানটার শেষের মুখে রঙ্গিণী পরী পায়ের ধূলা তুলিয়া ঢুলীটার মুখে ছিটাইয়া দিল।

ও-ধার হইতে আখনা উঠিয়া আসিয়া ঢুলীটার কাঁধ হইতে ঢোলটা কাড়িয়া লইয়া কাঁধে ঝুলাইয়া কাঠি দিল - কুড়ুতাং কুড়ুতাং কুড়ুম্ কুড়ুম্। সঙ্গে সঙ্গে আখনা ওরফে রাখনা ওরফে রাখহরি গানও ধরিয়া দিল -

ও কালো কালিন্দী-কূলে কালো কানাই বাজায় বাঁশি
আমি কুলে কালি দিব কালো রূপই ভালবাসি।

পরী উত্তরে গান ধরিল —

কে বলে রে কে বলে রে আমার ভাঁজো কালো
লায়ে থেকে আনব সিঁদুর ভাঁজো করবে আলো।

আখনা গাহিল—

তোর ভাঁজোতে মোর ভাঁজোতে পাতিয়ে দেব সই
গয়না কিন্তু লারব দিতে মুড়কীমালা বই।

পরী উত্তর দিল—

মুড়কীমালা তোরই থাকুক গুড়-মাখানো খই
আমি বরং দোব কিনে পয়সাটাকের দই।

ওদিকে ঢুলীটা শঙ্কিত হইয়া উঠিল, রাখহরি ঢোলটা বোধ হয় আর রাখিবে না, উৎসাহের প্রাবল্যে ঢোলের কাঠি লাঠি হইয়া উঠিয়াছে।

সে বলিল, আখনা, ঢোল আমাকে দে বাপু।

আখনা বলিল, বেরোও বেটা তালকানা, তাল জান না, বাজনা বাজাতে চ'লে এসেছ!

ঢুলী অবশেষে ঢোলটা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। আখনা সুর ও সুরাব নেশা ছাড়াও পরীর নেশায় পাগল, সে বেশ করিয়া ঘা কতক ঢোলের পরিবর্তে ঢুলীটার পিঠের উপরই বসাইয়া দিল। ঢুলীটা পলাইয়া বাঁচিল। তারপর সমস্ত রাত্রি আখনা বাজাইল, গাহিল, পরী নাচিল, গান গাহিয়া উত্তর দিল।

ভোরবেলায় ভাজো ভাসাইয়া পরী ঘরে ফিরিল। আখনাও অগত্যা আপন ঘরে ফিরিয়া বসিয়া বসিয়া ঢোলটিতেই মৃদু আঘাতে বোল তুলিতে আরম্ভ করিল।

সকালে মুচীটা আসিয়া বলিল, এইবার আমার ঢোল ফিরে দে আখনা।

আখনার এখনও প্রত্যাশা ছিল - দ্বিপ্রহরে আবার একবার সে বাজাইবে, পরী নাচিবে। পরীর দেহের অবসাদটা একবার কাটিলে হয়, সে পরীর আঙিনায় গিয়া ঢোলে আবার একবার কাঠি দিবে কুড়ুতাং কুড়ুতাং কুড়ুম্ কুড়ুম্।

মুচীর কথায় সে অগ্নিমূর্তি হইয়া লাঠি বাহির করিয়া বলিল, দোব তোমার নেতার মেরে বেটা, পালা বলছি।

কাঠির আঘাতের বেদনাই মুচীটার এখনও যায় নাই, লাঠি দেখিয়া সে আর বাদপ্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না, পলাইয়া আসিল। পলাইয়া আসিয়া সে গেল বাবুদের বাড়ি। ঢোলের জন্য এবং প্রহারের জন্য সে আখনার বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিয়া বসিল।

আখনার সবে তন্দ্রা আসিয়াছে, তন্দ্রার ঘোরের মধ্যে কানের পাশে তখনও পরীর গানের প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে, বাবুদের চাপরাসী আসিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া রূঢ় একটা ঝাঁকি দিয়া ডাকিল, চল্, তোকে বাবু ডাকছে।

বাবুদের দরবারে বিচারের চালই আলাদা, সেখানে ফরিয়াদীর ক্ষতিপূরণ হউক আর না হউক, জরিমানা আদায় হয় আগে, বিচারে আখনার পাঁচ টাকা জরিমানা হইয়া গেল। টাকা না দেওয়া পর্যন্ত আখনা বন্দী হইয়া রহিল। আখনার তাহাতে আপত্তি ছিল না, শুধু আপত্তি দ্বিপ্রহরের জন্য—পরীর সহিত আর একবার বাজাইতে তাহার বড় সাধ। বাবুদের সিমেণ্ট-বাঁধানো দাওয়াটি বড় শীতল, সেই দাওয়ার উপর বসিয়া থাকিতে থাকিতে সে শুইয়া পড়িল। তারপর তাহার নাক ডাকিতে আরম্ভ হইল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ঘুম ভাঙিয়া যাইতেছিল, অতি কষ্টে সে চোখ মেলিয়া দেখিতেছিল, দুপহরের কত দেরি!

হঠাৎ একবার তাহার ঘুম ভাঙিল কাহার ডাকে। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, পরী তাহাকে ডাকিতেছে, উঠে আয়।

চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিয়া সে দেখিল, বাবু কয়টা টাকা বেশ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

পরী আবার ডাকিল, আ, তোমার ঘুমের মাথা খাই, বলি উঠে আয়।

বাবু বলিলেন, মুচীর ঢোলটা দিয়ে দিবি।

পরী বলিল, পাঁচটা টাকা দিলাম, আবার ঢোলটাও দোব কেন? ঢোল দোব না।

বাবু বলিলেন, কি বললি হারামজাদী?

পরী উত্তর দিল, আজ্ঞে তা হ'লে আমি থানায় যাব। বলিয়া সে আখনার হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

কোন্ কুঞ্জবন হইতে কোন্ পুষ্পশর যে মনসিজ কখন কাহার প্রতি হানিয়া থাকেন, সে মানুষের বোধের অগম্য।

মনসিজের পুষ্পশরে পরী জর্জর হইয়া উঠিল। বিলাসিনী আখনাকেই বিবাহ করিয়া বসিল, তাহার সামর্থ্যের বিচার করিল না, ভবিষ্যৎ ভাবিল না, আপনার মনকেও সে ভাল করিয়া বুঝিল কি না, কে জানে!

আখনাও কৃতার্থ হইয়া গেল, সে জাতি মানিল না, স্বজন ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে পরীকে লইয়া ঘর বাঁধিল।

পথিক পথ চলে, ক্লান্ত হইলে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করে, বৃক্ষতল তাহার আশ্রয়।

সন্ন্যাসীও বিশ্রামের জন্য কুটীর বাঁধে, সেও তাহার আশ্রয়। কিন্তু নর ও নারী জীবনে মিলিত হইয়া যে আশ্রয়স্থান গড়িয়া তুলে, তাহার নাম নীড়। নীড়ের একটি মমতা আছে।

এই নীড়কে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার একটি ব্যগ্র কামনা বহ্নি-শিখার মত নর ও নারীর মনে অহরহ জ্বলে।

আখনা এই নীড়ের মমতায় চাকরি লইল। সে উপাদান বহিয়া আনে, পরী নীড়কে সেই উপাদানে সাজাইয়া তুলে। পরীও মজুর খাটিয়া সাহায্য করিতে চায়, কিন্তু আখনার তাহাতে ঘোর আপত্তি।

পরী হাসিয়া বলে, এত ভয় কেন তোর, বল্ তো ?

আখনা বলে, ভয় আবার কি, কিসের ভয় ?

আমাকে বাক্সেতে ভ'রে রাখবি নাকি ?

বাহুপাশে পরীকে আবদ্ধ করিয়া আখনা বলে, ভ'রে তো রেখেছি।

পরী আখনার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইল, সে রেজা খাটা পরিত্যাগ করিল।

পাড়াপড়শীরা পরীর পরিবর্তন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল।

বিয়ে—বিয়ে করলেই ঘরথাই হয় গো, এই আমাদের পরীকে দেখ্ কেন! সেই পরী অ্যা—ছবি কত পরীর!

আবার কেহ কেহ বলিল, নতুন নতুন নালতের শাকও ভাল লাগে গো। দাঁড়াও, দিন কতক কাটুক।

সত্য কথা, প্রেম ও মোহ দুইটা বস্তু আসল ও গিলটি সোনার মত, কালের আগুনে না পোড়াইলে স্বরূপ বোঝা যায় না।

মাস আষ্টেক পর, পরী আবিষ্কার করিল, তাহার সঞ্চিত বিলাস-উপকরণ-গুলি সব জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

সে আখনাকে বলিল, আমার কাপড় চাই।

আখনা আশ্চর্য হইয়া বলিল, এই সেদিন যে কাপড় এনে দিলাম —

ও আটপৌরে নয়, ডুরে কাপড়—নতুন নতুন ডুরে উঠেছে সব, ওই নোব আমি।

আখনা চিন্তিত মুখেই বলিল, মুনিব যে এখন মাইনে দেবে না।

পরী বিরক্ত হইয়া বলিল. তুই কোথা পাবি তা আমি কি জানি, বিয়ে করেছিলি কেন ?

আখনা বলিল, বিয়ে করেছি ব'লে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি নাকি ?

তোকে আমাকে ছিক্ষের কাপড় দিতে হবে নাকি ?

পরী পরিষ্কার বলিয়া দিল, তবে তোর সঙ্গে আমার বনবে না।

আখনা এবার সান্ত্বনা দিয়া কহিল, এই মাসখানেক পরেই তো ধরমপূজো—এ কটা দিন সবুর কর্, তখুনই কিনে দোব।

পরী মানিয়া লইল।

দিন কয়েক পরে পরী মুখ-ভরা হাসি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া আখনাকে কহিল, কেমন চুড়ি গড়ালাম দেখ্।

সে হাত মেলিয়া আখনার সম্মুখে ধরিল। নিটোল সুগঠিত কালো হাতের উপর সাদা রূপার চুড়িগুলি বড় সুন্দর মানাইয়াছিল।

আখনা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল।

পরী হাসিয়া বলিল, দু টাকা বানি দিতে হবে, হঁ্যা।

আখনা চমকিয়া উঠিল, বলিল, দু টা-কা !

পরী বিস্মিত হইয়া উত্তর দিল, দু টাকা নইলে চুড়ি হয় ?

আখনা গজগজ করিয়া বলিল, এখন না গড়ালেই হ'ত !

ভেঙে গিয়েছিল যে।

এখন আমি টাকা কোথা পাব বল্ দেখি ?

আজ এক কথাতেই পরী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, তোকে লাগবে না টাকা। আমি গতরে খেটে শোধ দোব।

সে বহুদিনের পরিত্যক্ত ঝুড়িটা কাঁখে লইয়া দাঁড়াইল।

আখনা তাহার কাপড় চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এই দেখ্, পরী—

কি ?

ভাল হবে না বলছি।

না হ'ল তো বয়েই গেল।

আচ্ছা আচ্ছা, আমি দোব বানি, আজই দোব।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আখনা মনিবের জনশূন্য বৈঠকখানাটায় প্রবেশ করিয়া সন্তর্পণে রূপা-বাঁধানো হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া কাপড় ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িল।

পরী চুড়ি পরিল, আখনা চুরি করিল।

দেখিতে দেখিতে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধরমপূজা আসিয়া পড়িল। ধরমপূজা বাংলার নিম্নশ্রেণীর জাতির একটা প্রধান উৎসব। নূতন কাপড় এ সময়ে চাই।

আখনা এক জোড়া শাড়ি কিনিয়া আনিয়া পরীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সাধারণ শাড়ি, তবে উহারই মধ্যে একটু চিকন। কাপড়খানার দিকে দৃষ্টিপাত

করিয়া পরীর সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে লাথি মারিয়া কাপড়খানাকে সরাইয়া দিল।

আখনা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, লাথি মেরে কাপড় ফেলে দিলি, এত বাড় তোর ?

পরী বলিল, বেশ করেছি। এমন কাপড়ে আমি পা ধুয়ে পা মুছেছি জানিস ? ডুরে কাপড় দোব বলিস নাই তুই ?

আখনা বলিল, তার দাম কত তা জানিস ? আমাকে বেচলে হবে না।

পরী উত্তর দিল, ঝাঁটা মারি এমন মরদের মুখে।

স্বামীর অর্থই হইল প্রভু, আখনার মনের প্রভু গর্জন করিয়া উঠিল, তাহার আর সহ্য হইল না। সে নির্দয়ভাবে পরীর হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বলিল, কি বললি ?

পরী সজোরে হাতটা ছাড়াইয়া বলিল, তোর ঘর আমি আর করব না। আমি চললাম।—বলিয়া সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে সে ফিরিয়া আসিল মূল্যবান একখানি ডুরে শাড়ি অঙ্গে জড়াইয়া।

বিলাসিনী যেন অঙ্গে বিলাসকে জড়াইয়া লীলা করিতেছিল।

আখনা জিজ্ঞাসা করিল, এ কাপড় তুই কোথা পেলি বল্ ?

পরী বলিল, যেখানে পাই তোর কি ? আমি দোকান থেকে ধারে নিয়ে এসেছি। আপনি গতরে খেটে শোধ দোব।

আখনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বাহির হইয়া গেল। পরীকে সে রোজ খাটিতে দিবে না ; যেমন করিয়া হউক, এ টাকা তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে।

সেদিন গভীর রাত্রে সে ফিরিল ধানের বস্তা মাথায় লইয়া। অন্ধকার অঙ্গনে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, পরী !

কেহ সাড়া দিল না।

আবার সে ডাকিল, পরী !

পরীর তবু ঘুম ভাঙিল না। সে এবার দরজায় হাত দিয়া ডাকিবার জন্য দরজায় হাত দিয়াই চমকিয়া উঠিল।

এ কি, ঘরে যে শিকল দেওয়া ! তবে কি পরী ঘরে নাই !

তাড়াতাড়ি ঘর খুলিয়া অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া সমস্ত ঘরটা খুঁজিয়া দেখিল—ঘর শূন্য, পরী নাই। সে পাগলের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া পরীর সন্ধানে ছুটিল।

কিন্তু পরীর সন্ধান মিলিল না। অবসন্ন দেহে যখন সে ঘরে ফিরিল, তখন সকাল প্রায় আটটা। ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহাকেই লোকজন খুঁজিতেছে। ঘরের উঠানটা পুলিসের লোকে ভরিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পাড়ার বাবুদের ধান চুরি গিয়াছে, ছড়ানো ধানের রেখা ধরিয়া তাহারা আখনার বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছে, ধানের বস্তাও পাওয়া গিয়াছে। উঠানেই ধানের বস্তাটা পড়িয়া ছিল।

আখনার জেল হইয়া গেল।

আখনা জেল হইতে ফিরিল দুই বৎসর পর।

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন বলিল, বেশ হয়েছে, ঘাড়ের পেত্নী ছেড়েছে, এইবার আবার বিয়ে কর্।

আখনা শূন্য ঘরের দিকে তাকাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হেঃ—আবার!

সকলে চলিয়া গেলে নির্জনে অন্তরঙ্গ বন্ধু হাবাকে ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা, পরী কোথায় গেল বল দেখি?

হাবা বলিল, কে জানে ভাই, লোকে বলছে, সে মুসলমান হয়েছে। কলকাতা না কোথা গিয়েছে।

আখনা কয়েক দিন পরেই কলিকাতা চলিয়া গেল। বৎসরখানেক পর সে একাই ফিরিল, পরার সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কিন্তু লক্ষ্মী তখন তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে। অনেকগুলি টাকা উপার্জন করিয়া সে ঘরে ফিরিল।

এবার আত্মীয়স্বজনে আবও ধরিয়া বসিল, বিয়ে কর্ আখনা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আখনা বলিল, না।

আরে, সে মুসলমান হয়েছে রে।

আমিও মুসলমান হব।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

আখনা মজুর খাটে, পাড়ায় মহাজনী করে, সন্ধ্যায় সেই পুরাতন ঢোলটি লইয়া বাজায় আর গান করে—

পীরিতি হ'ল শূল, সখি, পীরিতি হ'ল শূল।

সহসা একদিন পাড়ারই একজন আসিয়া বলিল, ওরে, পরীকে দেখলাম কাটোয়াতে।

আখনার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। বহুপ্রত্যাশিত সংবাদে হৃদয় আকস্মিক চাঞ্চল্যের উদ্বেগে আলোড়িত হইয়া উঠে। বহুকষ্টে আত্মগোপন করিয়া আখনা

নিস্পৃহতার ভান করিয়া বলিল, কাটোয়াতে ?

হ্যাঁ, আমি গেইছিলাম কিনা বাবুদের পোনামাছ আনতে, আঃ, কি বাহারের পোনা এবার হইছে মাইরি বেবাক ঝাড়া কাতলা ; রাইখরা কি বোলমাছ একেবারে নাই। আর এইবার পোনাও কি হইছে !

লাখে লাখে ঝাঁকি বাঁধিয়া রাজ্যের মাছ আসিয়া পরীকে যেন খাইয়া ফেলিল। আখনা মুহুর্মুহুঃ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। শেষ পর্যন্ত সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, লাখে লাখে তো তোর বাবার কি ? ব্যাড়-ব্যাড় ক'রে বকিস না বাপু।

লোকটা অবাক হইয়া গেল। সে অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়াই যাইতেছিল, কিন্তু আখনাই তাহাকে ফিরাইল, ব'স্ ব'স্, রাগ করে না। তামুকটা খেয়ে যা তাই রে বাপু।

তামাক সাজিতে সাজিতে সে বলিল, পরী কাটোয়াতে রয়েছে নাকি ?

হ্যাঁ, গঙ্গার ধারে ঘাটের কাছে বসে রইছে দেখলাম, এই কাঠির মত চেহারা, ভাল দেখতে পায় না।

আখনা বলিয়া উঠিল, মরুকগে। বলিয়া সেই ঢোলটা পাড়িয়া আপন মনেই বাজাইতে বসিল। কিন্তু সেই দিনই দুপহরের ট্রেনে আখনা একখানা কাটোয়ার টিকিট করিয়া রওনা হইল।

এবার পরী কত ভাল কাপড়, কত বিলাস করিতে পারে, সে দেখিবে। কল্পনায় সে নানান রঙের শাড়ি পরাইয়া যেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল।

কাটোয়ায় আসিয়া সে এক এক করিয়া ঘাটগুলি খুঁজিতে আরম্ভ করিল। দশটা টাকা সে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে, কাটোয়ার বাজারেই পরার পছন্দ মতন কাপড় কিনিবে। তিনটা ঘাট পাতিপাতি করিয়া খুঁজিল, কিন্তু পরীকে পাইল না। সে গৌরাঙ্গঘাটের দিকে চলিল।

ওই গৌরাঙ্গঘাটেই পরী বসিয়া ছিল। রোগজীর্ণ শীর্ণ দেহ। দুরন্ত ব্যাধি সে যৌবন ও লাবণ্য জলোকার মত প্রায় নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইয়াছে। মাথায় সে মন-মাতানো কোঁকড়া চুল আর নাই, রুগ্ন পিঙ্গল অল্প কয়েকটি চুল কানের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়া তাহার কুরূপকে আরও বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে। জীর্ণ একখানা কাপড় পরিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে রাস্তার দিকে চাহিয়া পরী হাত পাতিয়া বসিয়া ছিল।

আখনা চমকিয়া উঠিল।

এই তার পরী ! সেই পরী !

প্র তী ক্ষা

মানসচক্ষে যৌবনোচ্ছল বিলাসিনী পরী ডুরে কাপড় পরিয়া হাসিতেছিল। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া আখনা স্বীকার করিতে পারিল না — এই তার পরী ?

একটা পয়সা দাও মশায় ! - পদশব্দ শুনিয়া পরী ভিক্ষা চাহিল।

আখনা একটি টাকা বাহির করিল ; কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া সে আবার টাকাটাকে সযত্নে খুঁটে বাঁধিল। তারপর খুচরা পয়সার খুঁট খুলিয়া মাত্র একটি পয়সাই দৃষ্টিহীন পরীর হাতে দিয়া স্টেশনের পথ ধরিল।

মধু মাস্টার

সেদিন রবিবার। দেবীপুরের গোকুলের দোকানে হাটযাত্রীদের ভিড় জমিয়াছে। দরিদ্র দিনমজুরেরা হাট করিবার জন্য চাউল বেচে—গোকুল কেনে। দোকানের বারান্দায় তক্তাপোশের উপর মাধব ভট্টাচায একজন চাউল-খরিদ্দার মহাজনের দালালের সহিত দাবা খেলিতেছিল।

এমন সময়, ওরে গোকুল, একবার তামাক খাইয়ে দে তো বাবা - বলিয়া দীর্ঘ পরিপুষ্টদেহ এক প্রৌঢ় আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন। ভদ্রলোকের একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ! মাথার চুলগুলি ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, সেগুলি কিন্তু একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যস্থলে পরিপুষ্ট একটি টিকি।

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র গোকুল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কে, মাস্টারমশাই ?

সঙ্গে সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সে তামাক সাজিতে বসিল।

মাধব ভট্টাচায বলিলেন, কে গো, মধু মাস্টার ? এস তো, এস তো ভাই। এই দেখ, ইনি একজন পাকা খেলোয়াড় এসেছেন, এস তো ভাই এক বাজি। আমি তো পাঁচ বাজির এক বাজিও পেলাম না।

অতি ব্যস্তভাবে মধু মাস্টার প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, না না না, ও হবে না ভাই, হাটে যেতে হবে আজ। ছোট ছেলেটার জ্বর হয়েছে, হাট পড়েছে আমার ঘাড়ে। ও বড় পাজা নেশা।

গোকুল তামাক সাজিয়া আনিল। হুকা-কলিকা সসম্ভ্রমে তাঁহার হাতে দিয়া কহিল, অরুণ ভাল আছে মাস্টারমশাই ?

অরুণ মাস্টারের বড় ছেলে।

মাস্টারমশাই কহিলেন, হ্যাঁ রে, সে ভাল আছে, সেদিন এসেছিল যে।

গোকুল আবার কহিল, অরুণ এবার বি. এ.-তেও স্কলারশিপ পেয়েছে, নয় মাস্টারমশাই ?

হ্যাঁ রে, বি. এ.-তেও সে ফার্স্ট হয়েছে। তোর সঙ্গে অরুণের বড় ভাব ছিল, নয় রে ? তারপর, তোর ব্যবসা কেমন চলছে ? হাঁ হাঁ হাঁ, মাধব, তোমার ঘোড়া গেল ঘোড়া গেল। চাপা থেকে উঠে ব'স, বাঁয়ে—বাঁয়ে উঠে ব'স। আচ্ছা, হয়েছে। তারপর গোকুল, তোর মণকষা মনে আছে তো রে, সেই কানমলা ?

গোকুল হাসিতে লাগিল।

তিনি বলিলেন, যা যা, নিজের কাজ কর্ গিয়ে। হাটের দিন, ব্যবসার ক্ষতি করিস নি বাবা। মাধব, আবার এ কি করেছ? এ যে মন্ত্রী গেল তোমার। এক চাল, দু চাল, তিন, চার, পাঁচ চালে মাত হয়ে গেলে তুমি। সর দেখি, সর দেখি, দেখি একবার, দেখি দেখি দেখি-এ এ-এ এ-ই।—বলিয়া একটি চাল তিনি চালিয়া দিলেন। মাধবকে চেষ্টা করিয়া সরিয়া যাইতে হইল না, মাস্টারের বিপুল শরীরের ধাক্কায় সে আপনি কোণে সরিয়া গিয়াছিল।

মধু মাস্টার দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে চাল ভাবিতেছিলেন। তাঁহার খেলা—দেখিবার বস্তু। আশেপাশে ক্রমশ লোক জমিতে লাগিল। গোকুল ওদিকে কেনা-বেচা করিতেছিল [illegible] সের এক পো হল গো তোমার। দাম হল তোমার পাঁচ দেড়ে সাড়ে সাত আনা আর এক পোর দাম দেড় পয়সা সাত আনা সাড়ে তিন পয়সা। আচ্ছা, আট আনাই দিলাম তোমাকে আজ, এই হাটে কেটে দিও আধলাটা।

ওদিকে মাস্টার বল চালিতে চালিতে কহিতেছিল, চিঁ-হি-হি, আমার সেপাই আপনার ঘোড়ার ডান পায়ে কোপ বসালে। আর দু কোপ বাকি।

মাস্টার খেলার গতি ফিরাইয়া ফেলিয়াছেন। খেলোয়াড় ভদ্রলোক একটা চাল দিয়া বলিলেন, ফসকে গেছে কোপ।

মাস্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, পা গিয়েছে ওর। রক্তের তেজে এখনও বুঝতে পারে নি।

তারপর আর একটি চাল দিয়া কহিলেন, এই-ই বাম পদ গেলেন।—বাঁ পাটি লটর-পটর ডান পাটি খোঁড়া, বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া।

ভদ্রলোকটি বিপদ বুঝিয়াছিলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর নীরবে একটি চাল তিনি চালিলেন। মাস্টারের হাত উদ্যত হইয়াই ছিল, কোণের গজ তুলিয়া সশব্দে ঘোড়াটাকে বধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, শুঁড়ে ধরে আমার হাতীর পায়ে আপনার ঘোড়ার পেট ফেটে গেল ফট।

তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, গোকুল, তামাক একবার। আবার ছকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। অতঃপর নিঃশব্দেই কিছুক্ষণ খেলা চলিতেছিল। গোকুল তামাক আনিয়া হাতে ধরাইয়া দিয়া কহিল, মাস্টারমশাই!

হুঁ।

বেলা অনেক হয়ে গেল। হাট -

মাস্টার কহিলেন, গুড়ুম। ছাড়লাম টর্পেডো, সামলান নৌকো।

গোকুল ডাকিল, মাস্টারমশাই!

দেখ গোক্‌লো, গোল কর্‌বি তো মার খাবি। খালি গোলমাল, খালি গোলমাল! গেল গেল নৌকো, চলেছে টর্পেডো -সোঁ-সোঁ।

গোকুল আর কথা বলিতে সাহস পাইল না।

মাস্টার কহিলেন, ভর-ভর-ভর-ভর-ভু-স্।

বিপক্ষের নৌকা তিনি বধ করিয়াছেন।

আবার খেলা চলে। বেলা অনেক হইয়াছে, দর্শকদের অনেকে চলিয়া গেল, আবার নূতন অনেকে আসিল।

হুঁকা টানিতে টানিতে মাস্টার বলিলেন, ছাড়লাম ব্রহ্মবাণ।—ব্রহ্মতেজে সৃষ্টি তার নাম ব্রহ্মবাণ, অমর হ'লেও তার নাহি পরিত্রাণ।

ভদ্রলোক বলিলেন, আমিও ছাড়লাম অগ্নিবাণ।

হা-হা করিয়া হাসিয়া মাস্টার জবাব দিলেন আমার বরুণবাণে অগ্নি নিবে যায়, এইবার মন্ত্রী যাবে কবহ উপায়।

মন্ত্রী সত্য সত্যই গেল।

ভদ্রলোক ছকের উপর বলগুলা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, মাত হয়েছি আমি। কিন্তু আর এক বাজি।

যুদ্ধং দেহি? আচ্ছা, প্রস্তুত আমি।

আবার খেলা বসিল।

খেলা যখন ভাঙিল, তখন অপরাহ্ণ-বেলা। মাস্টার জয়োল্লাসে উঠিয়া কহিলেন, চল এইবার হাট।

কিন্তু বেলার দিকে চাহিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, এ কি! এ যে সন্ধ্যে হয়ে এল! হাট!

গোকুল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হাট আমি পাঠিয়ে দিয়েছি মাস্টারমশাই।

দিয়েছিস? বাঁচলাম আমি। ওঃ, ভারি পাজী নেশা! মাধবকে তাই তো বলি, ছাড়্, ও নেশা ছাড়্। তা কাকে বলছ! দে তো বাবা, একটু তেল দে তো, একেবারে স্নানটা সেরেই যাই।

গোকুল হাতজোড় করিয়া বলিল, বামুন দিয়ে রান্নাও আমি করিয়ে রেখেছি মাস্টারমশাই, বাড়িতেও খবর দিয়েছি।

বেশ করেছিস। এসব বুদ্ধি তোর আছে, খালি ইংরেজী গ্রামারেই তোর যত গোল।

মধু মাস্টারের পুরা নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। মাস্টার সে আমলের এফ.

এ. পাস। দারিদ্র্য-হেতু বি. এ. পড়া তাঁহার হয় নাই। পাশের গ্রামের রায়বাবুদের এম. এল. হাই ইংলিশ স্কুলে আজ ত্রিশ বৎসর থার্ডমাস্টারি করিতেছেন। এ অঞ্চলের চল্লিশের নিম্নবয়সী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার ছাত্র। রায়বাড়ির কর্তা জ্ঞানদাবাবু মধু মাস্টারকে বড় ভালবাসেন। তাঁহার বড় ছেলেকে তিনি প্রাইভেট পড়াইয়াছেন, আবার ছোট ছেলে সৌরীন্দ্রকে এখনও পড়ান।

সেদিন গোকুলের দোকান হইতেই মধু মাস্টার রায়বাড়িতে সন্ধ্যার সময় গিয়া উঠিলেন। এই নিয়মিত কর্মটিতে কেহ কখনও তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখে নাই। জলঝড়, শত দুর্যোগের মধ্যে সাদা-তালি-দেওয়া বিবর্ণ ছাতাটি দীর্ঘ মানুষটির মাথার উপর বহুদূর হইতে দেখা যাইত।

ছাত্র সৌরীন্দ্র ছেলেমানুষ, সবে ইংরেজী ধরিয়াছে। মাস্টার মহাশয় উপস্থিত হইতেই সৌরীন্দ্র কহিল, আজ দুপুরবেলা পড়া ক'রে রেখেছি মাস্টারমশাই।

ছাতাটা কোণে রাখিয়াই মাস্টার গর্জন করিয়া উঠিলেন, সিট ডাউন, ইউ নটি বয়।

এত বড় মানুষটির রোষ-আস্ফালনের গর্জনে সৌরীন্দ্রের হইয়া গেল। সে বই খুলিয়া বলিল, আই মেট এ লেম ম্যান, মানে আমি দেখিয়াছিলাম একটি খোঁড়া মনুষ্য।

মাস্টার বলিলেন, ইয়েস। আই মানে আমি, মেট মানে দেখিয়াছিলাম, এ মানে একটি, লেম মানে খোঁড়া, ম্যান মানে মনুষ্য।

সৌরীন্দ্রের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। মাস্টার তাহা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পাথরের মত তিনি বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে সৌরীন্দ্রের মন পাঠে নিবিষ্ট হইয়া আসিতেছিল। মাস্টার বলিলেন, বই বন্ধ কর। এদিকে এস।

ভয়ে ভয়ে সৌরীন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিল।

তাহার হাতে ঝাঁকি দিয়া তিনি কহিলেন, দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিস। খুব ক'রে ভাত ডাল খাবি, বুঝলি?—হাম-হাম ক'রে। দু বেলা ওঠ্-বোস্ করবি, বুঝলি?

সৌরীন্দ্র ঘাড় নাড়িল, সে বুঝিয়াছে।

তারপর পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

আচ্ছা, বল দেখি, আমি যাই ইংরিজী কি হবে?

আই গো।

গুড। আচ্ছা, সে যায়?

হি গোজ।

ভেরি গুড। রাম যায়?

রাম গোজ।

ভেরি ভেরি ভেরি গুড। আচ্ছা, অঙ্ক হয়েছে?

হ্যাঁ সার্, সব ক'ষে রেখেছি।

আচ্ছা, একটা মণকষা ক'ষে ফেল দেখি এক মণ মিষ্টির দাম, কি মিষ্টি খেতে ভালবাস তুমি? রসগোল্লা? পান্তুয়া? আচ্ছা এক মণ পান্তুয়ার দাম পাঁচ টাকা পনেরো আনা পাঁচ পাই হলে তিন মণ ন সের ছ ছটাকের দাম কত?

সৌরীন্দ্র কহিল, ততক্ষণ আপনি বইখানায় মলাট লাগিয়ে দিন না সার্। বই ও একখানা খবরের কাগজ সে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। মাস্টার কাগজখানা লইয়া ভাঁজিতে গিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। সৌরীন্দ্রের অঙ্ক শেষ হইয়া গেল, সে ডাকিল, সার্!

মাস্টার নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

সৌরীন আবার ডাকিল, হয়ে গেছে মাস্টারমশাই।

টেবিলের উপরে প্রচণ্ড একটা কিল মারিয়া বিপুল গর্জনে মাস্টার বলিয়া উঠিলেন, অ্যাব্‌সার্ড, এ ভাইল অ্যাণ্ড ম্যালিসাস প্রোপাগাণ্ডা এগেন্‌স্ট আস –

সৌরীন্দ্র অর্থ না বুঝিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। মাস্টারের এরূপ ধরনের অস্বাভাবিক গর্জনে কাছারি-ঘরে রায়কর্তা জ্ঞানদাবাবুর আফিঙের নিদ্রাও ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনি ডাকিয়া কহিলেন, কি হ'ল, কি হ'ল মাস্টারমশাই?

আবার টেবিলের উপর কিল মারিয়া মাস্টার কহিলেন, এ আমি কক্ষনও ছাড়ব না। আমি এর বিরুদ্ধে লিখব—প্রমাণ করব, আই শ্যাল প্রুভ ইট।

জ্ঞানদাবাবু এবার উঠিয়া আসিলেন, কহিলেন, কি, হ'ল কি মাস্টারমশাই? আপনি এত

এত? বলেন কি আপনি? পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্ব'লে যাচ্ছে। মাথায় আমাদের জুতো মারছে। বলে কি, ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশন, মানে—আমাদের সভ্যতার ইতিহাস সমস্ত মিথ্যে। রামায়ণ, মহাভারত মিথ্যে। মিশরের সভ্যতা নাকি সবার আগে, তারই খানিকটা ভারতীয়েরা নকল করেছিল মাত্র। নইলে তারা ছিল বর্বর অসভ্য। এই নিয়ে বিলেতে একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা হয়েছে মশাই। আর সেই সব বই ওদের দেশে প্রচার হচ্ছে। খবরের কাগজে কাগজে তার প্রশংসা। এই দেখুন, একখানা বিলিতী কাগজে তার সমালোচনা,- সমালোচনা, না মাথা। সেই নিয়ে ঢাক বাজাচ্ছে।

আমি লিখব, এর বিরুদ্ধে আমি লিখব জ্ঞানদাবাবু।

জ্ঞানদাবাবু বলিলেন, বেশ তো, লিখুন না আপনি। লিখে আমাদের দেশের কাগজে পাঠিয়ে দিন।

মাস্টার তখনও বলিতেছিলেন, ওদের র‍্যামেসিস ব'লে যে রাজা ছিল, তারই নাম কীর্তি চুরি ক'রে আমরা রামরাজার নাকি বড়াই করি! বেটাদের নীল-ডাউন করিয়ে দিতে হয় পৃথিবীর সামনে। কিন্তু খবরের কাগজে লিখে কি হবে মশাই? ওই বইখানার প্রতিবাদ ক'রে বই লেখা দরকার, আর সেই বই ওদের দেশেই প্রচার করা দরকার।

জ্ঞানদাবাবু ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, লিখুন আপনি মাস্টারমশাই, আমি আপনাকে সাহায্য করব। বিদ্যে আমার নেই, কিন্তু অর্থ দিয়ে সাহায্য করব—যা খরচ হবে এতে, সমস্ত আমার।

মাস্টার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, ভাবপ্রকাশের ভাষা তিনি পাইতেছিলেন না। কয় ফোঁটা জল তাহার চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়িল। অবশেষে কহিলেন, আমাদের ভারতবর্ষ আর্যভূমি, আপনার মঙ্গল হবে জ্ঞানদাবাবু।

সৌরীন্দ্র নিজেই চুপ করিয়াছিল, এ রোষ যে তাহার উপরে নয়, তাহা বুঝিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এতক্ষণে সে সুযোগ বুঝিয়া কহিল, সার্, আমার ছুটি?

মাস্টার তখনও চিন্তা করিতেছিলেন।

জ্ঞানদাবাবু ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, মাস্টারমশাই, সৌরীন আপনার ছুটি চাইছে।

গম্ভীরভাবে মাস্টার জ্ঞানদাকেই বলিলেন, যাও। না, দাঁড়াও, অঙ্কটা দেখি তোমার।

অঙ্কটা ঠিক হইয়াছিল। স্লেটখানি সৌরীনের হাতে দিয়া এতক্ষণে সৌরীনের দিকে চাহিয়া সস্নেহে বলিলেন, ইউ আর এ গুড বয়। আজ পড়া তোমার ঠিক হয়েছে।

মাস্টার উঠিলেন, বলিলেন, কাল তা হ'লে বইখানা আনতে দেব, কি বলেন? একবার হেডমাস্টারের ওখানে যেতে হবে। তাঁকেও সঙ্গে নিতে হবে।

হেডমাস্টার শিববাবু মধু মাস্টারের সমবয়সী লোক। তিনি শিবের মত সরল এই আত্মভোলা মানুষটিকে বড় ভালবাসিতেন। লোকটির জ্ঞান ও সামর্থ্যের উপর বিশ্বাসও ছিল তাঁহার অগাধ। শিববাবু নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কিন্তু কোন প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিলে

মধু মাস্টারকে না দেখাইয়া কখনও তিনি শেষ করিতেন না। মধু মাস্টার অম্লান বদনে তাঁহার লেখার উপরেও দুই এক স্থানে কলম চালাইয়া বলিতেন, এখানটা এই ক'রে দিলাম।

শিববাবুও তাহাই মানিয়া লইতেন।

সেই রাত্রেই মাস্টার শিববাবুর দরজায় আসিয়া হানা দিলেন।

শিববাবু অতি মিতাচারী ব্যক্তি। নিয়মের লঙ্ঘন তিনি করেন না। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খাইয়া শুইয়া পড়া তাঁহার নিয়ম।

মাস্টারের হাঁকডাকে দরজা খুলিয়া দিয়া ভৃত্য কহিল, বাবু খেয়ে শুয়েছেন।

মাস্টার বলিলেন, ডাক তাঁকে। জরুরী কাজ আছে। ভেরি ইম্পর্ট্যাণ্ট, মোস্ট ইম্পর্ট্যাণ্ট, বুঝলে?

মধু মাস্টারের কণ্ঠস্বর ইট কাঠের বাধা মানে না, শিববাবুর কানে গিয়া আপনি পৌঁছিয়াছিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া নামিয়া আসিলেন।

কি? কি হয়েছে মাস্টারমশাই?

এই প'ড়ে দেখুন।

কাগজখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

পড়া শেষ হইলে শিববাবু কিছু বলিবার পূর্বেই মাস্টার বলিয়া উঠিলেন, এর বিরুদ্ধে লিখতে হবে। ও-বই যে মিথ্যে, তা প্রমাণ ক'রে দিতে হবে।

শিববাবু বলিলেন, এই জন্যেই ডাকছিলেন?

এই জন্যেই? হোয়াট ডু ইউ মীন? এটা কি এত তুচ্ছ জিনিস?

না না না। কিন্তু এ তো কাল সকালে—

মাস্টার বলিয়া উঠিলেন, নাঃ, আপনাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন। বই লিখতে হবে। কাল ও-বইখানা আনতে দিচ্ছি। জ্ঞানদাবাবু সমস্ত খরচ দেবেন। আচ্ছা, চলি আমি—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

বাড়ির দরজায় আসিয়া মাস্টার মৃদুস্বরে ডাকিলেন, চিনু-চিনু, চিনু-মা।

চিনু চিন্ময়ী, মাস্টারের কন্যা, বিধবা।

দরজা খুলিয়া গেল। বেশ বোঝা গেল, প্রতীক্ষমাণা কেহ এই আহ্বানটির প্রতীক্ষাতেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন। দ্বার-মুক্তকারিণী চিন্ময়ী নয় চিন্ময়ীর জননী। তাঁহাকে দেখিয়া মাস্টার কহিলেন, আজ—বুঝেছ কিনা আমাদের অরুণের বন্ধু, আমার ছাত্র বুঝেছ কিনা মানে—আমাদের দেবীপুরের গোকুল বুঝেছ।

গৃহিণী গম্ভীরভাবে কহিলেন, খুব বুঝেছি আমি।

মাস্টার তাড়াতাড়ি বলিলেন, না না, মানে ছাত্র সে. এবলে যখন—বুঝলে কিনা—

জলের ঘটি ও গামছা নামাইয়া দিয়া স্ত্রী কহিলেন, বললাম তো, সবই বুঝেছি।

হাত মুখ ধুইতে ধুইতে মাস্টার কহিলেন, ওই তো সব তাতেই তোমার রাগ। বুঝবে না কিছু—

খুব বুঝেছি।

কি বুঝেছ শুনি?

বুঝেছি, সবই আমার অদৃষ্ট।

মাস্টার পরাজয় মানিয়া লইলেন। বলিলেন, আচ্ছা বাপু, আচ্ছা, তাই হ'ল। এখন ভাত দাও দেখি।

ভাতের থালা নামাইয়া দিয়া গৃহিণী বলিলেন, কেন, দাবা খেলে পেট ভরে না?

মাস্টার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। লোকে পাগলই বলুক আর যাই বলুক রাগ অনুরাগ বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

বিপুল উদ্যমে বই লেখা চলিয়াছে। সে বইখানা আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও তিন চারি শত টাকার বই কেনা হইয়াছে। ভারতের সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে এই বইগুলির সাহায্য প্রয়োজন। মাস্টার রাত্রি জাগিয়া সেই সমস্ত বই পড়েন। শিববাবুর সহিত আলোচনা হয়। মধ্যে মধ্যে জ্ঞানদাবাবুকে অনুবাদ করিয়া শোনানো হয়।

কিন্তু এই পরিশ্রমে মধু মাস্টারের পাথরের মত দেহ ভাঙিয়া পড়িল। সর্বদাই যেন তিনি চিন্তাকুল। দাবা খেলা পর্যন্ত ছাড়িয়াছেন।

দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অরুণকে পত্র লিখিলেন। অরুণ কৃতী ছেলে এম. এ. পড়ে। কোনও পরীক্ষায় সে দ্বিতীয় হয় নাই। অরুণ আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কহিল, বাবার ইচ্ছেয় বাধা দিও না মা। উনি যে কত বড় তা তোমরা বুঝবে না।

মা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, বুঝব না, না?

অরুণ লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে কহিল, আমি বরং স্কলারশিপের টাকা থেকে কিছু ক'রে পাঠিয়ে দেব। বাবার জন্যে ভাল খাবার-টাবারের ব্যবস্থা ক'রো।

কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। অকস্মাৎ জ্ঞানদাবাবু মারা গেলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ মালিক হইয়া বসিল। সুরেন্দ্র বার-তিনেক ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া শিক্ষকদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। তাহার উপর সে নবযুগের মানুষ। শিববাবু মানে মানে বয়সের অজুহাত দেখাইয়া সরিয়া পড়িলেন। মধু মাস্টারকেও কহিলেন, মাস্টারমশাই, আর কেন?

হা-হা করিয়া মাস্টার বলিলেন, আপনার সব তাতেই বাড়াবাড়ি শিববাবু। আরে, আমাদের সেই সুরেন তো! তিন চড়ে সোজা ক'রে দেব।

শিববাবু শুধু হাসিলেন, আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিলেন না - এটুকু তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। তিনি কাশী চলিয়া গেলেন।

শিববাবুর স্থলে একজন নূতন এম. এ., বি. টি. আসিলেন। সবই যেমন চলিতেছিল, চলিতে লাগিল। সেদিন আরও কতকগুলি পুস্তকের তালিকা লইয়া মধু মাস্টার রায়বাড়িতে গিয়া হাজির হইলেন।

বলিতে ভুলিয়াছি ইতিমধ্যে সৌরীন্দ্রের গৃহশিক্ষকের পদটি তাঁহার গিয়াছে। নূতন হেডমাস্টার মহাশয় নিজে সৌরীনের ভার লইয়াছেন। তাহাতে মধু মাস্টারের কোন আক্ষেপ ছিল না, বরং তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। বইখানা দ্রুততর গতিতে লেখা হইতেছে। বৈঠকখানার চিরমুক্ত দুয়ার আবৃত করিয়া পর্দা ঝুলিতেছিল। দরজার মাথার উপরে লেখা রহিয়াছে - 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ'। মাস্টার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, বরাবর পর্দা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্র সিগারেট মুখে তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া শুইয়া ছিল। মধু মাস্টারকে দেখিবামাত্র সিগারেটটা মুখ হইতে খসিয়া তাহার বুকের উপর পড়িয়া গেল। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক মধু মাস্টার, সুরেন্দ্রের বুক হইতে তাড়াতাড়ি সেটাকে লইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এই রাবিশগুলো খাও কি জন্যে বাপু, বাপ-ঠাকুরদার আমলের সোনা-রুপোর ফরসি-গড়গড়া থাকতে? হুঁ! অম্বুরী তামাক খাবে এক মাইল তার গন্ধ যাবে। তা না -

সুরেন্দ্র এতক্ষণে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, কোনও দরকার আছে কি?

হ্যাঁ, দরকার ব'লে দরকার। জরুরী দরকার। সব কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এই বইগুলো চাই।

তিনি ফর্দটা সুরেন্দ্রের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

ফর্দটায় চোখ বুলাইয়া সুরেন্দ্র কহিল, কি হবে এত সব বই? আর হেড-

মাস্টারের সই-ই বা কোথায় ?

মাস্টার বিরক্তিভরে কহিলেন, আঃ, তোমার বুদ্ধি কি চিরকাল একভাবে থাকবে বাপু ? অ্যাল্‌জ্যাব্রা-জিওমেট্রি তো কোন কালে মাথায় ঢোকে নি তোমার, এখনও কি তাই আছে ? এ বইগুলো লাগবে আমি যে বইখানা লিখছি, তার জন্যে।

আপনি বই লিখবেন, তার জন্যে বই আমায় কিনে দিতে হবে, তার মানে ?

মাস্টার সচকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, মানে, জ্ঞানদাবাবুর অনুমতি-ক্রমেই বইখানা আমি লিখতে আরম্ভ করি। তিনি সমস্ত খরচ দেবেন বলেছিলেন এবং এর জন্যে অনেক টাকা খরচও হয়ে গেছে। প্রায় তিন-চার শো টাকার বই কেনা হয়েছে।

কি বই এখানা ?

সে বিশেষ বুঝবে না তুমি বাপু। তবু শোন, বিলেতে একখানা বই লেখা হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার অর্বাচীনত্ব প্রতিপন্ন ক'রে এবং তার আদিমত্ব নাকচ ক'রে। এখানা তারই প্রতিবাদ।

সুরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, দেখুন, বাবাকে ভালমানুষ বোকা পেয়ে অনেকে অনেক রকম ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু তা আর হবে না। এসব ধাপ্পাবাজি আমি অনেক বুঝি। বিলেতের ইংরেজের বইয়ের প্রতিবাদ লিখবেন শাঁখপুরের মধু মুখুজ্জে ! আপনার লিখতে শখ থাকে, নিজে খরচ ক'রে লিখুন গিয়ে।

মধু মাস্টার উঠিয়া পড়িলেন। শুধু বলিলেন, দেখ সুরেন্দ্র আমাকে তুমি যা বললে, তা বললে, কিন্তু স্বর্গীয় কর্তাকে বোকা বলা তোমার উচিত হয় নি। -তাই বা কেন ! তোমারই উপযুক্ত হয়েছে।

তিনি পর্দা ঠেলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ভিতর হইতে সুরেন্দ্র কহিল, যে বইগুলো আপনার কাছে আছে—

কথা শেষ মাস্টার নিজেই করিয়া দিলেন, বলিলেন, পাঠিয়ে দেব আজই।

সেই দিনই একটা লোকের মাথায় একগাদা বই ও একখানি পত্র লইয়া দেবাপুরের গোকুল আসিয়া সুরেন্দ্রবাবুকে প্রণাম জানাইল। পত্রখানি মধু মাস্টার লিখিয়াছেন—স্কুলের কার্যে পদত্যাগপত্র সেখানি।

•

দিন কয়েক পরে মধু মাস্টার স্ত্রীকে কহিলেন, দেখ, একবার কলকাতা যাচ্ছি আমি।

স্ত্রী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, সে কি ! এই শরীর তোমার —

বাধা দিয়া মাস্টার বলিলেন, তা হোক, কাজকর্ম একটা দেখব সেখানে। একজন ছাত্রও চিঠি লিখেছে। আর অরুণও সেখানে আছে। এই ধব, দিন দশেক বড় জোর। কোনও ভাবনা নেই। গোকুল মাস-কাবারের জিনিসপত্র সব দিয়ে যাবে।

স্ত্রী ব্যথিত স্বরে বলিলেন, আমাদের ভাবনাই আমরা শুধু ভাবি, নয়? পেটের ভাবনা ছাড়া—

অর্ধ পথেই মাস্টার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, যাঃ গেল! তুমি কিছু বোঝ না।

না, বুঝি না। সে তুমি বল, অরুণ বলে, আবাব, ওই ছোট খোকা সেও দশ দিন পরে তাই বলবে। বেশ, কি কি দেব, বল তো? তোমাব ও-কাগজেব বস্তা—

হাঁ-হাঁ করিয়া মাস্টাব বলিয়া উঠিলেন, না না না। ওতে তুমি হাত দিও না। ও আমি গুছিয়ে নেব।

কেন? মুখ্যু মানুষে হাত দিলে কি ওসব পঁচে যায় নাকি?

আঃ, কি বিপদ! কে বলছে তা? কিছু বোঝ না তুমি।

মাস্টার কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় ছোট ছেলে বরুণ আসিয়া কহিল, মা, বাবা সেই তুফসলা জমিখানা বিক্রি করেছেন হরিশ সাহাকে। আমি শুনে এলাম।

মা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই জমিটুকু খুব উৎকৃষ্ট জমি। আখ, কলাই, গম প্রভৃতি সকল ফসলই হইয়া থাকে। এটুকু মাস্টারেব বড় শখের সামগ্রী ছিল।

বহুক্ষণ পরে মা কহিলেন, বয়সে মতিচ্ছন্ন হয় মানুষের—কানে শুনেছিলাম, এইবার চোখে দেখলাম। ওই কাগজেই ওঁব মাথা গেলে। ওতেই আমাব সর্বনাশ হবে, সে আমি বেশ জানি।

বরুণ বলিয়া উঠিল, ছি, মা! যা বোঝ না তুমি, সে নিয়ে কিছু বলো না।

মা কিছু বলিলেন না। কিন্তু চোখ হইতে টপ টপ কবিয়া জল ঝবিয়া পড়িল।

কলিকাতায় আসিয়া মাস্টার উঠিলেন কালীঘাটে—এস. সি. সিন্‌হা ভকিল হাইকোর্ট তাঁহার বাড়িতে। সতীশ সিংহ তাঁহার ছাত্র। মোটঘাট নামাইয়াই মাস্টার বরাবর সতীশের ঘরে হাজির হইলেন। একঘর মক্কেল বসিয়া ছিল। সকলের সম্মুখেই তিনি কহিলেন, সতীশ, ভাল আছিস তো?

সবিস্ময়ে সতীশ কহিল, কে, মাস্টারমশাই? কখন এলেন?

এই আসছি বাবা। তোর এখানে উঠেছি এসে। কিছুদিন থাকব এখানে।

অ, তা বেশ তা বেশ। ওই দিকে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন।

মোট কথা, সতীশ সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহার ছিল পান-দোষ ও আনুষঙ্গিক দোষ। অভিভাবক – বিশেষ মধু মাস্টারের মত অভিভাবক লইয়া চলা তাহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর।

আহারের সময় মাস্টার বলিলেন, বাবা সতীশ, আমাকে কিছুদিন ভাত তোমাকে দিতে হবে। আমি তোমার ছেলেকে পড়াব।

কোর্টে যাইবার পোশাকে সতীশ সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিচর্যার তদারক করিতেছিল, সে বলিল, দেখুন, একটা কথা বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু না বললেও নয়। আপনার মত কঠোর শাসনের মধ্যে ছেলেকে রাখা আমার মত নয়। শিশুরা হার্টলেস—

একান্ত ব্যথিতভাবে মাস্টার বলিয়া উঠিলেন, হার্টলেস আমি হার্টলেস সতীশ?

সতীশ তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

মাস্টারও আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। অন্নব্যঞ্জন তখন সমস্ত শুক্ত হইয়া গিয়াছে।

হাত-মুখ ধুইয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, আমি চললাম সতীশ। অরুণের ওখানে যাচ্ছি।

অরুণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা মেসে নীচের তলায় একখানি ঘর ভাড়া লইয়া মাস্টার সেইখানে বাসা গাড়িলেন। খাওয়া দাওয়ার পর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যান। বৈকালে অরুণ আসে। তাহার সহিত আলোচনা হয়। বড় আনন্দে তাঁহার দিন কাটে। সন্ধ্যার পর একটা প্রাইভেট টুইশান জুটিয়াছে। পনেরো টাকা সেখানে পাওয়া যায়। সে টাকার দশ টাকা তিনি বাড়িতে পাঠান। অরুণ এটুকু জানে না। সে নিজে তাহার বৃত্তির টাকা হইতে দশ টাকা করিয়া বাড়িতে পাঠাইয়া থাকে।

সেদিন কিসের ছুটি ছিল। অরুণ দ্বিপ্রহরে আসিয়া দেখে, একরাশ রঙিন কাগজ ও কতকগুলি তার লইয়া বাবা কি করিতেছেন, সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল, এগুলো কি হবে?

অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জার সহিত মাস্টার কহিলেন, ফুল তৈরি করছিলাম। এগুলো বেশ বিক্রি হয়। আরও একদিন করেছিলাম, দু টাকা লাভ হয়েছিল।

অরুণের চক্ষে জল আসিল, সে কহিল, বাবা, আমি চাকরি নিই, আপনি কষ্ট করবেন না।

স্থির দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিয়া তিরস্কারের সুরে তিনি শুধু কহিলেন, অরুণ!

অরুণ মাথা নত করিয়া রহিল।

তিনি বলিলেন, আমার কল্পনা তুমি অরুণ, আপন খেয়ালে আপনাকে তুমি নষ্ট ক'রো না। তাতে হয়তো আমার দেহের কষ্ট দূর হতে পারে কিন্তু মনের কষ্টে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর ঈষৎ হাসিয়া আবার তিনি কহিলেন, সাধনা সামান্য বস্তু নয় অরুণ। কৃচ্ছ্র সাধন ভিন্ন সাধনা হয় না বাবা। আমার দিকে তাকিও না, এ আমার সাধনা।

দিন কাটিতেছিল। মাস দুই কাটিয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যায় আসিয়া অরুণ দেখিল, পিতা শুইয়া আছেন। অরুণকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, বাবা অরুণ, আমায় দেশে নিয়ে চল বাবা। সামান্য কাজ বাকি আছে দিনও বোধ হয় অল্প বাকি। তোমার মায়ের কাছে যেতে চাই আমি।

বাড়িতে আসিয়া তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন। যে কাজটুকু বাকি ছিল, সেটুকু ধীরে ধীরেই করিতেছিলেন। কিছুদিন পর সেদিন শরীর যেন সুস্থ—একান্ত গ্লানিহীন বলিয়া বোধ হইল। দিন দুই পরই আবার তিনি বিপুল পরিশ্রম আরম্ভ করিয়া দিলেন।

স্ত্রী আপত্তি করিয়া কাগজ-কলমের ঘরে চাবি দিয়া বলিলেন, আগে তুমি বিষ এনে দাও আমাকে।

মাস্টার কহিলেন, কি যে বল তুমি! তুমি কি চিরদিনই কিছুই বুঝবে না?

চাবিটা ফেলিয়া দিয়া স্ত্রী কহিলেন, এই নাও। কিন্তু একবার বল—সব বুঝেছি আমি।

দ্বিপ্রহর রাত্রে মাস্টার বিকৃত স্বরে ডাকিলেন, অরুণের মা!

তিনি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, মাস্টার বিছানার উপর পড়িয়া আছেন। নাক-মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে।

ডাক্তার আসিয়া বলিল, মাথার শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

ভোর-রাত্রে প্রলাপের মত মাস্টার বলিতেছিলেন, অরুণ, বই শেষ হয়েছে। ফোর্-ওয়ার্ডটা বাকি থাকল—দেখিস, তুই দেখিস।

কাহিনীর এইখানেই শেষ; কিন্তু আরও একটু আছে। সেটুকু না বলিলে শেষ হইবে, কিন্তু সম্পূর্ণ হইবে না।

অরুণ এম. এ.-তে ফার্স্ট হইয়া স্টেট্-স্কলারশিপ লইয়া বিলাত গিয়াছে।

বছর দুই পরে বরুণ একদিন ছুটিয়া আসিয়া মাকে কহিল, মা, বাবার ছবি আছে?

মা কহিলেন, কেন?

বাবার বই বেরিয়েছে মা। বিলেতের কাগজে কাগজে তাঁর প্রশংসা। দাদা লিখেছেন, বইয়ের দাম হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। সকলে ওখানে বাবার ছবি চায়, ছাপবে।

মা কহিলেন, কি লিখেছে তারা বরুণ?

সে তো সব ইংরেজী মা। এর পর বাংলা ক'রে শোনাব। কিন্তু বাবার ছবি?

অকস্মাৎ মা একটি আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে বলিয়া ফেলিলেন, আছে বাবা, সে তো দেবার নয়।

কেন?

প্রৌঢ় বয়সেও মায়ের মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বলিলেন, না বাবা ছবি তো নেই।

তারিণী মাঝি

তারিণী মাঝির অভ্যাস মাথা হেঁট করিয়া চলা। অস্বাভাবিক দীর্ঘ তারিণী ঘরের দরজায়, গাছে-ডালে, সাধারণ চালাঘরে বহুবার মাথায় বহু ঘা খাইয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু নদীতে যখন সে খেয়া দেয়, তখন সে খাড়া সোজা। তালগাছের ডোঙার উপর দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ লগির খোঁচা মারিয়া যাত্রী-বোঝাই ডোঙাটাকে ওপার হইতে এপারে লইয়া আসিয়া সে থামে।

আষাঢ় মাস। অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নানের ফেরত যাত্রীর ভিড়ে ময়ূরাক্ষীর গন্থুটিয়ার ঘাটে যেন হাট বসিয়া গিয়াছিল। পথশ্রমকাতর যাত্রীদলের সকলেই আগে পার হইয়া যাইতে চায়।

তারিণী তামাক খাইতে খাইতে হাঁক মারিয়া উঠিল, আর লয় গো ঠাকুরুণরা, আর লয়। গঙ্গাচান ক'রে পুণ্যির বোঝায় ভারী হয়ে আইছ সব।

একজন বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, আর একটি লোক বাবা, এই ছেলেটি। ওদিক হইতে একজন ডাকিয়া উঠিল, ওলো ও সাবি, উঠে আয় লো, উঠে আয়। দোশমনের হাড়ের দাঁত মেলে আর হাসতে হবে না।

সাবি ওরফে সাবিত্রী তরুণী, সে তাহাদের পাশের গ্রামের কয়টি তরুণীর সহিত রহস্যালাপের কৌতুকে হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে বলিল, তোরা যা, আসছে খেপে আমরা সব একসঙ্গে যাব।

তারিণী বলিয়া উঠিল, না বাপু, তুমি এই খেপেই চাপ। তোমরা সব এক সঙ্গে চাপলে ডোঙা ডুববেই। মুখরা সাবি বলিয়া উঠিল, ডোবে তো তোর ওই বুড়ীদের খেপেই ডুববে মাঝি। কেউ দশবার, কেউ বিশবার গঙ্গাচান করেছে ওরা। আমাদের সবই এই একবার।

তারিণী জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে মা একেবারেই যে আপনারা গাঙের ঢেউ মাথায় ক'রে আইছেন সব। যাত্রীর দল কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাঝি লগি হাতে ডোঙার মাথায় লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার সহকারী কালাচাঁদ পারের পয়সা সংগ্রহ করিতেছিল। সে হাঁকিয়া বলিল, পারের কড়ি ফাঁকি দাও নাই তো কেউ? দেখ, এখনও দেখ। বলিয়া সে ডোঙাখানা ঠেলিয়া দিয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িল। লগির খোঁচা মারিয়া তারিণী বলিল, হরি হরি বল সব—হরিবোল। যাত্রীর দল সমস্বরে হরিবোল দিয়া উঠিল—হরিবোল। দুই তীরের বনভূমিতে সে কলরোল প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল। নিম্নে খরস্রোতা ময়ূরাক্ষী নিম্নস্বরে ক্রূর হাস্য করিয়া বহিয়া

চলিয়াছিল। তারিণী এবার হাসিয়া বলিল, আমার নাম করলেও পার, আমিই তো পার করছি।

এক বৃদ্ধা বলিল, তা তো বটেই বাবা। তারিণী নইলে কে তরাবে বল?

একটা ঝাঁকি দিয়া লগিটা টানিয়া তুলিয়া তারিণী বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল, এই শালা কেলে, এঁটে ধর দাঁড়, হাঁ সেঙাত আমার ভাত খায় না গো। টান দেখিস না?

সত্য কথা, ময়ূরাক্ষীর এই খরস্রোতই বিশেষত্ব। বারো মাসের মধ্যে সাত-আট মাস ময়ূরাক্ষী মরুভূমি, এক মাইল দেড় মাইল প্রশস্ত বালুকারাশি ধূ-ধূ করে। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে সে রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্করী। দুই পার্শ্বে চার পাঁচ মাইল গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিপুল স্রোতে তখন সে ছুটিয়া চলে। আবার কখনও কখনও আসে 'হড়পা' বান, ছয়-সাত হাত উচ্চ জলস্রোত সম্মুখের বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার গ্রামের পর গ্রাম নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া সমস্ত দেশটাকে প্লাবিত করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু সে সচরাচর হয় না। বিশ বৎসর পূর্বে একবার হইয়াছিল।

মাথার উপর রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। একজন পুরুষ যাত্রী ছাতা খুলিয়া বসিল।

তারিণী বলিল, পাল খাটিও না ঠাকুর, পাল খাটিও না। তুমি উড়ে যাবা।

লোকটা ছাতা বন্ধ করিয়া দিল। সহসা নদীর উপরের দিকে একটা কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল—আর্ত কলরব।

ডোঙার যাত্রী সব সচকিত হইয়া পড়িল। তারিণী ধীরভাবে লগি চালাইয়া বলিল, এই, সব হুশ ক'রে। তোমাদের কিছু হয় নাই। ডোঙা ডুবেছে ওলকুড়োর ঘাটে। এই বুড়ীমা কাঁপছ কেনে? ধর ধর ঠাকুর, বুড়ীকে ধর। ভয় কি? এই দেখ, আমরা আর-ঘাটে এসে গেইছি।

নদীও আর শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

তারিণী বলিল, কেলে!

কি?

নদীবক্ষের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তারিণী বলিল, লগি ধর, দেখি।

কালাচাঁদ উঠিয়া পড়িল। তাহার হাতে লগি দিতে দিতে তারিণী বলিল, হুই দেখ—হুই—হুই ডুবল।—বলিতে বলিতেই সে খরস্রোতা নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ডোঙার উপরে কয়েকটি বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল, ও বাবা তারিণী, আমাদের কি হবে বাবা?

কালাচাঁদ উঠিল, এই, বুড়ীরা পেছু ডাকে দেখ দেখি। মরবি মরবি, তোরা মরবি।

পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতের মধ্যে শ্বেতবর্ণের কি একটা মধ্যে মধ্যে ডুবিতেছিল, আবার কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই তারিণী ক্ষিপ্রগতিতে স্রোতের মুখে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছিল। সে চলার মধ্যে যেন কত স্বচ্ছন্দ গতি! বস্তুটার নিকটে সে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেটা ডুবিল। সঙ্গে সঙ্গে তারিণীও ডুবিল। দেখিতে দেখিতে সে কিছুদূর গিয়া ভাসিয়া উঠিল। এক হাতে তার ঘন কালো রঙের কি রহিয়াছে। তারপর সে ঈষৎ বাঁকিয়া স্রোতের মুখেই সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলিল।

দুই তীরের জনতা আশঙ্কাবিমিশ্র ঔৎসুক্যের সহিত একাগ্রদৃষ্টিতে তারিণীকে লক্ষ্য করিতেছিল। এক তীরের জনতা দেখিতে দেখিতে উচ্চরোলে চিৎকার করিয়া উঠিল, হরিবোল।

অন্য তীরের জনতা চিৎকার করিয়া প্রশ্ন করিতেছিল, উঠেছে? উঠেছে?

কালাচাঁদ তখন ডোঙা লইয়া ছুটিয়াছে।

তারিণীর ভাগ্য ভাল। জলমগ্ন ব্যক্তিটি স্থানীয় বর্ধিষ্ণু ঘরেরই একটি বধূ। ওলকুড়ার ঘাটে ডোঙা ডুবে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনাবৃতা বধূটিই ডোঙার কিনারায় ভর দিয়া সরিয়া বসিতে গিয়া এই বিপদ ঘটাইয়া বসিয়াছিল। অবগুণ্ঠনের জন্যই হাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সে টলিয়া জলে পড়িয়া গিয়াছিল। মেয়েটি জল খানিকটা খাইয়াছিল, কিন্তু তেমন বেশি কিছু নয় - অল্প শুশ্রূষাতেই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

নিতান্ত কচি মেয়ে তেরো-চৌদ্দ বৎসরের বেশি বয়স নয়। দেখিতে বেশ সুশ্রী, দেহে অলঙ্কারও কয়খানা রহিয়াছে কানে মাকড়ি, নাকে টানা দেওয়া নথ, হাতে রুলি, গলায় হার। সে তখনও হাঁপাইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটির স্বামী ও শ্বশুর আসিয়া পৌঁছিলেন।

তারিণী প্রণাম করিয়া বলিল, পেনাম ঘোষ মশাই।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

তারিণী বলিল, আর লাজ কেড়ো না মা, দম লাও, দম লাও। সেই যে বলে - লাজে মা কুঁকুড়ি, বেপদের ধুকুড়ি।

ঘোষ মহাশয় বলিলেন, কি চাই তোর তারিণী বল?

তারিণী মাথা চুলকাইয়া সারা হইল, কি তাহার চাই, সে ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে বলিল, এক হাঁড়ি মদের দাম—আট আনা।

জনতার মধ্য হইতে সেই সাবি মেয়েটি বলিয়া উঠিল, আ মরণ তোমার! দামী কিছু চেয়ে নে রে বাপু।

তারিণীর যেন এতক্ষণে খেয়াল হইল, সে হেঁট মাথাতেই সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, ফাঁদি লত একখানা ঘোষ মশাই।

জনতার মধ্যে হইতে সাবিই আবার বলিয়া উঠিল, হাঁা বাবা তারিণী, বউমা বুঝি খুব নাক নেড়ে কথা কয়?

প্রফুল্লচিত্ত জনতার হাস্যধ্বনিতে খেয়াঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল।

বধূটি ঘোমটা খুলে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার গৌরবর্ণ কচি হাতখানি বাহির হইয়া আসিল—রাঙা করতলের উপর সোনার নথখানি রৌদ্রাভায় ঝকমক করিতেছে।

ঘোষ মহাশয় বলিলেন, দশহরার সময় পার্বণী রইল তোর, কাপড় আর চাদর, বুঝলি তারিণী? আর এই নে—পাঁচ টাকা।

তারিণী কৃতজ্ঞতায় নত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আজ্ঞে হুজুর, চাদরের বদলে যদি শাড়ি—

হাসিয়া ঘোষ মহাশয় বলিলেন, তাই হবে রে, তাই হবে।

সাবি বলিল, তোর বউকে একবার দেখতাম তারিণী।

তারিণী বলিল, নেহাৎ কালো কুচ্ছিত মা।

তারিণী সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরিল আকণ্ঠ মদ গিলিয়া। এখানে পা ফেলিতে পা পড়িতেছিল ওখানে। সে বিরক্ত হইয়া কালাচাঁদকে বলিল, রাস্তায় এত নেলা কে কাটলে রে কেলে? শুধুই নেলা - শুধুই অ্যাঁ - অ্যাই—একটো—

কালাচাঁদও নেশায় বিভোর, সে শুধু বলিল, হু।

তারিণী বলিল, জলাম্পয় - সব জলাম্পয় হয়ে যায়, সাঁতরে বাড়ি চ'লে যাই। শালা খাল নাই, নেলা নাই, সমান—স—ব সমান।

টলিতে টলিতেই সে শূন্যের বায়ুমণ্ডলে হাত ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া সাঁতারের অভিনয় করিতেছিল।

গ্রামের প্রান্তেই বাড়ি। বাড়ির দরজায় একটি আলো জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সুখী—তারিণীর স্ত্রী। তারিণী গান ধরিয়া দিল, লো—তুন হয়েছে দেশে ফাঁদি-লতের আমদানি—

সুখী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, খুব হয়েছে, এখন এস। ভাত কটা জুড়িয়ে

কড়কড়ে হিম হয়ে গেল।

হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কোমরের কাপড় খুঁজিতে খুঁজিতে তারিণী বলিল. আগে তোকে লত পরতে হবে। লত কই—কই, কোথা গেল শালার লত?

সুখী বলিল, কোন্ দিন ওই করতে গিয়ে আমার মাথা খাবে তুমি। এবার আমি গলায় দড়ি দোব কিন্তু।

তারিণী ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল. কেনে, কি করলাম আমি?

সুখী দৃষ্টিতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, এই পাথার বান, আর তুমি—

তারিণীর অট্টহাসিতে বর্ষার রাত্রির সজল অন্ধকার ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হাসি থামাইয়া সে সুখীর দিকে চাহিয়া বলিল, মায়ের বুকে ভয় থাকে? বল্, তু বল্, ব'লে যা বলছি। পেটের ভাত ওই ময়ূরাক্ষীর দৌলতে। জবাব দে কথার অ্যাই!

সুখী তাহার সহিত আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভাত বাড়িতে চলিয়া গেল।

তারিণী ডাকিল, সুখী আয় সুখী, অ্যাই!

সুখী কোনও উত্তর দিল না। তারিণী টলিতে টলিতে উঠিয়া ঘরের দিকে চলিল। পিছন হইতে ভাত বাড়িতে ব্যস্ত সুখীকে ধরিয়া বলিল চল্, এখুনি তোকে যেতে হবে।

সুখী বলিল, ছাড়, কাপড় ছাড়।

তারিণী বলিল, আলবত যেতে হবে। হাজার বার -তিন শো বার।

সুখী কাপড়টা টানিয়া বলিল, কাপড় ছাড় যাব, চল।

তারিণী খুশী হইয়া কাপড় ছাড়িয়া দিল। সুখী ভাতের থালাটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তারিণী বলিতেছিল, চল্, তোকে পিঠে নিয়ে ঝাঁপ দোব গন্নুটের ঘাটে. উঠব পাঁচথুপীর ঘাটে।

সুখী বলিল, তাই যাব, ভাত কটা খেয়ে লাও দিকিনি।

বাহির হইয়া আসিতে গিয়া দরজার চৌকাঠে কপালে আঘাত পাইয়া তারিণীর আস্ফালনটা একটু কমিয়া আসিল।

ভাত খাইতে খাইতে সে আবার আরম্ভ করিল, ভুলি নাই সেবার এক জোড়া গরু? পনের টাকা পাঁচ টাকা কম এক কুড়ি, শালা মদন গোপ ঠকিয়ে লিলে? তোর হাতের শাঁখা-বাঁধা কি ক'রে হ'ল? বল্, কে—তোর

কোন্ নানা দিলে ?

সুখী ঘরের মধ্যে আমানি ছাঁকিতেছিল, ঠাণ্ডা জিনিস নেশার পক্ষে ভাল। তারিণী বলিল, শালা মদন—লিলি ঠকিয়ে—লে। সুখীর শাঁখা-বাঁধা তো হয়েছে, বাস, আমাকে দিস আর না দিস। পড়ে শালা একদিন ময়ূরাক্ষীর বানে—শালাকে গোটা কতক চোবন দিয়ে তবে তুলি।

সম্মুখে আমানির বাটি ধরিয়া দিয়া সুখী তারিণীর কাপড়ের খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল, বাহির হইল নথখানি আর তিনটি টাকা।

সুখী প্রশ্ন করিল, আর দু টাকা কই ?

তারিণী বলিল, কেলে ওই কেলে, দিয়ে দিলাম কেলেকে—যা, লিয়ে যা।

সুখী এ কথায় কোনও বাদ-প্রতিবাদ করিল না, সে তাহার অভ্যাস নয়। তারিণী আবার বকিতে শুরু করিল, সেবার সেই তোর যখন অসুখ হ'ল, ডাক পার হয় না, পুলিস সাহেব ঘাটে ব'সে ভাপাইছে, হুঁ হুঁ বাবা—সেই বকশিশে তোর কানের ফুল। যা, তু যা, এখুনি ডাক লদার পার থেকে—এই উঠে আয় হারামজাদী লদা। উঠে আসবে। যা যা

সুখী বলিল, দাঁড়াও, আয়নাটো লিয়ে আসি, লতটো পরি। তারিণী খুশী হইয়া নীরব হইল। সুখী আয়না সম্মুখে রাখিয়া নথ পরিতে বসিল। সে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ভাত খাওয়া তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নথ পরা শেষ হইতেই সে উচ্ছিষ্ট হাতেই আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখ দেখি।

সুখীর মুখে পুলকের আবেশ ফুটিয়া উঠিল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুখী, মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল।

তারিণী সাবি-ঠাকরুণকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সুখী তন্বী, সুখী সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।

তারিণী মত্ত অবস্থাতে বলিলেও মিথ্যা বলে নাই। ওই ময়ূরাক্ষীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। দশহরার দিন ময়ূরাক্ষীর পূজাও সে করিয়া থাকে। এবার তেরো শত বিয়াল্লিশ সালে দশহরার দিন তারিণী নিয়মিত পূজা অর্চনা করিতেছিল। তাহার পরনে নূতন কাপড়, সুখীর পরনেও নূতন শাড়ি—ঘোষ মহাশয়ের দেওয়া পার্বণী। জলহীন ময়ূরাক্ষীর বালুকাময় গর্ভ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছিল। তখনও পর্যন্ত বৃষ্টি নামে নাই। ভোগপুরের কেষ্ট দাস নদীর ঘাটে নামিয়া একবার দাঁড়াইল। সমস্ত দেখিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, তাই ভাল ক'রে পূজো কর্ তারিণী, জল-টল

হোক, বান-টান আসুক। বান না এলে চাষ হবে কি ক'রে?

ময়ূরাক্ষীর পলিতে দেশে সোনা ফলে।

তারিণী হাসিয়া বলিল, তাই বল বাপু। লোকে বলে কি জান দাস, বলে—শালা বানের লেগে পুজো দেয়। এই মায়ের কিপাতেই এ মুলুকে লক্ষ্মী। ধর্ ধর্ কেলে, ওরে পাঁঠা পালাল, ধর।

বলির পাঁঠাটা নদীগর্ভের উত্তপ্ত বালুকার উপর আর থাকিতে চাহিতেছিল না।

পূজা-অর্চনা সুশৃঙ্খলেই হইয়া গেল। তারিণী মদ খাইয়া নদীর ঘাটে বসিয়া কালাচাঁদকে বলিতেছিল, হড়হড় কলকল-বান-লে কেনে তু দশ দিন বাদ।

কালাচাঁদ বলিল, এবার মাইরি, তু কিন্তু ভাসা জিনিস ধরতে পাবি না। এবার কিন্তুক আমি ধরব, হঁ্যা।

তারিণী মত্ত হাসিয়া বলিল, বড় ঘুরন-চাকে তিনটি বুটবুটি, বুক বুক বুক, বাস কালাচাঁদ ফরসা।

কালাচাঁদ অপমানে আগুন হইয়া উঠিল: কি বললি শালা?

তারিণী খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু সুখী মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সব মিটাইয়া দিল। সে বলিল, ছোট বানের সময়—হুই পাকুড়গাছ পযন্ত বানে দেয়র ধরবে, আর পাকুড়গাছ ছাড়ালেই তুমি।

কালাচাঁদ সুখীর পায়ের ধুলা লইয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল, বউ লইলে ই বলে কে?

পরদিন হইতে ডোঙা মেরামত আরম্ভ হইল। দুইজনে হাতুড়ি নেয়ান লইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ডোঙাখানাকে প্রায় নূতন করিয়া ফেলিল।

কিন্তু সে ডোঙায় আবার ফাট ধরিল রৌদ্রের টানে। সমস্ত আষাঢ়ের মধ্যে বান হইল না। বান দূরের কথা, নদীর বালি ঢাকিয়া জলও হইল না। বৃষ্টি অতি সামান্য-দুই চারি পসলা। সমস্ত দেশটার মধ্যে একটা মৃদু কাতর ক্রন্দন যেন সাড়া দিয়া উঠিল। প্রত্যাসন্ন বিপদের জন্য দেশ যেন মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল। কিংবা হয়তো বহুদূরের যে হাহাকার আসিতেছে, বায়ুস্তরবাহিত তাহারই অগ্রধ্বনি এ। তারিণীর দিন আর চলে না। সরকারী কর্মচারীদের বাইসিকল্ ঘাড়ে করিয়া নদী পার করিয়া দুই-চারিটি পয়সা মেলে, তাহাতেই সে মদ খায়।

সরকারী কর্মচারীদের এ সময়ে আসা যাওয়ার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে—তাঁহারা আসেন দেশে সত্যই অভাব আছে কি না তাহারই তদন্তে। আরও কিছু মেলে —সে তাঁহাদের ফেলিয়া দেওয়া সিগারেটের কুটি।

শ্রাবণের প্রথমেই প্রথম বন্যা আসিল। তারিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বন্যার প্রথম দিনই বিপুল আনন্দে সে তালগাছের মত উঁচু পাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীর বুকে পড়িয়া বন্যার জল আরও উচ্ছল চঞ্চল করিয়া তুলিল।

কিন্তু তিন দিনের দিন নদীতে আবার হাঁটু-জল হইয়া গেল। গাছে বাঁধা ডোঙাটা তরঙ্গাঘাতে মৃদু মৃদু দোল খাইতেছিল। তাহারই উপর তারিণী ও কালাচাঁদ বসিয়া ছিল যদি কেহ ভদ্র যাত্রী আসে তাহারই প্রতীক্ষায়, সে হাঁটিয়া নদী পার হইবে না। এ অবস্থায় তাহারা দুইজন মিলিয়া ডোঙাটা ঠেলিয়া লইয়া যায়।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। তারিণী বলিল, ই কি হ'ল বল্ দেখি কেলে?

চিন্তাকুলভাবে কালাচাঁদ বলিল, তাই তো।

তারিণী আবার বলিল, এমন তো ভাই কখনও দেখি নাই!

সেই পূর্বের মতই কালাচাঁদ উত্তর দিল, তাই তো।

আকাশের দিকে চাহিয়া তারিণী বলিল, আকাশ দেখ্ কেনে—ফরসা নীল পচিদিকে তো ডাকে না!

কালাচাঁদ এবারও উত্তর দিল, তাই তো।

ঠাস করিয়া তাহার গালে এক চড় কষাইয়া দিয়া তারিণী বলিল, তাই তো! 'তাই তো' বলতেই যেন আমি ওকে বলছি। তাই তো! তাই তো! তাই তো!

কালাচাঁদ একান্ত অপ্রতিভের মত তারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কালাচাঁদের সে দৃষ্টি তারিণী সহ্য করিতে পারিল না, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। কিছুক্ষণ পর অকস্মাৎ যেন সচেতনের মত নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া সে বলিয়া উঠিল, বাতাস ঘুরেছে, লয় কেলে, পচি বইছে, না? বলিতে বলিতেই সে লাফ দিয়া ডাঙায় উঠিয়া শুষ্ক বালি এক মুঠা ঝরঝর করিয়া মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বায়ুপ্রবাহ অতি ক্ষীণ, পশ্চিমের কি না ঠিক বুঝা গেল না। তবুও সে বলিল, হুঁ, পচি থেকে ঠেল হইছে একটুকুন। আয় কেলে মদ খাব, আয়। দু আনা পয়সা আছে আজ। বার ক'রে নিয়েছি আজ সুখীর খুঁট খুলে।

সস্নেহ নিমন্ত্রণে কালাচাঁদ খুশী হইয়া উঠিয়াছিল। সে তারিণীর সঙ্গ ধরিয়া

বলিল, তোমার বউয়ের হাতে টাকা আছে দাদা। বাড়ি গেলে তোমার ভাত ঠিক পাবেই। মলাম আমরাই।

তারিণী বলিল, সুখী বড় ভাল রে কেলে, বড় ভাল। উ না থাকলে আমার 'হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি' হয় ভাই। সেবার সেই ভাইয়ের বিয়েতে—

বাধা দিয়া কালাচাঁদ বলিল, দাঁড়াও দাদা, একটা তাল প'ড়ে রইছে, কুড়িয়ে লি।

সে ছুটিয়া পাশের মাঠে নামিয়া পড়িল।

একদল লোক গ্রামের ধারে গাছতলায় বসিয়া ছিল, তারিণী প্রশ্ন করিল, কোথায় যাবা হে তোমরা, বাড়ি কোথা ?

একজন উত্তর দিল, বীরচন্দ্রপুর বাড়ি ভাই আমাদের, খাটতে যাব আমরা বদ্ধমান।

কালাচাঁদ প্রশ্ন করিল, বদ্ধমানে কি জল হইছে নাকি ?

জল হয় নাই, ক্যানেল আছে কি না।

দেখিতে দেখিতে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। দুর্ভিক্ষ যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়া ছিল, মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। গৃহস্থ আপনার ভাণ্ডার বন্ধ করিল। জনমজুরদের মধ্যে উপবাস শুরু হইল। দলে দলে লোক দেশ ছাড়িতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সকালে উঠিয়া তারিণী ঘাটে আসিয়া দেখিল, কালাচাঁদ আসে নাই। প্রহর গড়াইয়া গেল, কালাচাঁদ তবুও আসিল না। তারিণী উঠিয়া কালাচাঁদের বাড়ি গিয়া ডাকিল, কেলে !

কেহ উত্তর দিল না। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরদ্বার শূন্য—খাঁ-খাঁ করিতেছে। কেহ কোথাও নাই পাশের বাড়িতে গিয়া দেখিল, সে বাড়িও শূন্য। শুধু সে বাড়িই নয়, কালাচাঁদের পাড়াটাই জনশূন্য। পাশের চাষাপাড়ায় গিয়া শুনিল, কালাচাঁদের পাড়ার সকলেই কাল রাত্রে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

হারু মোড়ল বলিল, বললাম আমি তারিণী—যাস না সব, যাস না। তা শুনলে না, বলে - বড়নোকের গাঁয়ে ভিখ করব।

তারিণীর বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল, ওই জনশূন্য পল্লীটার দিকে চাহিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

হারু আবার বলিল, দেশে বড়লোক কি আছে? সব তলা ফাঁক। তাদের আবার বড় বেপদ। পেটে না খেলেও মুখে কবুল দিতে পারে না। এই তো কি বলে—কি গাঁয়ের নাম, ওই যি—পলাশডাঙা, পলাশডাঙার ভদ্দরনোক একজন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। শুধু অভাবে মরেছে।

তারিণী শিহরিয়া উঠিল।

পরদিন ঘাটে এক বীভৎস কাণ্ড! ঘাটের পাশেই এক বৃদ্ধার মৃতদেহ পড়িয়া ছিল। কতকটা তাহার শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইয়াছে। তারিণী চিনিল, একটি মুচী পরিবারের বৃদ্ধা মাতা এ হতভাগিনী। গত অপরাহ্নে চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধার মৃত্যুকামনা বার বার তাহারা করিতেছিল। বৃদ্ধার জন্যই ঘাটের পাশে গত রাত্রে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল। রাত্রে মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে ফেলিয়া তাহারা পলাইয়াছে।

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। বরাবর বাড়ি আসিয়া সুখীকে বলিল, লে সুখী, খান-চারেক কাপড় আর গয়না কটা পেট-আঁচলে বেঁধে লে। আর ই গাঁয়ে থাকব না, শহর দিকে যাব। দিন-খাটুনি তো মিলবে।

জিনিসপত্র বাঁধিবার সময় তারিণী দেখিল, হাতের শাঁখা ছাড়া আর কোন গহনাই সুখীর নাই। তারিণী চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, আর?

সুখী ম্লান হাসিয়া বলিল, এতদিন চলল কিসে, বল?

তারিণীও গ্রাম ছাড়িল।

দিন তিনেক পথ চলিবার পর সেদিন সন্ধ্যায় একটা গ্রামের প্রান্তে তাহারা রাত্রির জন্য বিশ্রাম লইয়াছিল। গোটা দুই পাকা তাল লইয়া দুইজনে রাত্রির আহার সারিয়া লইতেছিল। তারিণী চট করিয়া উঠিয়া খোলা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল। থাকিতে থাকিতে বলিল, দেখি সুখী, গামছাখানা। গামছাখানা লইয়া ঝুলাইয়া সেটাকে সে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল।

ভোরবেলায় সুখীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল, তারিণী ঠায় জাগিয়া বসিয়া আছে। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ঘুমোও নাই তুমি?

হাসিয়া তারিণী বলিল, না, ঘুম এল না।

সুখী তাহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিল, ওবলিল, আমি তাহ'লে কি করব বল দেখি আমি? ই মানুষের বাইরে বেরুনো কেনে বাপু, ছি–ছি–ছি!

তারিণী পুলকিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দেখেছিস, সুখী, দেখেছিস?

সুখী বলিল, আমার মাথামুণ্ডু কি দেখব, বল?

তারিণী বলিল, পিঁপড়েতে ডিম মুখে নিয়ে ওপরের পানে চলল। জল এইবার হবে।

সুখী দেখিল, সত্যই লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধভাবে প'ড়ো ঘরখানার দেওয়ালের উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। মুখে তাহাদের সাদা সাদা ডিম।

সুখী বলিল, তোমার যেমন -

তারিণী বলিল, ওরা ঠিক জানতে পারে, নীচে থাকলে যে জলে বাসা ভেসে যাবে। ইদিকে বাতাস কেমন বইছে, দেখেছিস ? ঝাড়া পচিম থেকে।

আকাশের দিকে চাহিয়া সুখী বলিল, আকাশ তো ফটফটে, চকচক করছে।

তারিণী চাহিয়া ছিল অন্য দিকে, সে বলিল, মেঘ আসতে কতক্ষণ ? ওই দেখ, কাকে কুটো তুলছে—বাসার ভাঙা ফুটো সারবে। আজ এইখানেই থাক্ সুখী, আর যাব না ; দেখি মেঘের গতিক।

খেয়া-মাঝির পর্যবেক্ষণ ভুল হয় না। অপরাহ্নের দিকে আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, পশ্চিমের বাতাস ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল।

তারিণী বলিল, ওঠ্, সুখী, ফিরব।

সুখী বলিল. এই অবেলায় ?

তারিণী বলিল, ভয় কি তোর, আমি সঙ্গে রইছি। লে, মাথালি তু মাথায় দে। টিপিটিপি জল ভারি খারাপ।

সুখী বলিল, আর তুমি, তোমার শরীর বুঝি পাথরের ?

তারিণী হাসিয়া বলিল, ওরে, ই আমার জলের শরীল, রোদে টান ধরে, জল পেলেই ফোলে। চল্। দে, পুঁটুলি আমাকে দে।

ধীরে ধীরে বাদল বাড়িতেছিল। উতলা বাতাসের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ রিমিঝিমি বৃষ্টি হইয়া যায়, তারপর থামে। কিছুক্ষণ পর আবার বাতাস প্রবল হয়, সঙ্গে সঙ্গে নামে বৃষ্টি।

যে পথ গিয়াছিল তাহারা তিন দিনে, ফিরিবার সময় সেই পথ অতিক্রম করিল দুই দিনে। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়াই তারিণী বলিল, দাঁড়া, লদীর ঘাট দেখে আসি। ফিরিয়া আসিয়া পুলকিত চিত্তে তারিণী বলিল, লদী কানায় কানায়, সুখী।

প্রভাতে উঠিয়াই তারিণী যাইবার জন্য সাজিল। আকাশ তখন দুরন্ত দুর্যোগে আচ্ছন্ন, ঝড়ের মত বাতাস, সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি।

দ্বিপ্রহরে তারিণী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কামার-বাড়ি চললাম আমি।

সুখী ব্যস্তভাবে বলিল, খেয়ে যাও কিছু।

চিন্তিত মুখে ব্যস্ত তারিণী বলিল, না, ডোঙার একটো বড় গজাল খুলে গেইছে। সে না হ'লে উহুঁ, অল্প বান হ'লে না হয় হ'ত -লদী একেবারে পাথার হয়ে উঠেছে, দেখসে আয়।

সুখীকে সে না দেখাইয়া ছাড়িল না। পালেদের পুকুরের উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সুখী দেখিল, ময়ূরাক্ষীর পরিপূর্ণ রূপ। বিস্তৃতি যেন পারাপারহীন। রাঙা জলের মাথায় রাশি রাশি পুঞ্জিত ফেনা ভাসা ফুলের মত দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, ডাক শুনছিস সুখী সোঁ-সোঁ! বান আরও বাড়বে। তু বাড়ি যা, আমি চললাম। লইলে কাল আর ডাক পার করতে পারব না।

সুখী অসন্তুষ্ট চিত্তে বলিল, এই জল ঝড়—

তারিণী সে কথা কানেই তুলিল না। দুরন্ত দুর্যোগের মধ্যেই সে বাহির হইয়া গেল।

যখন সে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দ্রুতপদে সে আসিতেছিল। কি একটা 'ডুগডুগ' শব্দ শোনা যায় না? হঁ্যা, ডুগডুগিই বটে। এ শব্দের অর্থ তো সে জানে, আসন্ন বিপদ। নদীর ধারে গ্রামে গ্রামে এই সুরে ডুগডুগি যখন বাজে, তখনই বন্যার ভয় আসন্ন বুঝিতে হয়।

তারিণীর গ্রামের ওপাশে ময়ূরাক্ষী, এপাশে ছোট একটা কাঁতার অর্থাৎ ছোট শাখা-নদী। একটা বাঁশের পুল দিয়া গ্রামের প্রবেশের পথ। তারিণী সঠিক পথ ধরিয়া আসিয়াও বাঁশের পুল খুঁজিয়া পাইল না। তবে কি পথ ভুল হইল নাকি? অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ পর সে ঠাহর করিল, সে পুলের মুখ এখনও অন্তত এক শত বিঘা জমির পরে। ঠিক বন্যার জলের ধারেই সে দাঁড়াইয়া ছিল, আঙুলের ডগায় ছিল জলের সীমা। দেখিতে দেখিতে গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবিয়া গেল। সে কান পাতিয়া রহিল, কিন্তু বাতাস ও জলের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না, আর একটা গর্জনের মত গোঁ-গোঁ শব্দ। দেখিতে দেখিতে সর্বাঙ্গ তাহার পোকায় ছাইয়া গেল। লাফ দিয়া দিয়া মাটির পোকা পলাইয়া যাইতে চাহিতেছে।

তারিণী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

ক্ষিপ্রগতিতে মাঠের জল অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। গ্রামের মধ্যেও বন্যা প্রবেশ করিয়াছে। এক-কোমর জলে পথঘাট ঘরদ্বার সব ভরিয়া গিয়াছে। পথের উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের নরনারী আর্ত চিৎকার করিয়া এ উহাকে ডাকিতেছে। গরু ছাগল ভেড়া কুকুরের সে কি

ভয়ার্ত চিৎকার! কিন্তু সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন, বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ-- লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চিৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহস্থের ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবে।

গভীর অন্ধকারে পথও বেশ চেনা যায় না।

জলের মধ্যে কি একটা বস্তুর উপর তাবিণীব পা পড়িল, জীব বলিয়াই বোধ হয়। হেঁট হইয়া তারিণী সেটাকে তুলিয়া দেখিল, ছাগলের ছানা একটা শেষ হইয়া গিয়াছে। সেটাকে ফেলিয়া দিয়া কোনরূপে সে বাড়িব দবজায় আসিয়া ডাকিল, সুখী—সুখী!

ঘরের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, অপবিমেয় আশ্বস্ত কণ্ঠস্ববে সুখী সাড়া দিল, এই যে, ঘরে আমি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ কবিয়া তাবিণী দেখিল, ঘবেব উঠানে এক কোমব জল। দাওয়ার উপর এক-হাঁটু জলে চালেব বাঁশ ধবিয়া সুখী দাঁড়াইয়া আছে।

তারিণী তাহার হাত টানিয়া ধবিয়া বলিল, বেবিয়ে আয়, এখন কি ঘবে থাকে, আয়, ঘর চাপা প'ড়ে মরবি যে!

সুখী বলিল, তোমাব জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। কোথা খুঁজে বেড়াতে বল দেখি?

পথে নামিয়া তাবিণী দাঁড়াইল, বলিল, কি কবি বল্ দেখি সুখী?

সুখী বলিল, এইখানেই দাঁড়াও, সবাব যা দশা হবে, আমাদেবও তাই হবে।

তারিণী বলিল, বান যদি আরও বাড়ে সুখী? গোঁ-গোঁ ডাক শুনছিস না?

সুখী বলিল, আর কি বান বাড়ে গো? আর বান বাড়লে দেশেব কি থাকবে? ছিষ্টি কি আর নষ্ট কববে ভগমান?

তারিণী এ আশ্বাস গ্রহণ করিবার চেষ্টা কবিল, কিন্তু পারিল না।

একটা হুড়মুড় শব্দের সঙ্গে বন্যাব জল ছটকাইয়া দুলিয়া উঠিল। তাবিণী বলিল, আমাদেরই ঘর পডল সুখী। চল্, আর লয়। কোমরের উপব উঠল, তোর তো এক-ছাতি হইছে তা হ'লে।

অন্ধকারে কোথায় বা কাহার কণ্ঠস্বর বোঝা গেল না, কিন্তু নাবীকণ্ঠেব কাতর ক্রন্দন ধ্বনিয়া উঠিল, ওগো, খোকা প'ড়ে গেইছে বুক থেকে। খোকা বে!

তারিণী বলিল, এইখানেই থাকবি সুখী, ডাকলে সাড়া দিস।

সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। শুধু তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল -- কে? কোথা? কার ছেলে পড়ে গেল, সাড়া দাও, ওই!

ওদিক হইতে সাড়া আসিল, এই যি।

তারিণী আবার হাঁকিল, ওই!

কিছুক্ষণ ধরিয়া কণ্ঠস্বরের সঙ্কেতের আদান-প্রদান চলিয়া সে শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পরই তারিণী ডাকিল, সুখী!

সুখী সাড়া দিল, অ্যাঁ?

শব্দ লক্ষ্য করিয়া তারিণী আসিয়া বলিল, আমার কোমর ধর্ সুখী। গতিক ভাল নয়।

সুখী আর প্রতিবাদ করিল না। তারিণীর কোমরের কাপড় ধরিয়া বলিল, কার ছেলে বটে? পেলে?

তারিণী বলিল, পেয়েছি, ভুপ্‌তে ভল্লার ছেলে

সন্তর্পণে জল ভাঙিয়া তাহারা চলিয়াছিল। জল ক্রমশ যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, আমার পিঠে চাপ্ সুখী! কিন্তু এ কোন্ দিকে এলাম সুখী, হ -ই —

কথা শেষ হইবার পূর্বেই অথই জলে দুইজনে ডুবিয়া গেল। পরক্ষণেই কিন্তু তারিণী ভাসিয়া উঠিয়া বলিল, নদীতেই বা পড়লাম সুখী। পিঠ ছেড়ে আমার কোমরের কাপড় ধরে ভেসে থাক্।

স্রোতের টানে তখন তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে। গাঢ় গভীর অন্ধকার, কানের পাশ দিয়া বাতাস চলিয়াছে হু হু শব্দে, তাহারই সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ময়ূরাক্ষীর বানের হুড়হুড় হুড়হুড় শব্দ। চোখে মুখে বৃষ্টির ছাট আসিয়া বিঁধিতেছিল তীরের মত। কুটার মত তাহারা চলিয়াছে কতক্ষণ তাহার অনুমান হয় না; মনে হয়, কত দিন কত মাস তাহার হিসাব নাই — নিকাশ নাই। শরীরও ক্রমশ যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষীর তরঙ্গ শ্বাসরোধ করিয়া দেয়। কিন্তু সুখীর হাতের মুঠি কেমন হইয়া আসে যে! সে যে ক্রমশ ভারী হইয়া উঠিতেছে! তারিণী ডাকিল, সুখী সুখী!

উন্মত্তার মত সুখী উত্তর দিল, অঁ্যা?

ভয় কি তোর, আমি —

পর-মুহূর্তে তারিণী অনুভব করিল, অতল জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিয়াছে। ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে তাহারা। সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত করিয়া সে জল ঠেলিবার চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণেই মনে হইল, তাহারা জলের উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু সম্মুখের বিপদ তারিণী জানে, এইখানে আবার ডুবিতে হইবে। সে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু এ কি, সুখী যে নাগপাশের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। সে ডাকিল, সুখী সুখী!

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছে। সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পর-মুহূর্তে হাত পড়িল সুখীব গলায়। তুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধবিল। সে তাহার উন্মত্ত ভাষণ আক্রোশ! হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভাবটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে জলেব উপবে ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ বুক ভবিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।

খাজাঞ্চিবাবু

মানভূম জেলার ফায়ার-ব্রিক্‌সের কারখানার একটা মেস। খাপরায় ছাওয়া একটানা লম্বা ব্যারাক ধরনের একখানা বাংলো, সামনে সারি সারি থামওয়ালা একফালি টানা বারান্দা সেই বারান্দার উপর বসিয়া কর্মচারীরা সকলে আপিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। শীতকালের প্রাতঃকাল, সাড়ে ছয়টায় কারখানার ভোঁ বাজে। অশ্বিনী চা খায় না, সে গরম দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছিল; ভিখারী আউটডোরে কাজ করে, সে লাল রঙের প্যাণ্টটা পরিয়া মোজা জোড়াটা খুঁজিতেছিল; তরুণ বদি রোজ পঁচিশটা ডন ফেলে, সে একাদশ ডনটি ফেলিতেছিল, বুড়া শশী মিস্ত্রী গত রাত্রের উদ্‌বৃত্ত মাংসের চর্বিগুলা গিলিতেছিল; ঠিক এই সময়েই কারখানার ভোঁ বাজিয়া উঠিল— ভোঁ ভোঁ ভোঁ—

শেষ সিটিই তো বটে, থামিয়া থামিয়া বাজিতেছে। যে যেমন অবস্থায় ছিল ছুটিল। ম্যানেজার নূতন লোক, সাহেবী মেজাজ। তাঁহার নূতন বন্দোবস্তে নিয়ম হইয়াছে, সাড়ে ছয়টার সিটি বাজিবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সকলকে আসিয়া হাজিরা-বই সহি করিতে হইবে। তাহার অধিক এক মিনিটও বিলম্ব হইলে অর্ধেক দিন অনুপস্থিত লেখা হইবে। বদি একাদশ ডনটাতে ব্যায়াম শেষ করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া বলিল, স্লেভারি, শুঃ! সে তাড়াতাড়ি একটা জামা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

আপিসে আসিয়া সে দেখিল, সেখানে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সার্ভেয়ার খাজাঞ্চিকে বলিতেছে, হু আর ইউ? তুমি কে? হোয়াট রাইট— কে তোমাকে সিটি দেবার হুকুম দিতে রাইট দিয়েছে? হু আর ইউ?

বদি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে ছয়টা বাজিতে এখনও পাঁচ মিনিট দেরি আছে, অর্থাৎ প্রায় দশ মিনিট পূর্বে সিটি দেওয়া হইয়াছে। রক্ত যেন তাহার মাথায় চড়িয়া গেল, সে ঘুষি পাকাইয়া খাজাঞ্চির নাকের কাছে আসিয়া বলিল, ইয়ে কোথাকার!

কি হয়েছে আপনাদের?—নূতন ম্যানেজার-সাহেবের কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ হইয়া গেল। বৃদ্ধ খাজাঞ্চি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ঈষৎ উৎসাহের সহিত বলিল, সার্, কাল থেকে অনেক কাজ বাকি প'ড়ে আছে, গাড়ি লোডিং শেষ হয় নি, দশ নম্বর কিলেন

বাধা দিয়া ম্যানেজার বলিলেন, সে হিসেব আমি চাই নি। আমি জানতে

চাই, এ গোলমাল কিসের জন্যে ?

খাজাঞ্চি হতবাক হইয়া গেল। সে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল শুধু। সার্ভেয়ার সকলের মধ্যে পদস্থ ব্যক্তি, সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, সার্, কাল থেকে আপনি অর্ডার দিয়েছেন, সকাল সাড়ে ছটায় কাজ আরম্ভ হবে, আসতে পাঁচ মিনিটের বেশি দেরি হ'লে হাফ-ডেজ ওয়ার্ক কাটা যাবে। শীতকালের দিন সার্, আর আজ খাজাঞ্চিবাবু এসে ছটা কুড়ি মিনিটে মানে দশ মিনিট আগে সিটি দিতে হুকুম দিয়েছেন। আমাদের কারও খাওয়া হয়নি সার, মুখের চা পর্যন্ত ফেলে এসেছি।

ম্যানেজার ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সাড়ে ছয়টার তখনও তুই মিনিট বিলম্ব আছে। নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে ঘড়িটাও ঠিক তাহাই বলিতেছে। ম্যানেজার বলিলেন, ওয়েল, আধ ঘণ্টা কাজ করে আপনারা আপনাদের ডিপার্টমেন্টের কাজ চালু ক'রে দিন। তারপর গিয়ে সব খেয়ে আসুন। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আপনাদের আজ ছুটি থাকল। যান যান সব।

মিনিট তুইয়ের মধ্যেই আপিসটা পরিষ্কার হইয়া গেল। খাজাঞ্চি আপনার আসনে গিয়া বসিল।

ম্যানেজার বলিলেন, আপনি দশ মিনিট আগে সিটি দিতে হুকুম দিয়েছেন ?

খাজাঞ্চি বলিল, কাল থেকে অনেক কাজ বাকি আছে সার্ লোডিং শেষ হয় নি, দশ

অসহিষ্ণুভাবে ম্যানেজার বলিলেন, সে সব আমি জানি। আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তারই উত্তর দিন।

ফ্যালফ্যাল করিয়া ম্যানেজারের মুখের দিকে চাহিয়া খাজাঞ্চি বলিল, হাঁ সার্।

কেন ? ঘণ্টা বা সিটি দিতে হুকুম দেওয়ার ভার তো আপনার ওপর নেই।

কাল থেকে অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে সার্ লোডিং শেষ হয় নি—দশ নম্বর কিলেন—

আপনি কি কারখানার মালিক ?

না সার্।

আজ আপনাকে মাপ করলাম, কিন্তু এমন যেন আর না হয়।—ম্যানেজার গটগট করিয়া চলিয়া গেলেন। শীতের দিনেও খাজাঞ্চি ঘামিয়া উঠিয়াছিল। বেচারী কপালের ঘাম মুছিয়া আপনার কাজে মন দিল। ক্যাশবাক্সের উপর

একটি প্রণাম করিয়া খাতা খুলিয়া বসিল।

খাজাঞ্চিবাবু, টাকাটা আমাকে জলদি দিয়ে দেন তো।—স্টোর-ডিপার্ট-মেণ্টের পিওন একখানা ভাউচার ফেলিয়া দিল। ম্যানেজারের সই করা ভাউচার, এক শো দশ টাকা দিতে হইবে।

খাজাঞ্চি বলিল, এত টাকা কি হবে?

খড় কিনতে হবে।

তা দাঁড়াও বাপু, একবার শুধিয়ে আসি। ভাউচারখানি হাতে করিয়া খাজাঞ্চি ম্যানেজারের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। পর্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতে ভয় হইতেছিল, সে ফিরিল। কিন্তু আবার ফিরিয়া গিয়া বাহির হইতে ডাকিল, সার্—

আসুন।

এই ভাউচারটার টাকা—

ম্যানেজার তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, টাকা কি কম আছে?

মাথা চুলকাইয়া খাজাঞ্চি বলিল, আজ্ঞে না, তবে

তবে? আজ কি কোন বড় পেমেণ্ট আছে?

আজ্ঞে না, দোব কি না তাই শুধোচ্ছি।

সবিস্ময়ে খাজাঞ্চির মুখের দিকে চাহিয়া ম্যানেজার বলিলেন, মানে—হোয়াট ডু ইউ মীন? ভাউচারে যখন সই করেছি, তখনই তো আমি দিতে বলেছি।

একটা সেলাম করিয়া খাজাঞ্চি সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। ম্যানেজার আন্দোলিত পর্দাটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইডিয়ট!

বাক্স খুলিয়া টাকা গুনিয়া গাঁথিয়া পিওনকে দিয়া খাজাঞ্চি বলিল, সই কর।

পিওন সই করিয়া দিল। টাকা লইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু খাজাঞ্চি বলিল, শোন শোন।

কি?

দাঁড়াও তো, আর একবার গুনে দেখি, ভুল হল না তো!

আবার দেখিয়া শুনিয়া দিয়া খাজাঞ্চি খাতায় খরচ লিখিল—স্টোর-খাতে খরচ। তারপর ম্যানেজারের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সার্!

আসুন। কি? কি বলছেন আবার?

আজ্ঞে, খড়ের টাকাটা দিয়ে দিলাম।

ম্যানেজার অবাক হইয়া খাজাঞ্চির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। খাজাঞ্চি একটা সেলাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বারোটার ভোঁ বাজিল। স্নানাহারের জন্য এখন দেড় ঘণ্টা ছুটি। মেসে আসিয়া খাজাঞ্চি আপনার নিয়মমত জুতো-জোড়াটি ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে খুলিয়া রাখিল। তারপর গায়ের জামা খুলিয়া ঘটি ও গামছা হাতে বারান্দার তিন নম্বর থামের খাটালটিতে বসিয়া তেল মাখিতে লাগিল। স্টোর-কীপার ওদিকে তেল মাখিতেছিল, সে প্রশ্ন করিল, বোদ্দা, নতুন সাহেব লোক কেমন ?

খাজাঞ্চির নামও বদিবাবু। খাজাঞ্চি উত্তর দিল, ভাল লোক, পাকা লোক। চিঠি আজ যা লিখছিল খসখস ক'রে, জলে র মত কলম চলছে যেন !

বালতি ও ঘটি হাতে খাজাঞ্চি উঠিয়া দাঁড়াইল। লম্বা বারান্দাটায় জল রাখিবার জন্য প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে একটি করিয়া লোহার জালা রক্ষিত ছিল, খাজাঞ্চি প্রত্যেক জালা হইতে দুই ঘটি করিয়া জল তুলিয়া নিজের বালতিটি ভর্তি করিয়া লইল। তারপর সম্মুখের পড়ো জমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পাথরটায় স্নান করিতে বসিল।

ও-পাশে ম্যানেজার সাহেব তখন ঘর দেখিতে ঢুকিলেন। সমস্ত ঘর মেরামত ও চুনকাম করা হইবে, তাহারই ব্যবস্থা করিতেছিলেন। খাজাঞ্চি স্নান সারিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল জয়, জয় মা কালীঘাটের। সে গামছা পরিয়া বিব্রত হইয়া উঠিল। ঘরে ম্যানেজার দাঁড়াইয়া। ম্যানেজার বলিলেন, আপনি এ ঘরে থাকেন ?

আজ্ঞে হাঁ সার্, আর গোবিন্দ থাকে।

কিন্তু এ কি রকম ভাবে সীট সাজিয়েছেন—একটা উত্তর-দক্ষিণে, একটা পূর্ব-পশ্চিমে ? এই এই খালাসী, এই সীটটা ঘুরিয়ে দে তো—এইটাকে উত্তর-দক্ষিণে করে দে। একি, ঘরের মাঝখানে জুতো ?—বলিয়া তিনি নিজেই পায়ে করিয়া জুতো-জোড়াটা এক পাশে ঠেলিয়া দিলেন। নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া লোকজন সহ ম্যানেজার বাহির হইয়া গেলেন। খাজাঞ্চির সীটটাই ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি সেই গামছা পরিয়াই বাহির হইয়া গেল। ম্যানেজার তখন শশী মিস্ত্রীর ঘরে তামাকের গুল ও দেওয়ালে হাত-মোছা তেল-কালি ও মাংসের হলুদের দাগ লইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার প্যাণ্টের পিছনে পর্যন্ত হলদ ও কালির দাগ।

সার্ !

ম্যানেজার ফিরিয়া দেখিলেন, খাজাঞ্চি। · কি বলছেন? কাপড় ছাড়েন নি এখনও আপনি? যান যান, কাপড় ছেড়ে আসুন।

সার্, আজ চৌদ্দ বছর আমার সীটটা এমনই ভাবে আছে সার্।

ম্যানেজার অবাক হইয়া গেলেন, কি বলছেন আপনি?

আমার সীটটা—

হঠাৎ রুষ্ট হইয়া ম্যানেজার বলিলেন, না না, আপনার জন্যে অন্যের অসুবিধা হতে পারে না।

খাজাঞ্চি ফিরিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। রুম-মেট গোবিন্দ স্নানান্তে চুল আঁচড়াইতেছিল, সে বলিল, কাপড় ছাড়ুন।

খাজাঞ্চি বলিল, একবার তক্তাপোশটা ধর তো ভাই গোবিন্দ।

গোবিন্দ অত্যন্ত ভালমানুষ, সে বলিল, ম্যানেজারবাবু যে

ততক্ষণে তক্তাপোশের এক প্রান্ত ধরিয়া খাজাঞ্চি বলিল, ওরে বাবা, এই কারখানায় এসে অবধি এই ঘরটাতে—এই তক্তায় - ওই পূর্ব-শিয়রে আমি আছি, ও আমি বদল করব না।

গোবিন্দ আর প্রতিবাদ করিল না। তক্তাপোশের অপর প্রান্তটা সে আসিয়া ধরিল।

তক্তাপোশটা যথাস্থানে ঘুরাইয়া পাতিয়াই খাজাঞ্চি সর্বাগ্রে জুতা-জোড়াটি তুলিয়া সেই ঘরের মধ্যস্থলে আনিয়া রাখিয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় খাজাঞ্চি ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর বিষম চটিয়া বলিল, নাঃ, এখানকার অন্ন আমার ঘুচুলে এরা! আচ্ছা। হুঁকো কে নামিয়ে দিলে আমার?

গোবিন্দ বলিল, ম্যানেজারবাবু। আবার সন্ধ্যেবেলায় এসেছিলেন। বিশেষ ক'রে ব'লে গেলেন, হুঁকো ওখানে রাখবেন না। তক্তাপোশ ঘুরিয়েছেন ঘুরিয়েছেন, কিন্তু জানলায় হুঁকো আর ঘরের মাঝখানে জুতো এ রাখা হবে না।

জুতো জোড়াটা ঘরের মধ্যস্থলেই খুলিয়া রাখিয়া খাজাঞ্চি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তক্তাপোশটার উপর বসিয়া পড়িল। আবার উঠিয়া সে জুতাজোড়াটা সরাইয়া রাখিল।

পরদিন সকালবেলা। খাজাঞ্চি ঘড়ির কাছে চেয়ার লইয়া কি করিতেছিল। জুতার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ম্যানেজার নিজের হাত-ঘড়িটা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন।

সেদিন অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট অশ্বিনী ম্যানেজারকে খাতাপত্র দেখাইতেছিল। ক্যাশ-খাতা দেখিয়া ম্যানেজার বলিলেন, এ কি? এ কি লেখা? আর লাইন আরম্ভ হয়েছে এখানে, শেষ হ'ল গিয়ে দু ইঞ্চি বেঁকে এসে এখানে? এ কি?

অশ্বিনী বলিল, খাজাঞ্চিবাবু চোখে ভাল দেখতে পান না, আবার চশমাও নেবেন না; বলেন, চোখ খারাপ হয়ে যাবে।

ম্যানেজার হাঁকিলেন, বেয়ারা! খাজাঞ্চিবাবু।

খাজাঞ্চি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার বলিলেন, কত বয়স হল আপনার?

ষাট সার্। এই কোম্পানিতে চল্লিশ বছর চাকরি করছি, এ কারখানায় চোদ্দ বছর—গোড়া থেকেই, তখন এগুলো ভাঙা ছিল, মানুষ আসতে ভয় –

এতক্ষণে অসহিষ্ণু হইয়া ম্যানেজার বলিলেন, থামুন, ও-কথা নয়। আমি বলছি, এত বয়স হল, চোখে দেখেন না, তবু চশমা নেন না কেন? এ কি—এ কি? এ রকম ভাবে কাজ চলবে না মশায়।

নোব সার্, চশমা আমি নোব সার্। -খাজাঞ্চি চলিয়া গেল। আবাব কিছুক্ষণ পর আসিয়া বলিল, সার্, এক বেলা যদি ছুটি দেন সার্, আসানসোলে মোটর যাচ্ছে—

কথা শেষ করিতে-না দিয়াই ম্যানেজার বলিলেন, যান।

সন্ধ্যায় চশমা-চোখে খাজাঞ্চি প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয়া সকলকে দেখাইয়া বলিল, পরিষ্কাব দেখতে পাচ্ছি কিন্তু। কেমন হল বল দেখি? এক দুই তিন চার। -চালের বাতা গুনিতে আরম্ভ করিয়া দিল খাজাঞ্চি।

দিন কয়েক পর। ম্যানেজার খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া বলিলেন, বড় দুঃখিত আমি খাজাঞ্চিবাবু, আপনার চাকরিতে জবাব হচ্ছে। মানে, কোম্পানি আপনাকে রিটায়ার করতে অনুরোধ ক'রে পত্র দিয়েছে। ইংরেজীতে অ্যাকাউন্ট রাখা হবে। আর ধরুন, আপনার চাকরিও হল অনেক দিন, এখন নতুন লোককে জায়গা দিন। কেমন? লোকও এসে গেছে আমাদের।—বলিয়া কোম্পানির চিঠি ও পদত্যাগ-পত্রখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, এই চিঠিখানায় সই ক'রে দিন। হাঁা, কোম্পানি আপনাকে তিন মাসের মাইনে বোনাস দিয়েছে।

খাজাঞ্চি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ম্যানেজার তাহার হাতে কলম তুলিয়া দিয়া বলিলেন, এইখানটায় সই ক'রে দিন। হাঁা, তারিখ দিন -তারিখ।

চার্জও দেওয়া হইয়া গেল। খাজাঞ্চি দেখাইয়া দিল, তিন হাজার বাইশ টাকা, একটি আধুলি, একটি দু-আনি, কাগজে-মোড়া একটি পাই।

ম্যানেজার তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া বলিলেন, দুঃখ করবেন না খাজাঞ্চিবাবু। ধরুন, বয়সও অনেক হ'ল আপনার। আর আপনার যে রকম অনুরাগশীল মন, তাতে এই নিষ্ঠা নিয়ে ভগবানকে ডাকলে অনেক কাজ হবে আপনার।

খাজাঞ্চি বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা—

কর্মচারীরা কিন্তু এত সহজে বিদায় দিল না। তাহারা সভা করিল, বিদায়-ভোজ দিল, গলায় মালা পরাইয়া দিল, অনেকের চোখে জলও দেখা দিল।

পরদিন ভোরে কয়টা খালাসী খাজাঞ্চিবাবুর মাল মাথায় করিয়া স্টেশনে চলিয়াছিল। পিছনে পিছনে খাজাঞ্চিবাবু, তাহার চোখে সেই নূতন চশমা। সহসা খাজাঞ্চি বলিল, কই রে, এখনও সিটি দিলে না আজ এরা ?

খালাসী বলিল, এখনও তো সময় হয় নি বাবু, এই গাড়িটা যাবে, তবে তো !

খাজাঞ্চির মনে পড়িল, হাঁা, তাহাই তো বটে, সাড়ে ছয়টা তো এখনও বাজে নাই। সাড়ে ছয়টার ট্রেনেই তো সে যাইবে। খাজাঞ্চি একবার পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিল, কারখানার চিমনি হইতে গলগল করিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। সে চোখ ফিরাইয়া লইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল, ভগবান আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ হইল। কিন্তু কোথায় আকাশ! চশমা-আবরিত পরিষ্কার দৃষ্টির সম্মুখেও যে সেখানে শুধু ধোঁয়া, ধোঁয়া আর ধোঁয়া—ওই কারখানার চিমনির উদ্‌গিরিত ধোঁয়ার আড়ালে আকাশ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

টহলদার

টহলদার রামদাস বাউল দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়াছিল। কার্তিক মাসের শেষরাত্রি অবসানপ্রায়। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ম্লান হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর বুক ঘেষিয়া চারিদিকে ক্ষীণ কুয়াশা জাগিয়া উঠিতেছিল। হিমকণাবাহী বায়ুস্পর্শে রামদাসের নাক দিয়া জল ঝরিতে আরম্ভ করিল। রামদাসের আজ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। পাশের সমৃদ্ধিশালী গ্রামখানিতে সে টহল দিয়া থাকে। সূর্যোদয়ের পূর্বেই টহল দেওয়া শেষ করাই নিয়ম। কিন্তু আজ বোধ হয় আর তাহা হয় না। মাথার নামাবলী পাগড়িটা আরও একটু টানিয়া কান দুইটি ঢাকিয়া লইয়া সে পদক্ষেপের গতি আরও একটু দ্রুততর করিল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লাল কাঁকরের রাস্তাখানি বিসর্পিত গতিতে চলিয়া গিয়াছে। রামদাসের সম্মুখেই প্রকাণ্ড দল্‌দলিব জলাটা আসিয়া পড়িল। এই দল্‌দলির সাঁকোটা পার হইয়া সম্মুখেই অনতিদূবে চণ্ডীদেবীর মন্দির ও আশ্রম।

ওইখান হইতেই রামনগরের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। রামদাস গুন-গুন করিয়া আজিকার জন্য বাছা গানখানি ভাজিতে আরম্ভ করিল। দল্‌দলিব সাঁকোর পরেই খানিকটা চড়াই। দুই পাশে এখানকার আদি বড়লোক পরামাণিকদের বহুকালের প্রাচীন আমবাগান। অযত্নে বাগানখানা এখন ঘন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। বাউল এইবার আঙুলে করতালের দড়ি জড়াইতে শুরু করিল। জঙ্গলটা পার হইয়াই রামদাস চমকিয়া বলিয়া উঠিল, কে?

সম্মুখে হাত তিনেক দূরেই একটা লোক একটা বোঝাই বস্তা মাথায় কবিয়া হনহন করিয়া চলিয়া আসিতেছিল। মানুষের সাড়া পাইয়া লোকটাও চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সে কেবল মুহূর্তের জন্য। পর-মুহূর্তেই সে মাথার বস্তাটা সজোরে রামদাসকে লক্ষ্য করিয়া আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পালাইল। রামদাস তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পূর্বেই সরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বস্তাটা সশব্দে তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া কাটিয়া গিয়া একরাশ ধান চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অল্প একটু হাসিয়া রামদাস বলিল, শশী, না, কে রে?

শশী দাস—এ অঞ্চলের পাকা ধান চোর। শশী তখন পাশের আমবনে ঘনান্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। বস্তাটার দিকে আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বাউল আকাশের দিকে চাহিল। তারপর আপন মনেই বলিল, শশীর তো ভুল হবার কথা নয়। তাই তো, তবে কি আমারই ভুল নাকি? হু, রাত তো মনে হচ্ছে এখনও খানিক রয়েছে।

আবার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, কই, পাখি তো একবারও ডাকল না! ভুক্কোতারা যে এই উঠেছে। ওঃ, কাকজ্যোৎস্না করেছে দেখছি!

আপন মনেই সে আবার একটু হাসিল। এমন ভ্রম তাহার মধ্যে মধ্যে হইয়া যায়। সেদিন সে চণ্ডীদেবার দরবারে গিয়া প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে। আজও সে পাকা রাস্তা ছাড়িয়া দেবামন্দিরের দিকে চলিল।

পাখির কলরবের সঙ্গে সঙ্গে রামদাসের হাতের করতাল বাজিয়া উঠিল। গ্রামের পথে পথে মোটা ভরাট গলায় প্রভাতী সুরে গান ধ্বনিয়া উঠিল।—

নিশি হ'ল ভোর
উঠরে মাখন চোর।
বলাই রতন ডা—কে, নিশি হ'ল ভো - র।

গ্রাম তখনও সুপ্ত। পথচারী কুকুরগুলা শেষ রাত্রির শীতে কুণ্ডলী পাকাইয়া গৃহস্থবাড়ির দুয়াবে পড়িয়া আছে। টহলদারকে দেখিয়া তাহারা চিৎকার করে না। তাহাদের সহিত বাউলের পরিচয় হইয়া গিয়াছে। বাঁড়ুজ্জেদের দুর্গাবাড়ির সম্মুখে বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির পিসীমার সহিত দেখা হইল। প্রৌঢ়া জলের ঘটিটা হাতে নিয়মমত দুর্গাদেবার দুয়ার মার্জনা করিতেছিলেন। আরও খানিকটা ছাড়াইয়া সরকার পাড়ায় সরকার বাড়ির দৌহিত্র বৃদ্ধ হরিপদ মুখুজ্জের সহিত দেখা হয়। মুখুজ্জে কানে পৈতা জড়াইয়া কোঁচার খুঁটটি গায়ে, গাড়ু হাতে চলিয়াছিলেন। বড়বাবুদের হিন্দুস্থানী চাপরাশীটার নাকের ডাক এই ভোর-বেলাতেই প্রগাঢ় হইয়া উঠে। বারান্দার খিলানে খিলানে পায়রাগুলি কূজন শুরু করিয়া দিয়াছে। নিত্যকার মত সহায়স্বজনহীনা বেনেবুড়া ডোবার ঘাটে বসিয়া ভগবানের চোখের মাথা খাইতেছিল। ছয়আনির মুখুজ্জেদের শঙ্কর ভোরে গলা সাধিতেছিল - আ-আ-আ-আরে হা। ছেলেটির কণ্ঠস্বর ভাল। টোলের ছাত্রদের কয়জন চিৎকার করিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে - অস্তি, অস্তি, কশ্চিৎ, কশ্চিৎ। ছোট ছেলেটির উৎসাহ বেশি, তাহারই কণ্ঠস্বর সকলের চেয়ে উচ্চ। সে পড়িতেছিল 'ব্যাকরণ-কৌমুদী দধি দধিনী দধিনী। বাবুদের ঠাকুরবাড়িতে মঙ্গলারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছিল ঝন-ঝন-ঝন- ঢং-ঢং।

রামদাস বাবাজীরা রামনগরে পুরুষানুক্রমিক টহলদার। রামদাস নিজে অকৃতদার বাউল। তাহার অন্তে তাহার পদ পাইবে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র। এই টহলদারিতে রামদাসের চলিয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়িতে মাসিক একটা করিয়া সিধার বন্দোবস্ত আছে। পাঁচ পাই অর্থাৎ আড়াই সের চাল, পোয়াটাক ডাল, কিছু তরকারি, কিছু মসলা ইহাই অকৃতদার বাউলের পক্ষে যথেষ্ট।

সমস্ত দিন সে ঘরে বসিয়া আপন আখড়াটির পরিচর্যা করে - বেড়া বাঁধে, ফুলের গাছের গোড়ায় মাটি খোঁড়ে, জল দেয়। দরজীর দোকানের ছিটের টুকরা কুড়াইয়া আনিয়া আলখাল্লার গায়ে বসাইয়া সেটিকে বিচিত্রিত করিয়া তুলে।

আজ রামদাস একতারাটি মেরামত করিতে বসিয়াছিল। পুরাতন যন্ত্রটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বংশদণ্ডটির মাথায় গাঁটটিতেই একটি ফাট ধরিয়াছে — সেই ফাটটিতে সে সরু সুতা দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধন দিতেছিল। বাহিরে বেড়ার ধারে খুটখাট শব্দ শুনিয়া বাউল সেই দিকে চাহিল। কে একটা লোক যেন বেড়ার ও-পাশে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া মনে হইল। রামদাস প্রশ্ন করিল, কে ? ইতস্তত করিয়া লোকটি বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল, আমি।

বাউল হাসিয়া বলিল, সবাই তো আমি বাবা। কে তুমি ?

এবার বাহিরে আগড় ঠেলিয়া লোকটি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, আমি শশী গো বাবাজী। বলিয়া ভক্তি সহকারে এক প্রণাম করিয়া শশী সম্মুখে উবু হইয়া বসিল।

বাউল হাসিয়া বলিল, কি খবর রে শশী ?

শশী কোনও কথা কহিল না। নতমস্তকে নীরবে সে শুধু আঙুল দিয়া মাটিতে দাগ টানিতেছিল।

রামদাস বলিল, বস্তাটা যদি চাপা পড়তাম শশী, তা হ'লে—ছাড়্ ছাড়্, পা ছাড়্ পা ছাড়্।

শশী উবুড় হইয়া পড়িয়া বাবাজীর পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে বলিল, এইবারকার মত, হেই বাবাজী, এইবার শুধু। আর যদি কখনও দেখতে পাও, কি ধরতে পার, এই আমি কান মলছি, এমন অসাবধান হয়ে—

বাউল হাসিয়া বলিল, তবু তুই বলবি না যে, আর চুরি করব না।

সঙ্গে সঙ্গে শশী উত্তর দিল, চুরি তো আমি আর করি না।

রামদাস বিরক্ত হইয়া কহিল, কাল সেটা তবে কি শুনি ?

মাথা চুলকাইয়া শশী বলিল, উটো কাল কেমন হয়ে গেল গো! এক বেটা কাবুলের কাছে একখানা কাপড় নিয়েছিলাম উ বছর। আর-বছর বেটাকে দেখাই দেই নাই। ই বছর বেটা আর কিছুতেই ছাড়ছে না কিনা, তাই বলি—

কথাটা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াই শশী নীরব হইল। বাউল কোন কথা কহিল না। সে নীরবে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর শশী এ নীরবতা ভঙ্গ করিল, মৃদুস্বরে থামিয়া থামিয়া বলিল, হাতে টাকাকড়িও ছিল না, ধারও কোথাও পেলাম না।

রামদাস এ কথারও কোন জবাব দিল না। শশী আবার আরম্ভ করিল, কাব্‌লদের কাছে জিনিস লেয়! ছি-ছি-ছি! বেটারা যা-তা ব'লে গাল দেয় গো। বাড়িতে বসে আর ওঠে না।

রামদাস বলিল, কেনে মিছে কথাগুলো বলছিস শশী? এখন তো কাব্‌লদের টাকা আদায়ের সময় নয়। টাকা আদায় করে মাঘ মাসে।

শশী বলিল, ই যি উ বছরের টাকা গো। আর বছর যে বেটাকে ফাঁকি দিয়েছিলাম।

তারপর হাত দুইটি জোড় করিয়া আকাশের দিকে তুলিয়া সে বলিল, মা-চণ্ডীর দিব্যি—

থাম্, আর দিব্যি করিস না বাপু! রামদাস তাহাকে থামাইয়া দিয়া আর একটা নূতন সুতা লইয়া বাঁধন দিতে আরম্ভ করিল। সুতার প্রান্তটি ধরিয়া টান দিতে দিতে সে আক্ষেপের স্বরে বলিল, হুঁ, মা-চণ্ডীর ধানের গোলাই তুই ফাঁক ক'রে দিলি, তা—

তাহাকে বাধা দিয়া শশী বলিয়া উঠিল, মাইরি বলছি, কালীর দিব্যি, শালগেরাম ছুঁয়ে আমি বলতে পারি বাবাজী, সে আমি নই। তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, এই দেখ বাবাজী, সি তোমার ওই গোঁসাই বেটার কাজ। রেতে রেতে গাড়িতে ক'রে ধান বোঝাই ক'রে আমুদপুরে বেচে এসেছে। আমি গাড়িতে চাপিয়ে দিয়েছি। বল তো গোঁসাইয়ের সঙ্গে মোকাবিলা ক'রে দিতে পারি। আমাকে বেটা একটা পয়সাও দেয় নাই।

রামদাস অবাক হইয়া শশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শশী বলিল, ওগো, মাছ খায় সব পাখিতেই, নাম হয় কেবল মাছরাঙার। বাউল তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, এতক্ষণে সে বলিল, তুই মহা পাষণ্ড শশী, সাধু-সন্নেসীর নামে অপবাদ দিতেও তোর লজ্জা হয় না!

শশী এবার ধীরে ধীরে বলিল, আমি চোর, আমার কথা কেউ বিশ্বেস করে না, কিন্তুক আমি মিছে কথা বলি নাই বাবাজী। তাহার কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ একটা সবিনয় আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল। রামদাস এবার কোনও প্রতিবাদ করিতে পারিল না, নীরবে নতমুখে আপনার কাজই করিয়া গেল। শশীও নতমুখে বসিয়া ছিল, পূর্বের কণ্ঠস্বরেই সে আবার বলিল, আমার একটি বেটা, বাবাজী, যদি মিছে কথা ব'লে থাকি বাবাজী—

বাধা দিয়া বাবাজী মিষ্টস্বরে বলিল, থাক্ শশী, দিব্যি করিস নে, থাক্।

শশী নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। বাঁধন পরাইতে পরাইতে এক সময় মুখ

তুলিয়া রামদাস ত্রস্তস্বরে বলিয়া উঠিল, তুই কাঁদছিস শশী ? না না, কাঁদিস না, কাঁদিস না। আমি তোকে কিছু বলি নাই।

শশী মুখ তুলিল। তাহার চোখে জল ছিল না, বরং একটু হাসিয়াই বলিল, না বাবাজী, কেঁদে আর কি করব বল ? কান্না আমার আর আসে না, কিন্তুক দুঃখ হয়। যেখানে যত চুরি হবে, সব যাবে এই শশের ঘাড় দিয়ে। কিন্তুক বল দেখি বাবাজী, চোর কি এ চাকলায় শশে ছাড়া কেউ নাই ?

এ কথার উত্তর বাউল দিতে পারিল না, তাহার হাতের কাজও বন্ধ হইয়া গেল। অকারণে সে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আক্ষেপপূর্ণ স্বরে শশী বলিল, চুরি করি বাবাজী, স্বভাবে করি। স্বভাবে হয় কি জান, থমথমে নিষুত রাতে চেতন হ'লেই কে যেন ঘাড়ে ধ'রে টেনে বার ক'রে নিয়ে যায়। কিন্তুক সে আর ক'দিন ? অভাবেই চুরি করতে হয় বেশি। কোথাও চুরি হ'লেই আমাকে নিয়ে যায় ধ'রে। তারপর উকিল, মোক্তার, মামলা-খরচ এ আসে কোথা থেকে বল দেখি ? ভিক্ষে করলে জোটে না, মজুর খেটেও কুলোয় না।

বাউল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতবাক হইয়া বসিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে শশী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তামুক-টামুক থাকে তো দাও কেনে বাবাজি, একবার সাজি।

রামদাস এবার যেন সজাগ হইয়া উঠিয়া বলিল, সাজ্ তো, সাজ্ তো বাবা। ওই দেখ্, ওই কুলুঙ্গিতে তামাক আছে, ওই কোণে বাঁশের চোঙায় চকমকি শোলা কয়লা সব পাবি। কল্কে—কল্কেটা আবার কোথা গেল ? এই দিকের কুলুঙ্গিটে দেখ্ দেখি - হ্যাঁ।

পাওয়া গেল সবই। শশী তামাক সাজিয়া কয় টান টানিয়া কল্কেটি বাবাজীর নিকটে নামাইয়া দিল। পাশের ঝুলি হইতে ছোট একটা হুঁকা বাহির করিয়া রামদাস কলিকাটি তুলিয়া লইল। উভয়েই নীরব। গাছের মাথায় বসিয়া একটা কাক কলকল করিয়া ডাকিতে ডাকিতে ডালে ঠোঁট ঘষিতেছিল। একান্ত অকারণে শশী সেটাকে তাড়না করিয়া বলিল, হুস ধাঃ।

কাকটা উড়িয়া গেল। হাতের ঢেলাটা লইয়া শশী আবার নতমুখে মাটিতে ঠুকিতে লাগিল।

বাবাজী বলিল, শশী !

নতমুখেই শশী বলিল, উ ?

কিছু বলছিস আমাকে ? কিছু ভয় নাই রে তোর, আমি নিজে হতে কাউকে কিছু বলব না।

জোড়হাতে শশী বলিল, না বাবাজী, জিজ্ঞেস করলেও এবারকার মত, হেই বাবাজী, রক্ষে তোমাকে করতেই হবে।

বাবাজী চিন্তায় পড়িল। হতভাগ্যের উপর করুণাও তাহার হইতেছিল, কিন্তু মিথ্যা সে কেমন করিয়া বলিবে? বাবাজী শুষ্ককণ্ঠে কহিল, তা কেমন ক'রে হবে শশী? মিছে কথা—

বাধা দিয়া শশী বলিল, মিছে কথা বলতে তো বলছি না আমি। আমি চুরি করি নাই—ই কথা তুমি কেনে বলবে? তুমি বলবে, আমি কিছু জানি না।

রামদাস যুক্তি শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। শশী ম্লানমুখে মিনতি করিয়া বলিল, জেল হ'লে মেয়েছেলেগুলোর দুর্দ্দশার আর সীমে থাকে না বাবাজী। রোগা ছেলেটা হয়তো এবার ম'রেই যাবে।

বাবাজী বহুক্ষণ পর শশীর মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, ভাবিস না শশী, তোর কোনও ভয় নাই।

শশী এইবার মুখর হইয়া উঠিল, বলিল, আর এমন কম্ম—এই দেখ, কান মলছি আমি।

বাউল হাসিতে লাগিল। শশী বলিল, দেখো তুমি, আর যদি কখনও দেখতে পাও—তখন ব'লো।

বাহির হইতে কে সাড়া দিল, বাবাজী রইছ নাকি?

শশী আর দাঁড়াইল না, একটি প্রণাম করিয়া ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল।

গোঁসাইদের বাড়ির ছেলে চুলওয়ালা যতীন ভিতরে আসিয়া বলিল, ও-বেটা কি করতে এসেছিল বাবাজী? ও-বেটা চোরের সঙ্গে আবার কেন?

বাবাজী হাসিয়া বলিল, গিয়েছিল কোথা, তাই পথে এখানে ঢুকে বলে—একটান তামুক খাব।

তারপর কলিকাটি আগাইয়া দিয়া বলিল, লাও, তামুক খাও।

যতীন বলিল, একটি কাজে এসেছিলাম বাবাজী। আমাদের যাত্রার দলের বায়না আছে দু রাত। গাইয়ে বেটা কোথা কোন্ দলে চ'লে গেইছে—ঠিকের লোক তো। তা তোমাকে খানকতক গান গেয়ে দিতে হবে বাপু। তোমার নিজের জানা গান, যা হয়।

যতীন গ্রামের যাত্রার দলের পাণ্ডা। বাবাজী হাসিয়া বলিল, তা, দোব। কিন্তু ভাই, ফিরে আসা চলবে তো? আমার আবার টহল আছে।

দিন আট-নয় পর।

রামদাস উঠানে বসিয়া সুর করিয়া 'চরিতামৃত' পড়িতেছিল—

চৈতন্যচরিতামৃত সুধাব্ধি সমান।

তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান॥

শশী আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। তাহার হাতে একটি নূতন একতারা।

বাবাজী হাসিয়া বলিল, কি সংবাদ শশিভূষণ?

শশী যন্ত্রটি সম্মুখে নামাইয়া দিল। যন্ত্রটি তুলিয়া লইয়া বেশ করিয়া দেখিয়া বাউল সপ্রশংস স্বরে বলিল, বা-বা-বাঃ, এ যে চমৎকার হয়েছে রে, আঁা! বাঃ! কে করলে? তুই?

হাসিতে শশীর মুখ ভরিয়া গেল, সে বলিল, হাঁা, লাউয়ের খোলাটা বাড়িতেই ছিল, তাই বলি, ফেললাম তৈরি ক'রে। বাঁশের কাজ করেছি, আমি। আর লাউয়ের খোলায় উ সব করেছে আমার পরিবার।

বাবাজী তখনও যন্ত্রটি দেখিতেছিল, দেখিতে দেখিতেই সে বলিল, আঁা, এ যে খাসা লতাপাতার চক কাটা হয়েছে রে! বাঁশের গায়েও তো চক কাটা! বাঃ! এ যে ভারি সুন্দর হয়েছে রে?

শশী বলিল, তোমার লেগে এনেছি বাবাজী।

যন্ত্রের তারে একটি আঘাত দিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া বাউল বলিল, আওয়াজও হয়েছে ভারি মিঠে! বাঃ!

শশী হাসিমুখে বলিল, তামুক সাজি একবার?

বাবাজী যন্ত্রটি হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। শশী কলিকা আনিয়া দেখিল, বাবাজী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া আছে। দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া শশী দেখিল, দেখিবার বস্তু কোথাও কিছু নাই। সে ডাকিল, তামুক খাও বাবাজী।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাবাজী বলিল, শশী, কি দাম নিবি বল্ দেখি?

হাসিয়া শশী বলিল, দাম কিসের গো? তোমার লেগেই যে তৈরি করেছি আমি।

নতমুখে বাবাজী বলিল, তা তো আমি নিতে পারব না শশী।

শশী চমকিয়া উঠিল, অতি ব্যগ্র কাকুতি-ভরা স্বরে সে প্রশ্ন করিল, কেনে?

কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বাবাজী নতমুখেই উত্তর দিল, সে আমার ঘুষ নেওয়া হয় শশী, তোর পাপের ভাগ তো আমি নিতে পারব না।

শশীর মুখের হাসি পূর্বেই মিলাইয়া গিয়াছিল, এখন সে মুখে ম্লান বিষণ্ণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল। সে মাথাটি নত করিয়া বসিয়া রহিল। রামদাসও সেই নতমুখে বসিয়া ছিল। কলিকার তামাকটা নিঃশব্দে পুড়িতেছে। ক্ষীণ একটি

ধোঁয়ার শিখা কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছিল। কতক্ষণ এমনই নীরবে কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ শশী একতারাটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে বাবাজী ত্রস্তভাবে উঠিয়া দুয়ারে গিয়া ডাকিল, শশী শশী!

শশী বেশি দূর যায় নাই, সে ফিরিল। বাবাজী হাসিয়া বলিল, দিয়ে যা শশী, নিলাম ওটা আমি।

শশীর মুখে হাসি দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখে কয় ফোঁটা জল।

যন্ত্রটি লইয়া কিন্তু সমস্ত দিন রামদাসের মনে অশান্তির সীমা রহিল না। বার বার মনে হইল, শশীকে ফিরাইয়া দিলেই সে ভাল করিত। হয়তো দুঃখ উহার হইত, কিন্তু দুই চারি দিনেই সে তাহা ভুলিয়া যাইত। কিন্তু তাহার পক্ষে এ যে ভয়ানক বস্তু। পাপ দেহে প্রবেশ করিলে কি আর রক্ষা আছে! এ যন্ত্রটি লওয়াতে যে শশীর সেদিনের পাপেরই অংশ লওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনে মনে সে স্থির করিল, অপরাহ্ণে গিয়া শশীকে ওটি ফিরাইয়া দিয়া আসিবে। একবার সে যন্ত্রটির তারে আঘাত দিল। বড় মধুর স্বরে যন্ত্রটি সাড়া দিয়া উঠিল। আবার সে ঝঙ্কার তুলিল, আবার—আবার। দেখিতে দেখিতে বাউলের আখড়ায় দ্বিপ্রহরে গোষ্ঠবিহারের গান জমিয়া উঠিল। গানের স্বরের আকর্ষণে আখড়ায় লোক জমিয়া গিয়াছিল। গান শেষ হইলে যতীন বলিল, ভারি চমৎকার যন্ত্রটা হয়েছে তো বাবাজী, দেখি দেখি। এ যে আবার লতাপাতা-কাটা রইছে গো! বলেহার, বলেহার!

ছুতারদের ভূপতি যতীনের হাত হইতে যন্ত্রটি লইয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল, ওস্তাদ কারিগরের হাতের জিনিস। ইয়ের পরে বার্নিশ যদি দেওয়া হয় বুঝলে কিনা কি করবে তোমার দামী সেতার!

যতীন প্রশ্ন করিল, ই কোথা থেকে পেলে বাবাজী?

রামদাস উষ্ণ হইয়া উঠিল, বলিল, রাজারা মানিক কোথা পায় হে? যাও যাও, এখন সব বাড়ি যাও দেখি। আমার কাজকর্ম ঢের বাকি।

ভূপতির হাত ধরিয়া টানিয়া যতীন বলিল, আয় রে, আয়। বলে—'মাগ নাই ছেলে কাঁদে, তার দুঃখে গগন ফাটে' সেই বিত্তান্ত। কাজের তো আর পরিসীমে নাই।

রামদাস উঠিয়া যন্ত্রটি ঘরে রাখিতে গিয়া আর একবার সেটিতে আঘাত দিল। সত্যই আওয়াজটি বড় মিঠা। সে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, মিস্ত্রী, তোমাকে ভাই এইটুকু বার্নিশ আমাকে দিতে হবে।

কেহ কোন উত্তর দিল না। বাবাজী বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল, মিস্ত্রী, ভূপতি।

জনশূন্য জঙ্গল, ভূপতি চলিয়া গিয়াছে।

যন্ত্রটি আর রামদাসের ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ফিরাইয়া দিবার সঙ্কল্প সে কয়েকবারই করিয়াছে, কিন্তু কার্যে পরিণত করিবার সময় মনে হইয়াছে, আহা, শশী বেচারী মনে দারুণ আঘাত পাইবে। মনশ্চক্ষুর সম্মুখে শশীর ম্লান মুখ সত্যই ভাসিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মন বলিয়াছে, এটুকু তাহার মিথ্যা অজুহাত, এ তাহার লোভ।

এ দ্বন্দ্বের মধ্যেই সেদিন ভূপতি মিস্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। আত্মীয়ের মত হর্ষ প্রকাশ করিয়া হাসিয়া সে বলিল, কই বাবাজী, বার কর তোমার একতারা, বার্নিশ লাগিয়ে দেই।

ছোট একটি মাটির ভাঁড় বাহির করিয়া সে চাপিয়া বসিল। বাউল পরমানন্দে যন্ত্রটি বাহির করিয়া দিয়া পাশে বসিয়া বার্নিশ দেওয়া দেখিতে লাগিল। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে যন্ত্রটি বার্নিশের প্রলেপে সুমনোহর সুচিক্কণ হইয়া উঠিতেছিল। রামদাস মুগ্ধ হইয়া গেল, বলিল, বলিহারির জিনিস ভাই মিস্ত্রী! বা-বা-বাঃ!

অহঙ্কারস্ফীত কণ্ঠে ভূপতি বলিল, হু হুঁ, ভাল কাঠে বেশ পালিশ ক'রে যদি লাগানো যায়—বুঝলে কিনা- তো আয়নার মত মুখ দেখা যায়।

রামদাস অবিশ্বাস করিল না। নীরবে মুগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিয়া লইল। ভূপতি বলিল, এসব জিনিস এখানে—বুঝলে কিনা—পাবে কোথা? কাল ডাক ছিল বড়বাবুদের বাড়িতে। বাবুদের কাঠের জিনিস সব রঙ হচ্ছে। রঙ করতে করতে মনে হ'ল তোমার কথা—বুঝলে কিনা। ভাবলাম, বলি, নিয়ে যাই একটুকুন, বাবাজী সেদিন বলেছিল। তা - বুঝলে কিনা—নিয়ে আসা আবার এক হাঙ্গামা! গায়ে কাপড় ঢেকে কোন রকমে বুঝলে কিনা। সে হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

বাউলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, চুরি ক'রে!

ভূপতি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর বলিল, নেহাত অল্পপ্রাণী তুমি। ইয়েকে আবার চুরি করা বলে নাকি?

রামদাস বিবর্ণ মুখেই বসিয়া রহিল, কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না। ভূপতি বলিল, ইয়ের দাম আর কত—বড় জোর একটা পয়সা। একটা পয়সা আবার চুরি করা হয় নাকি? আমরা তো তা হ'লে ডাকাত! এই দেখ, সামান্য জিনিস, বড়লোকের প'ড়ে নষ্ট হবে—বুঝলে কিনা—কিন্তু চাইতে যাও

দেখি, কখনও বেটারা দেবে না। সে নেবে না তো কি ?

ভূপতি চলিয়া গেল। বার্নিশটা বেশ শুকাইয়া গেলে রামদাস সযত্নে যন্ত্রটিকে তুলিয়া রাখিল। বড় সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু শশীকে ফিরাইয়া দেওয়া এখন আর অসম্ভব। রঙ দিবার পর ফিরাইয়া দিতে যাইবেই বা সে কি বলিয়া ? আর দোষই বা কি ? সে তো তাহাকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল।

সহসা বাউলকে যেন কেমন ভূলে পাইয়া বসিল। প্রত্যূষের বহু পূর্বেই প্রায় তাহাব এখন ঘুম ভাঙিয়া যায়। সেও টহল দিতে বাহির হইয়া পড়ে। ভ্রম বুঝিতে পারিলেও সে আর দেবা-মন্দিরে অপেক্ষা করে না। সে যেন তাহার ভাল লাগে না। শীতের রাত্রে গাঢ় সুপ্তিমগ্ন গ্রামখানির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, এদিক ওদিক ঘুরিয়া কোথাও খানিকটা বসিয়া সে রাত্রিটুকু কাটাইয়া দেয়। নির্জন গাঢ রাত্রির একটা মোহ যেন তাহাকে আকর্ষণ করে। এক-একবাব অকস্মাৎ কেমন চমক ভাঙিয়া যায়। তখন সে গাঢতর অন্ধকারে একটা গলির দিকে অগ্রসর হইয়া আপন মনে হাসিতে হাসিতে বলে, এবার একবার শশীর দেখা পেলে হয়, এবার কিন্তু আর ক্ষমা করব না।

সেদিন একটি অন্ধকার রাত্রি। শুক্লপক্ষের চাঁদ কখন অস্ত গিয়াছে। আকাশেব পূর্ব-দক্ষিণ কোণে সবে শুকতারা দেখা গিয়াছে, পূর্ণ জ্যোতি এখনও ফুটিয়া উঠে নাই। রাত্রি যত শেষ হইয়া আসিবে, তত সেটি উজ্জ্বল ভাস্বর হইয়া উঠিবে। আবাব প্রত্যূষের সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত মিলাইয়া যাইবে। রামদাস গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। চাটুজ্জেদের খিড়কির ঘাটে সে পা ধুইতে নামিল। ধুইতে ধুইতে তাহার কি খেয়াল হইল কে জানে, ঘাটময় সে পা বুলাইয়া ফিরিল। হঠাৎ হেঁট হইয়া হাতে করিয়া তুলিল একটা মাটির ভাড। ঘৃণায় বিরক্তিতে সেটা ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল। আপন মনেই সে বলিল, ধোৎ, আমি বলি, ঘাটে কে গেলাস-টেলাস ধোৎ।

চাটুজ্জেদের গলিটা শেষ হইয়াছে গ্রামের 'কুলি'-পথে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই পথের দুই পাশে সারি সারি ভদ্র গৃহস্থদের বাড়ি। মুখুজ্জেদের বাড়ি পার হইয়া আতরগড়। তাহার পরই পাশাপাশি বাঁড়ুজ্জেদের দুই তরফের বৈঠকখানা। বড় তরফের বৈঠকখানাটার দুই পাশে দুইটা বাঁধানো খোলা বারান্দা, মধ্যস্থলে চওড়া সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। খোলা বারান্দার উপরে কতকগুলা কুকুর উচ্ছিষ্ট পাতা লইয়া কলহ করিতেছিল। বাউল থমকিয়া দাঁড়াইল। এ কি, বৈঠকখানার দরজাও যে খোলা হাঁ-হাঁ করিতেছে! গোটা দুই সিঁড়ি উপরে উঠিয়া বাউল বুঝিল, রাত্রে এখানে খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদ

হইয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সে নামিয়া আসিল। অকস্মাৎ মনে হইল, বাবুদের মজলিসে কি একটা-আধটা বিড়িও পড়িয়া নাই ? একটু ইতস্তত করিয়া সে উপরে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

ফরাসের উপরে তখনও একটা লণ্ঠন মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। ধোঁয়ায় লণ্ঠনের চিমনিটা কালো হইয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া ভিতরের আলোকশিখাটাকে রক্তাভ দেখাইতেছিল। ম্লান আলোকে ফরাশখানা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। উর্ধ্বদিকে অস্পষ্ট আলোক ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া প্রগাঢ় অন্ধকার। ফরাসের উপর এক প্যাকেট তাস ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। ওদিকে একটা পাশার ছক, মধ্যস্থলে একটা গড়গড়া, এক কোণে একটা হারমোনিয়াম, তাহারই পাশে একটা কালো রঙের বাক্স পড়িয়া। রামদাস চিনিল, ওটা বেহালার বাক্স। নির্জন অন্ধকারের মধ্যে বেহালাটাকে একবার তাহার দেখিবার ইচ্ছা হইল। ধীরে ধীরে সে গিয়া বেহালাটাকে বাহির করিয়া বসিল। অপরিস্ফুট আলোক-সম্পাতেও যন্ত্রটির বার্নিশ ঝকমক করিয়া উঠিল। বাউলের হাতের অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব তাহার মধ্যে কাঁপিতেছিল। অকস্মাৎ রামদাস উঠিয়া রশ্মিটুকুকে নিবাইয়া দিল। নির্জন ঘরখানার সব কিছু এক মুহূর্তে প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অবলুপ্ত হইয়া গেল। সে অন্ধকারে রামদাস নিজেকেও দেখিতে পাইতেছিল না।

বৈঠকখানার কার্নিসে কয়টা পারাবত গুঞ্জন করিয়া উঠিল। বাউল দ্রুত বৈঠকখানা হইতে নামিয়া আসিল। অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। বৈঠক-খানার শেষ সিঁড়িতে নামিয়া বাউল চমকিয়া বলিয়া উঠিল, কে ? সঙ্গে সঙ্গে তাহার আলখাল্লার ভিতর হইতে বেহালাটা পাকা সিঁড়ির উপর সশব্দে পড়িয়া গেল। রাস্তাটার ও-পাশের বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষিয়া কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল। রামদাস ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। লোকটি কোন উত্তর দিল না, তেমনই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রামদাস আবার কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কে ?

সে উত্তর দিল না। বাউল কয় পদ আগাইয়া আসিতেই লোকটিও নড়িল, শুধু নড়িল নয় দীর্ঘ মানুষটি আকারে যেন ছোট হইয়া আসিল।

রামদাস এতক্ষণে বুঝিল, এ তাহারই ছায়া।

পূর্বগগনে শুকতারা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছিল। রামদাস ছুটিয়া পলাইল। চোর, চোর সে চোর ? সদর রাস্তা দিয়া চলিতে আর তাহার সাহস ছিল না। পাশের একটা গলির মধ্যে সে মোড় ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে কে তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বাউল আবার চমকিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, কে ?

কেহ উত্তর দিল না। রামদাস দেখিল, এ তাহারই সেই ছায়া।

ট্যারা

এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এমন বিশেষত্বহীন অবজ্ঞাত দৃশ্যপটের সংখ্যার হিসাব নাই। বর্ণ নাই, বৈচিত্র্য নাই, সমারোহ নাই, নিতান্ত নগণ্য পার্শ্বদৃশ্য। কিন্তু এগুলিকে বাদ দেওয়া চলে না। বাদ দিলে বিরাট নাটক হইবে অসম্পূর্ণ। তবু রঙ্গালয়ের ইতিকথার মধ্যে ইহাদের উল্লেখ থাকে না।

দরিদ্র পল্লীর মধ্যে একখানি কুঁড়েঘর। সেই পটভূমির সম্মুখে ছোট একটি পরিবার, নয়ানের বুড়া মা, নয়ান, নয়ানের স্ত্রী আর নয়ানের নয়-দশ বছরের ছোট ছেলে ট্যারাকে দেখা যায়। এই পরিবারটির সঙ্গে গ্রামের ইতিহাসের নগণ্য একটু যোগ আছে। বুড়ী নয়ানের মা গ্রামের গৃহস্থ-পরিবারের আত্মীয়তার বার্তা বহন করিয়া লইয়া যায় গ্রাম-গ্রামান্তরের আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ি, আবার সেখানকার বার্তা বহন করিয়া আনে এখানে। বুড়ীর মত খুঁটিনাটি সমস্ত সংবাদ পরিপাটি করিয়া আদান-প্রদান করিতে কেহ পারে না।

নয়ান খাটে দিনমজুর। নয়ানের বউ, সেও গৃহস্থ-বাড়িতে খাটে - বাসন মাজে, ক্ষারে সিদ্ধ কাপড় কাচে, ঢেঁকিতে ধান ভানে। ছোট্ট ট্যারা অদূরস্থ গাঁজা-আফিমের দোকানের সম্মুখে সারাটা দিনমান গুলিদাঁড় খেলে। সঙ্গী না থাকিলে সে একাই দুইজনের ভূমিকা অভিনয় করে, গুলিটাকে পিটাইয়া নিজের দাঁড় লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়ে; আবার দাঁড় হাতে গুলি পিটাইয়া দাঁড় মাপিয়া চলে—বালি তুলি তাল তম্পা দেক নক্কা—

ট্যারা প্রকৃতির খেয়ালের সৃষ্টি। একটা চোখ ট্যারা আর অতি ক্ষুদ্র, দেখিয়া মনে হয় কানা। তাহার উপর আছে জিহ্বার জড়তা।

কত গৃহস্থবধূ ট্যারাকে দেখিয়া করুণা করিয়া নয়ানের বউকে বলে, আহা বাউরী-বউ, ছেলেটি তোর কানা!

ক্ষুদ্র চোখটা যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া জড়-জিহ্বায় ট্যারা বলে, না গো, ডেক—ডেকটে—পেছি আমি।

অকস্মাৎ জীবনে আসিল একটা উৎসাহপূর্ণ দৃশ্য।

সেদিন প্রভাতে তখন রজনীর কালো পট ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছিল, নয়ানের মায়ের বুকফাটা কান্নার সহিত দিবসের অভিনয় শুরু হইল। নয়ান গিয়াছিল কুটুম্ববাড়ি। সেখান হইতে কলেরা হইয়া ফিরিয়াছিল রাত্রে। প্রত্যুষে তাহার ভূমিকা শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সন্ধ্যায় প্রস্থান করিল নয়ানের

বউ। পরদিন সন্ধ্যায় গেল বুড়ী নয়ানের মা। পুরাতন পটভূমির সম্মুখে সংক্রামতার সকল প্রকোপ ব্যর্থ করিয়া ছোট্ট হাবা ট্যারা যে শুধু কেমন করিয়া রহিয়া গেল, কে জানে !

ট্যারার জীবনে পশ্চাতের পটভূমির পরিধি বাড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র ঘরখানি ভাঙে নাই। কিন্তু সে ঘর মমতা করিয়া কথা কয় না, আহার দেয় না, সে শুধু দেয় স্মৃতিতে পীড়া। ট্যারা ঘর ছাড়িয়া গ্রাম্য পথখানির উপর আসিয়া দাঁড়াইল। গাঁজার দোকানটির সম্মুখেই সে আর গুলিদাঁড খেলে না। গুলি পিটাইয়া পিটাইয়া সম্মুখ দিকেই চলে, আর মাপে, তাল তম্পা দেক নক্কা—

যখনই প্রয়োজন অনুভব করে, তখনই সম্মুখের গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া বলে, থাক্রুন !

কে রে ?

হাসিমুখে ট্যারা বলে, ত্যারা গো আমি। সেই যে—মা আমার কাদ করত। আঁচলে মুড়ি লইয়া চিবাইতে চিবাইতে আবার খেলিয়া চলে। দ্বিপ্রহর পার হইলেই গ্রাম-প্রান্তের সেবায়তন হইতে ভোগের ঘণ্টা বাজে। ট্যারা যেখানে থাক্, ছুটিতে ছুটিতে গিয়া হাজির হইয়া এক পাশে পাতা পাড়িয়া বসিয়া যায়।

স্থানটি হিন্দুর খ্যাতনামা একটি তীর্থস্থল, একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ। অট্টহাসে দেবী ফুল্লরা, বিশ্বেশ ভৈরব বিরাজমান। গদিয়ান মহান্ত পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু, অনাবৃত বিশাল দেহ, বাহুতে পঞ্জরে কয়টা ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। এগুলি যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। তিনি পূর্বে ছিলেন সৈনিক, এখন লইয়াছেন সন্ন্যাস।

এই স্থানটির সহিত পরিচয় ট্যারার পূর্ব হইতেই ছিল। কতদিন নয়ানের মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে প্রসাদ খাইয়া গিয়াছে।

সেদিন সন্ন্যাসী বলিলেন, আরে, তুমি রোজ রোজ আসো ! তুমি কে রে ?

ট্যারা ঘাড় বাঁকাইয়া ছোট চোখটি পিটপিট করিয়া বলিল, আমি ত্যারা গো গোঁছাই বাবা।

দেবীর পুরোহিত ভূমিবৃত্তিভোগী স্থানীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্বল্প হাস্য-সহকারে বলিলেন, মায়ের দরবারে প্রসাদ পাবার যোগ্য পাত্র বাবা অনাথ। নয়ানের মার নাতি, নয়ানের ছেলে।

সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, আ-হা হা-হা বাচ্চা রে ! 'আদার বুঢ়ী' 'পাথর-

ঢিপি'র বিচার নেহি কোনো।

জঙ্গলের মধ্যে দেবী বিরাজিতা, তাই আদর করিয়া সন্ন্যাসী বলেন, বেটী আদার বুঢ়ী। আর পাষাণময়ী দেবী তাই নাম পাথর-ঢিপি। তারপর সন্ন্যাসী ট্যারাকে বলিলেন, তুমি থাক হিঁয়া, এ বেটা। থোড়াথুড়ি কাম করবি, মায়ীর পরসাদ পাবি, কাপডভি মিলবে। বুঝলি, এ বাচ্চা ?

ট্যারা ছোট চোখটি উপরে তুলিয়া মিটমিট করিয়া চাহিয়া রহিল। পুরোহিত বুঝাইয়া বলিলেন, ওরে, গোঁসাই-বাবা বলছেন, তুই এখানেই থাক্। খেতে পাবি ছুবেলা, কাপড পাবি। গরু চরাতে পারবি ?

প্রবল উৎসাহে ট্যারা বলিল, হিঁ, হোৎ—ত্যা—ত্যা। ইদিকে - ইদিকে—থালার গরু। খুব পারব।

মুহূর্ত কয় পরেই আবার বলিয়া উঠিল, একতা দামা দিও গো আমাকে, বেথ গায়ে দোব আমি।

ট্যারার জীবনে পশ্চাতের পটভূমি আবার পরিবর্তিত হইয়া গেল। এবার পটভূমিতে রহিল, নিবিড বন-বেষ্টনীর শান্ত উদাসীনতার মধ্যে সুউচ্চ দেবভবন, নাটমন্দির, তাহার সম্মুখে পুষ্করিণী। মন্দিরের পিছনে আশ্রয়—মহান্তের পঞ্চমুণ্ডীর আসন, ভোগমন্দির, গোশালা। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মহান্তজী দেওয়ালে ঝুলানো ঘণ্টায় ঘা মারেন। ট্যারার ঘুম ভাঙিয়া যায়। সে চোখ রগড়াইতে রগডাইতে সন্ন্যাসীর অদূরে গিয়া দাঁডায়।

সন্ন্যাসী বলেন, জটা কোথা ? আসে নাই উ আভি ?

ছোট মাথাটি নাড়িয়া ট্যারা ইঙ্গিতে বলে, না।

তব তুমি যাও। গরু বাহার কর। লেফ টর্ন্, কুইক মার্চ—বাঁয়ে ঘুমো, জলদি যাও।

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে কুস্তির আখড়ায় চলিয়া যান। এ অভ্যাসটুকু এখনও তাঁহার যায় নাই।

ট্যারা কিন্তু গরু বাহির করিতে যায় না, চেষ্টা করে ওই ঘণ্টাটা বাজাইতে। উঁচুতে-ঝুলানো ঘণ্টাটার বেচারা নাগাল পায় না। অবশেষে আবিষ্কার করে সে একটা আঁকশি। সেই আঁকশিতে ঘণ্টার হাতুড়ির দড়িটা লাগাইয়া ঘণ্টাটি বাজায়, ঢং—ঢং—

শেষে আপন মনেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

প্রভাত হইতেই মহাপীঠে লোকসমাগম হয়। প্রথমেই আসে কয়জন নিত্য-যাত্রীস্থানীয়—ভক্ত লক্ষ্মীকান্ত, শূলপাণি, চন্দ্রনাথ। লক্ষ্মীকান্ত প্রবেশ করে—

মায়ী, রাজা করো, রাজা করো। আরে ভেইয়া ভোলা, চা চড়াও রে দাদা।

দেবীর সম্মুখ পর্যন্ত সে আর যায় না। বোধ করি, মনে মনেই মাকে প্রণতি জানাইয়া ভাণ্ডারঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া পড়ে।

ভোলা মহান্তের সেবা-শুশ্রূষা করে, দেবীর ভোগ রান্না করে।

সে জলন্ত ধুনিটাব উপর বড একটা মাটির হাঁড়িতে চায়ের জল চাপাইয়া দেয়।

লক্ষ্মীকান্ত হাঁকে, জটা, জটা, ওরে বেটা হারামজাদা, দুধ নিয়ে আয়।

অভ্যাসমত ঘাড় বাঁকাইয়া ট্যারা মানুষটিকে দেখিতেছিল। সে বলিল, উ এখন আথে নাই গো।

পকেট হইতে ছোট একটি আয়না বাহির করিয়া লক্ষ্মীকান্ত দেখিয়া দেখিয়া সিঁথির সম্মুখের পাকাচুল তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে বলিল, তুই বেটা আবার কোথা থেকে এলি? যত মড়া কি গাঙের ঘাটেই আসে রে বাবা!

ভোলানাথ হাসিয়া বলিল, উ হ'ল বাবার নতুন চেলা গো দাদা। তোমাদের গাঁয়ের নয়ানের মায়ের নাতি।

বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল, লে বাবা! বাউরী হ'ল গোঁসাইয়ের চেলা! লে বাবা! এ বেটা শেয়াল-মারা গোঁসাইকে নিয়ে তো জাত-ধরম কিছু রইল না! রাখালের হাতে শালগেরামের মরণ— শেয়াল-মারা বসল মহাপীঠের গদিতে! তাড়াও হে বেটাকে—আজই তাড়াও।

জঙ্গলের বাহির হইতে শব্দ আসিতেছিল—শঙ্করী শঙ্করী—হর হর বোম্— হর হর বোম্।

এবার আসিল শূলপাণি। কাপড়-গামছা মাদুরের উপর রাখিয়া শূলপাণি বলিল, কি হ'ল? কাকে তাড়াবে?

গোঁসাইকে। বেটা শেয়াল-মারা কি কখনও সাধু হয়? বেটা—

শূলপাণি চিৎকার করিয়া উঠিল, তুম কোন্ হ্যায়? গদিয়ান মহান্ত হ'ল সেবাইত জমিদারের অধীন। বাজে লোকের বলবার কোন অধিকার নাই।

শূলপাণি শতখণ্ডে বিভক্ত পুরাতন জমিদার-বংশের সন্তান।

লক্ষ্মীকান্তও চিৎকার করিয়া উঠিল, আমার মামাও জমিদার।

ব্যঙ্গ করিয়া শূলপাণি জবাব দিল, মামা তুমারা মামা হ্যায়। বাবা নাহি হ্যায়।

লাফ দিয়া লক্ষ্মীকান্ত উঠিয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মীকান্তকে ধরিয়া

বলিলেন, কি হ'ল ভাগ্‌না, কি হ'ল ভেইয়া ? মান যাও ভেইয়া, মান যাও।

লক্ষ্মীকান্ত সরোষে কহিতেছিল, মা কি জমিদারের দাসীবাঁদী রে বাপু ? সাধু-সন্ন্যাসীর আচার-বিচার খারাপ হ'লে বলতে পাবে না লোকে ?

মহান্ত বলিলেন, আলবত। রাগ মৎ ক'রো ভাই। বৈঠো, বৈঠো ভাগ্‌না। চা খাও। এহি লেও, গাঁজা তো খাও।

লক্ষ্মীকান্ত শান্ত হইল। সে ফিরিয়া গাঁজার পুরিয়াটা শূলপাণির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিল, কোনও কথা কহিল না। শূলপাণি গাঁজার সরঞ্জাম পাড়িয়া বসিল।

তারপর চা খাওয়া হয়, গাঁজার কলিকায় আগুন চড়ে।

গাঁজার কলিকাটা হাতে হাতে ফিরিতেছিল। ভোলানাথ শূলপাণিকে বলিল, দাও দাও, এই ভাই রাজাদাদা, নতুন চেলা বেটাকে এক দম দাও।

পুরা দমের ধোঁয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া নির্বিকারভাবে শূলপাণি কলিকাটা আগাইয়া দিল।

ছোট ট্যারা ছোট চোখটি উপরে তুলিয়া সবিস্ময়ে বাবুদের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। শূলপাণি একটু একটু ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ধূম-নিপীড়িত কণ্ঠে বলিল, নয়ানের মায়ের নাতি, নয় ? লে—লে বেটা—লে।

লক্ষ্মীকান্ত কলিকাটা হাত হইতে লইয়া কহিল, আর দিনকতক যাক দাদা। একটু বড় হোক। তারপর কত যোগাবে, যুগিও।

তারপর আরম্ভ হয় আলাপ।

লক্ষ্মীকান্ত আপন মনেই বলে, মায়ের গদি হ'ল সাধুপুরুষের গদি। সন্ন্যাসী কি হ'লেই হ'ল ?

ভোলানাথ শূলপাণিকে বলিতেছিল, কাল যে তোমাদের গাঁয়ের ইন্দ্র চৌধুরী একটা মাছ মেরেছে রাজাদাদা ! ইয়া ! শালা দশ-বারো সেরের তো কম নয় !

লক্ষ্মীকান্ত বলিতেছিল, সন্ন্যাসী মুখের কথা নয় বাবা। বাবা—ফলের পরখ শাঁসে রসে, সোনার পরখ হয় ক'ষে, সাপের পরখ তার বিষে, সন্ন্যাসীর পরখ হয় কিসে ?

শূলপাণি ভোলানাথের হাতটা ধরিয়া বলে, আজ তো এ আসছে, ও আসছে, সে আসছে, কিন্তু মায়ের সেবার বন্দোবস্ত কে করেছে শুনি ? তিনশো পঁয়ষট্টি বিঘে নাখরাজ ক'রে দিয়েছে কে ?

ভোলা এবার লক্ষ্মীকান্তকে বলে, সে মাছের রঙ কি দাদা—লাল-সেরাক !

লক্ষ্মীকান্ত বলিতেছিল, আরে বাবা, দাড়ি রাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে

তো সকল মুসলমানই সন্ন্যাসী। চুল রাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো সকল স্ত্রীলোকই সন্ন্যাসী। ফল খেলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো বনের সকল বানরই –

বলিতে বলিতে সে চট করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার নজরে পড়িল, দেবী-মন্দিরের সম্মুখে কয়জন যাত্রী এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। বোধহয় প্রণামীও দিয়া থাকিবে।

শূলপাণি বলে, শ্যামাচরণ রায় নবাব-দরবারে ছিলেন নায়েব, তাঁরই হ'ল এই কীর্তি, তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের জন্য তিনশো পঁয়ষট্টি বিঘে নাখরাজ জমি। তাতেই তাঁর নবাব-সরকারে চাকরি গেল। নবাব বলেছিল—শ্যামাচরণ রায় নিমখারাম, হারামজাদ ; কিন্তু কলম জিন্দা। সে নাখরাজ আর রদ হ'ল না।

ভোলাও এবার উঠিয়া পড়িল। লক্ষ্মীকান্তের উঠিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য সে বুঝিয়াছিল। সে জানে, ধরিতে পারিলেই এখানে আধা বখরা বন্দোবস্ত পাকা।

শ্রোতা পাইয়া শূলপাণি উঠিয়া গেল মহান্তের নিকট। ধুনির সম্মুখে বসিয়া মহান্ত ভস্ম মাখিতেছিলেন। শূলপাণি পাশে বসিয়া কহিল, লক্ষ্মীকান্ত কে ? ও কথা কয় কেন ?

মহান্ত বলিলেন, সচ কথা ভাই। ওর এক্‌তিয়ার কি ?

ভাণ্ডারঘরের শূন্য দাওয়ার উপর ট্যারা একা বসিয়া রহিল।

সহসা তাহার কোন্ খেয়াল হইল কে জানে, শূন্য গাঁজার কলিকাটা তুলিয়া লইয়া সজোরে এক দম দিল।

দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে যাত্রীর ভিড় বাড়ে, সমারোহে কোলাহলে নির্জন বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠে। ট্যারা এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। বনের মধ্যে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভোলা অম্লশূলের ঔষধ দেয়—বাবার ধুনির ভস্ম। বলে, খাওয়ার পর এক কাঁকর-ভোর চুন আর এই ভস্ম। বাস্, ভাল হতেই হবে। খাওয়া বারণ—শাক, অম্বল, গুড়, ডাল। দাও মায়ের প্রণামী সওয়া দশ আনা।

ওদিকে লক্ষ্মীকান্ত দেয় মাদুলি। আদায় করে সওয়া পাঁচ আনা। ট্যারা পিছন হইতে বলে, পয়সা প'ড়ে গেল গো টোমার।

ঘাসের ভিতর হইতে সে তুলিয়া ধরে একটা সিকি।

ওদিকে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠে। সকলের সঙ্গে ট্যারা আসিয়া দাঁড়ায়। শূলপাণি কাপড় সাঁটিয়া হাড়িকাটে আবদ্ধ পশুটার ঘাড় দলিয়া সরু করিবার চেষ্টা করে। ভোলা ও লক্ষ্মীকান্ত পা ধরিয়া টানে। যাত্রীরা করজোড়ে

সভয়ে চিৎকার করে, মা—মা—

বলিদান হইয়া যায়। রক্তাক্ত প্রাঙ্গণতলে আঙুল চুবাইয়া লইয়া শূলপাণি লক্ষ্মীকান্ত ললাটে আঁকে ত্রিপুণ্ড্রক। ট্যারাও রক্তে তাহার ছোট আঙুল একটি ডুবায়। সে আশ্চর্য হইয়া যায়, রক্তটা গরম রহিয়াছে।

অপরাহ্নের দিকে আবার দেবস্থলে জনসমাগম হয়। এখন আসেন স্থানীয় ভদ্রলোকের দল। লক্ষ্মীকান্ত, শূলপাণিও আসে। ভবানীরঞ্জন রায় জমিদার-বংশের সন্তান, তিনি আসেন একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র লইয়া। মজলিস করিয়া যুদ্ধের সংবাদ পড়া হয়।

পশ্চাৎপদ জার্মানি, মিত্রপক্ষের অগ্রগমন, আকাশ হইতে বোমা-বর্ষণ। প্রৌঢ় মহান্ত খাড়া হইয়া বসিয়া সাদা দাড়ির গোছায় গালপাট্টা বাঁধেন। শুনিতে শুনিতে বলিয়া উঠেন, মরদকা কাম হ্যায়। গুলি ছুটে সাঁই-সাঁই। কামান গর্জাত: দনা-ন-ন-ন-ন।

ভবানীরঞ্জন জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন যুদ্ধে?

মহান্ত আপনার ক্ষতচিহ্নগুলি দেখিতে দেখিতে বলেন, ইজপ্ট, মণিপুর, কাবুল। ইজপ্টমে খুব জোর লড়াই হইয়েছিল। তাঁবু গাড়কে বৈঠ রইলাম হামি লোক সাত দিন। দুশমনকে পতা মিলল না। কাপ্তেনসাব হুকুম করলো কি—চলো, পথ তৈয়ার করনে হোগা। লেও কুলাঢ় আওর পানিকে বর্তন। হাবিলদার বললে—হুজুর, বন্দুক সাথমে লেই লি? কাপ্তেনসাব আঁখ পাকায়কে বোলা—নেই। হামি লোক গেলাম এক মাইল। হুঁয়া জঙ্গল কাটকে পথ বানানে লাগলাম। এক ঘণ্টেকে বাদ ভাই, কোথাসে কে জানে, আসিয়ে গেলো উঁটকে 'পরে দুশমন। বিশটো উঁট আওর এক এক উঁটকে 'পর ছ-সাত আদমি। চারিদিক্সে তো ঘের কর লিয়া উ লোক। বাস্, বন্দুক চালায়া দাঁই—দাঁই—দনা-দন। কাপ্তেনসাব তো ঘোড়াকে 'পর ছুটা। হামরা ছুটলো পায়দলমে। বহুৎ আদমি হামাদের মর গেলো। তাঁবুমে আয়কে এক সিপাহী বন্দুক লেকে গুলি কর দিয়া কাপ্তেনকো।

ট্যারা এক পাশে বসিয়া অবাক হইয়া শুনে। বড় ভাল লাগে তাহার গোঁসাই-বাবার গল্প। বিশেষ করিয়া কামানের আওয়াজের ওই শব্দটি—দনা-ন-ন-ন। সে আপন মনেই মুখস্থ করে, দনা-ন-ন-ন-ন, দনা-ন-ন-ন-ন।

তিন বৎসর পর।

দৃশ্যপটের পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয় নাই। একটা বড় শিরীষগাছ মরিয়া

শুকাইয়া গিয়াছে। তেঁতুলগাছগুলার ডাল কাটা হইয়াছে। নিবিড় বনশোভা যেন ঈষৎ শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

পরিবর্তন হইয়াছে ট্যারার। আকারে সে অনেক বড় হইয়াছে। মাথায় কোঁকড়ানো চুলগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হইয়া বড় হইয়াছে। চলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া।

লক্ষ্মীকান্ত বলে, ওরে বেটা, এত গাঁজা খাস নি। শেষে রক্তবমি ক'রে মরবি। গাঁজা খেয়ে বেটার পায়ের শিরায় টান ধরেছে দেখ।

ট্যারা হি-হি করিয়া হাসে।

লক্ষ্মীকান্ত সেদিন বলিল, বেটা যদি গাঁজাই খাবি তো একটু ক'রে দুধ খাস। ছাগল-টাগল দুইয়ে নিয়ে চোঁ ক'রে এক ঢোক, বুঝলি? বলিয়া সে নিজেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘরের ভিতর হইতে ভোলা বলিল, বেটা দিনরাত গাঁজা খাচ্ছে দাদা, দিন-রাত। এখানে তো খায়ই আবার কিনেও খায়। আজকাল মায়ের পেনামীর পয়সা চুরি করছে বেটা।

ট্যারা হাসিতে হাসিতে বলিল, ভাগে টোর কম পডছে, লয়?

ভোলানাথ চটিয়া উঠিয়া বলিল, দেখ দাদা, দেখ, বেটা বাউরীর আস্পদ্ধা দেখ!

ট্যারা বলিয়া উঠিল, ডোব ব'লে সেই কথাটি? সে-ই?

ভোলা এবার অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিল, মরবি, মরবি, বামুনের অভিশাপে মরবি তুই।

ট্যারা হাসিয়া উঠিল, টোকে না লিয়ে লয়। টোকে লোব, টবে যাব। টোর মট সাটটা বামুন জলপান করি আমি।

ওদিক হইতে মহান্তের আগমন-ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছিল। স্নানান্তে তিনি ফিরিতেছিলেন।—মায়ী হামার আদার বুটী গো—কিরপা কর্ মায়ী গো—পাথর-ঢিপি গো! দয়াময়ী গো!

ট্যারা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কহিল, গোঁসাই-বাবা আচ্চে বাবা। বেটা ছেয়াল-মারা, রাগলে রক্ষে ঠাকবে না বাবা।

ভোলা কহিল, দিচ্ছি ব'লে গোঁসাই-বাবাকে, দাঁড়া—গাল দাও তুমি।

পলায়নপর ট্যারা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সেই কথাটি—সে-ই?—বলিয়াই সে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল, যানে দেও ভেইয়া। বেটা বড় বদমাশ। চায়ের দেরি কত

দেখ।

ভোলা বলিল, চা তো হ'ল দাদা, দুধের হয়েছে টানাটানি। গরুতে দুধ দিচ্ছে না ভাল। মায়ের ভোগ হবে, না, চা হবে?

কেন? গরুতে দুধ ছাড়ালে নাকি?

না দাদা, এই সবে কচি বাছুর। কে জানে, কেন যে দুধ দেয় না! ওই ব্যাটা শালা ট্যারার হাতে প'ড়ে সব মাটি হল। খেতেই দেয় না হারামজাদা। গরু চরাতে যাবে, তাও হাতে এক বাঁশি।

মহান্ত আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কেয়া রে ভোলা?

লক্ষ্মীকান্ত বলিয়া উঠিল, আপনার যেমন কাণ্ড ট্যারাকে রেখেছেন গরুর সেবা করতে! ও ব্যাটাকে তাড়ান, আজই তাড়ান। বেটা গাঁজাল বদমাশ, গরুকে খেতে দেয় না—গরুতে দুধ দিচ্ছে না।

ভোলানাথ কহিল, বেটা মায়ের পেনামী চুরি করছে আজকাল। আপনাকে গাল দেয়, বলে—শেয়াল-মারা। বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা করুন এই দাদাকে।

মহান্ত ক্রোধভরে বলিলেন, ভাগা দেও হারামজাদ শয়তানকে। টেঁ—ঢ়া, এ টেঁ—ঢ়া!

কোথায় ট্যারা!

দ্বিপ্রহরে বলির বাজনা বাজিয়া উঠিল। ট্যারা ঠিক আসিয়া হাজির হইয়াছিল। বলি হইয়া গেল। লক্ষ্মীকান্ত শূলপাণি ললাটে রক্তের ত্রিপুণ্ড্রক আঁকিয়া লইল। ট্যারাও পড়িল লাফ দিয়া। বুকে মুখে সে বীভৎসভাবে রক্তের ছাপ মাখিতেছিল। উষ্ণ রক্ত বাতাসের শৈত্যে জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। তাহারই খানিকটা তুলিয়া লইল ট্যারা ঘাটে গিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে চাটিয়া চাটিয়া খাইতে বসিল। ভোলানাথ আসিয়াছিল ঘাটে। সে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, রাক্ষস - বেটা রাক্ষস রে!

ট্যারা হি-হি করিয়া হাসিয়া কহিল, টোর রকৃটও এমনই করে খাব আমি।

ভোলা ক্রোধে তাহাকে তাড়া করিল। টারা ঝাঁপ দিয়া পড়িল জলে। সাঁতার দিয়া গভীর জলে গিয়া মুখ ফিরাইয়া ভোলাকে বলিল, কচকচ ক'রে টোর হাড় মাংস রক্ত খাব আমি।

দারুণ ক্রোধে ভোলা একটা ঢেলা তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

সঙ্গে সঙ্গে টুপ করিয়া ট্যারা জলে ডুব দিল। উঠিল গিয়া প্রায় মধ্যস্থলে। মাথা নাড়িয়া জলসিক্ত ঝাঁকড়া চুল ঝাড়া দিয়া সে আবার বলিল, কচকচ ক'রে খাব।

ভোলাও আবার প্রাণপণ শক্তিতে ঢেলা ছুঁড়িল। ট্যারাও সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল। এবার উঠিল সে ওপারের কাছাকাছি। পাড়ে উঠিয়া সিক্তবস্ত্রে সিক্ত-দেহেই সে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দারুণ ক্রোধে ভোলানাথ আশ্রমে ফিরিয়া শুনিল—বনমধ্য হইতে ভাসিয়া আসিতেছে বাঁশের বাঁশীর সুর।

ভোলা মহান্তকে গিয়া বলিল, বাবা, হয় আমাকে রাখুন, নয় আপনার ট্যারা থাকুক।

এই সময়ে জটাধারী আসিয়া বলিল, বাবা, ট্যারা আজ গরু খোলে নাই।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মহান্ত বলিলেন, যাও, তুমি গরু লিয়ে যাও। টেঁঢার জবাব হো গিয়েসে।

ভোগের ঘণ্টা বাজিল। ট্যারা কোথা হইতে আসিয়া নির্দিষ্ট স্থানটিতে পাতা পাড়িয়া বসিয়া গেল। ভোলা মহান্তকে গিয়া বলিল, ওই দেখুন বাবা, খাবার সময় বেটা ঠিক হাজির হয়েছে।

মহান্ত চুপ করিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে ট্যারাকে গম্ভীরভাবে ডাকিলেন, টেঁঢ়া, এখানে শুন্।

ট্যারা মাথা নীচু করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মহান্ত বলিলেন, তুমি শয়তান বন গিয়াছ। তুমি মায়ীর পরনামী পয়সা চুরি কর। গরুর যতন কর না। গাঁজা খাও তুমি হরদম। তুমার জবাব হইল। কাম তুমসে নেহি চলেগা।

ট্যারা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় গোশালার দিকে কোলাহল শুনিয়া মহান্ত ডাকিলেন, জটা, জটা, এ জটা!

জটাধারী আসিয়া বলিল, আজ্ঞে বাবা, ট্যারা মহা হাঙ্গামা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

প্রবল রোষে মহান্ত বলিলেন, মারো হারামজাদকে।

জটা বলিয়া গেল, ভোলাবাবা বললেন—ওর জবাব হয়েছে, তুই গরুগুলোকে ঘরে বাঁধ। গরু খুলতে গেলাম তো ট্যারা আমাকে মারতে আসছে, বলছে—আমার কাজ তুই করবি কেন? আমি বললাম, তোর যে জবাব হয়েছে! বেটা বজ্জাত—বলে কি বাবা—জবাব দিয়েছে কে? মায়ের গরু, মা তো জবাব দেয় নাই আমাকে। আমি যাব কেন?

মহান্ত হাঁকিলেন, টেঁঢ়া, এ টেঁঢ়া!

গোশালা হইতে উত্তর আসিল, ভাই গো বাবা, গরু বাঁধছি আমি।

কিছুক্ষণ পরই সে আসিয়া দাঁড়াইল। মহান্ত বলিলেন, শয়তান বদমাশ।

ট্যারা নীরব। মহান্ত আবার বলিলেন, চিমটাকে মারে হাড্ডি তোড় দেগা হাম।

তবুও ট্যারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভোলা কহিল, কানা খোঁড়ার আশি দোষ বাবা। ও বেটা কানা খোঁড়া দুই-ই।

মহান্ত বলিলেন, যাও, শয়তানি করবি না। গাঁজা খাবি না। মন লাগাকে কাম করবি। ধর বেটা, ভোলাদাকে পায়ে ধর্।

ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া ট্যারা লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল। গোশালার প্রাঙ্গণে আপন মনেই আরম্ভ করে, লেফ—টার্ন্ কুক্ ম্রাচ।

দিন দুই পর, দ্বিপ্রহর রাত্রে ভোলা আসিয়া মহান্তের দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া ডাকিল, বাবা! বাবা!

কে, কৌন্ হ্যায়?

আমি, ভোলা।

কেয়া রে, এতনা রাতে?

একবার উঠে আসুন।

দরজা খুলিয়া মহান্ত বলিলেন, কি?

আসুন একবার আমার সঙ্গে—চুপিচুপি একটু।

গোশালায় গিয়া দেখা গেল, ঘরের দরজা খোলা। ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভোলা ফস্ করিয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল। সচকিত আলোকে দেখা গেল, ট্যারা একটা গাইয়ের পেটের তলে শুইয়া শান্ত সন্তানটির মত স্তন-লেহন করিতেছে। দেশলাইয়ের কাঠিটা নিবিয়া গিয়াছিল; পুনরায় একটি কাঠি জ্বালিয়া ভোলা দেখিল, বিশালদেহ মহান্তের হাতের মুঠার মধ্যে ট্যারা নির্জীবের মত ঝুলিতেছে। বাহিরের প্রাঙ্গণে ট্যারাকে নিক্ষেপ করিয়া মহান্ত বলিয়া উঠিলেন, শয়তান, হারামজাদ!

পর-মুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ট্যারা কোথায় ছুটিয়া পলাইয়া গেল!

তিন-চার বৎসর পর আবার ট্যারাকে একদিন দেখা গেল এই দৃশ্যপটের মধ্যে। তাহার পরনে গেরুয়া, মাথার ঝাঁকড়া চুলে দুই-চারিটি জটাও দেখা দিয়াছে, কাঁধে ঝোলা, হাতে একটা আঁকাবাঁকা লাঠি।

অতি প্রত্যুষে সে মহাপীঠে প্রবেশ করিল। হাত-পা ধুইয়া প্রথমেই সে মা

মারিল সেই ঘণ্টাটায়। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া হাঁকিল, শিবরাম—শিবরাম! বম্—বম্—শঙ্ক—র!

ভোলা সবে তখন উঠিয়াছে। মহান্তের দরজাটা বন্ধ। ট্যারা মহান্তের দরজার সম্মুখে গিয়া ডাকিল, বাবা, গোঁছাই-বাবা!

পিছন হইতে ভোলা প্রশ্ন করিল, কে—কে—কে হে তুমি?

মুখ ফিরাইয়া ট্যারা হাসিয়া বলিল, চিনটে পারছ না ভোলা গোঁছাই?

সাশ্চর্যে ভোলা বলিল, আরে, তুই বেটা কোথেকে রে! এ যে একেবারে সন্ন্যেসীর সাজ—অ্যাঁ!

ট্যারা হাসিয়া বলিল, টোকে আর পেনাম করব না।

তারপর আবার প্রশ্ন করিল, গোঁছাই-বাবা কোটা গো?

বাবার বড় অসুখ রে।

ট্যারা ডাকিয়া উঠিল, গোঁছাই-বাবা!

বাধা দিয়া ভোলা বলিল, ডাকিস না।

ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠের দুর্বল সাড়া উঠিল, ভোলা!

ভোলা দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। মহান্ত বলিলেন, জল—মুখ ধোনাকো জল দে বেটা। কৌন্ রে, উ কৌন্ রে?

দরজার পাশ হইতে ট্যারার মুখ উঁকি মারিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল, আমি, গোঁছাই-বাবা।

ভোলা কহিল, সেই বেটা ট্যারা কোথা থেকে সন্ন্যেসী সেজে সকালবেলা-তেই এসে হাজির।

মহান্ত বলিলেন, টেঁড়া! আরে, এতনা রোজ কাঁহা ছিলি রে বেটা? আও আও, সামনে আও বেটা - একবার দেঁখে।

সন্তর্পণে ট্যারা আসিয়া ঘরের এক পাশে দাঁড়াইল। ভোলা জল আনিতে চলিয়া গেল বোধ হয়। ট্যারাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, আরে বাচ্চা, একদমসে সৌন্ন্যেসী হো গয়া!

অল্পক্ষণ নীরবতার পর আবার তিনি বলিলেন, ছোড়্ দেও, ছোড্ দেও - এ মতলব ছোড়্ দে বাচ্চা। সাদি কর্, বিয়া কর্, সনসার পাতাও। রহ যাও সনসারমে - রহ যাও বেটা।

ট্যারা গম্ভীরভাবে বলিল, টাই করব বাবা। আর ডাব না।

কয়টি কথা বলিয়াই সন্ন্যাসী পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চোখ মুদিয়া তিনি নীরবে শুইয়া রহিলেন। ট্যারা বাহিরে আসিয়া ভোলাকে বলিল, ডাও,

বাবাকে ডল দিয়ে এছ।

ভোলা চড়াইয়াছিল চায়ের জল, সে বিরক্তিভরে কহিল, তু বেটা ব'স ওইখানে। বেটা আমার সোহং স্বামী এলেন! দোব জল, দোব। শুধু কি জল দিলেই হবে? বেটা বুড়ো দিনরাত ঘর দোর কাপড় ময়লা করছে।—বকিতে বকিতে সে এক ঘটি জল মহান্তের কাছে নামাইয়া দিয়া আসিল। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল, কাপডা-কৌপীন বদল দে ভোলা।

বাহির হইতেই ভোলা উত্তর দিল, দোব গো দোব, চানের সময় দোব। ভাঁড়ারের কাজ সারি, দাঁড়াও।

এদিকে চায়ের আসর জমিয়া উঠিল। সেই শূলপাণি, লক্ষ্মীকান্ত সকলেই আসিয়াছিল। ট্যারাও আজ মজলিসে একজন সভ্য। আজ সমস্ত কথাই হইতেছিল ট্যারাকে লইয়া।

সে গল্প করিতেছিল, কট ডায়গা গেলাম বাবা, হরিড্ডার, কাচি, বড্ডিনাঠ, কামরূপ, অডুদ্যা, ডারকা—কট ডায়গা বলে। কট টপস্যা করলাম ব'লে।

শূলপাণি ঘুরিয়াছে অনেক, সে প্রশ্ন করে, কোথা কি দেখলি বল দেখি?

লক্ষ্মীকান্ত গিয়াছিল কাশী, সে বলিল, আচ্ছা কাশীর কথাই বলুক তো আগে।

ট্যারা হি-হি করিয়া হাসিতেছিল। কহিল, বিঠানাঠ-বড্ডিনাঠ, কট ঠাকুর ঠব কি মনে থাকে?

ভোলা বলিল, বেটা পয়লা নম্বরের মিথ্যেবাদী। কই, বল্ দেখি বদ্রিনাথের কটা হাত?

গম্ভীরভাবে ট্যারা বলিল, টা—চার-পাঁচটা হবে। কে ডানে বাবা, যে অণ্ডকার মণ্ডির।

মহান্ত ডাকিতেছিলেন, ভোলা! ভোলা!

ভোলা বিরক্তিভরে বলিল, দাদা, জ্বালালে বেটা বুড়ো। মরেও না, বাঁচেও না। দাও এখন, কাপড ছাড়িয়ে দাও, ময়লা পরিষ্কার ক'রে দাও।

লক্ষ্মীকান্ত পরামর্শ দিল, সাড়া দিস না তুই।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, ট্যারা মহান্তের ঘর পরিষ্কার করিতেছে।

ভোলা খুশী হইয়া বলিল, বেশ করেছিস। রোজ করবি। বুড়ো ম'লেই আমি মহান্ত হব, তোকে চেলা বানাব। বুঝলি?

ট্যারা ভেঙাইয়া কহিল, ডা ডা বেটা চোর বামুন, টোর চেয়ে আমি বড় সাডু। টোর চেলা কে হবে, ডাঃ!

স্বার্থের খাতিরে ভোলা কথাগুলা হজম করিয়া যায়।

অপরাহ্ণের দিকে পূর্বের মতই ভদ্রজন আসেন সব। ভবানীরঞ্জন এখনও তেমনই সংবাদপত্রখানি লইয়া আসেন। মহান্তের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভবানীরঞ্জন বলেন, আজ কেমন বাবা ?

মহান্ত কি একটা লইয়া দেখিতেছিলেন, সেটা পাশে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, মায়ী আমার পাথর-টিপি দয়া করছেন না ভাই। জিউ যায় না দাদা।

প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করিবার জন্য ভবানীরঞ্জন বলিলেন, কি দেখছিলেন কি ? ওটা কি ?

বস্তুটি তুলিয়া ধরিয়া মহান্ত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, মেডিল। লডাইসে মিলিয়েছিল ভাই।

বাহিরে ক্রমশ সংবাদপত্রের আসব জমিয়া উঠে। হাস্যপরিহাসের কলরবের মধ্যে মাঝে মাঝে রুগ্ন মহান্তের কণ্ঠস্বর শুনা যায়, ভোলা ! ভোলা !

অবশেষে ডাকেন, টেঁঢ়া !

সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত কণ্ঠের সাড়া পাওয়া যায়, ধরো তো বেটা, থুকদানিটা ধরো তো।

মাঝে মাঝে ট্যারার তম্বি শোনা যায় ভোলার উপর। সে বলে, ডাও না বেটা বামুন। টোমার কাড আমি করব কেন ? ডেকবি, কাল চ'লে ডাব আমি গাঁয়ে।

ভোলা বলে, ওরে বেটা বাউরী, গোঁসাইয়ের সেবা করতে পাওয়া তোর ভাগ্যি।

ট্যারা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠে। বলে, ডোব বামুনের নেটার মেরে। জাট টুলে কটা কও টুমি—টোর বামুন ! ডোব ব'লে টোমার বিড্যে ? তারপর সে আপন মনেই বকে, মহাণ্ট হ'ল টো আমার কি, আমাকে কি রাডা ক'রে ডেবে ? পুণ্যি, পুণ্যি টাই না আমার পুণ্যি। মরুক আর ঠাকুক, আর আমি ডাব না

দ্বিপ্রহর-রাত্রে মহান্ত ডাকেন, ভোলা ! ভোলা !

ট্যারা সাড়া দেয়, বাবা, গোঁছাই-বাবা, কি বলটেন ?

দিন কয় পরে সত্য সত্যই ট্যারা গ্রামের মধ্যে চলিয়া গেল। স্বজাতির মধ্যে তাহার মহা সমাদর হইয়াছে। পুরাতন ভিটাতে সে নূতন ঘরের বনিয়াদ শুরু করিয়া দিল। থায় কিন্তু মহাপীঠে।

ভোলা বলে, এদিকে খাবার সময় তো আছ দিব্যি ! মহান্তের সেবা করতে

বুঝি মাথা ধরল ?

ট্যারা বলে, টু কি করবি, টু ? মহাণ্ট বুঝি অমনই হবি ?

খাওয়া-দাওয়ার পর সে একবার মহান্তের দুয়ারে উঁকি মারিয়া বলে, বাবা, গোঁছাই-বাবা !

ক্ষীণকণ্ঠে মহান্ত বলেন, টেঁঢ়া ?

হাঁ বাবা। ঘর আরম্ভ করলাম বাবা। ডেয়াল ডিটে লেগেছি।

মহান্ত বলেন, বানাও, ঘর বানাও। সাদি করো।

একমুখ হাসিয়া ট্যারা বলে, করব বাবা, নোটনের মেয়ে পরাকে। সব ঠিক হয়ে গিয়েঠে বাবা। খুব ছোন্দর।

দিন কয় পর প্রভাতে সংবাদ রটিয়া গেল, মহাপীঠের সাধুবাবা গত রাত্রে দেহ রাখিয়াছেন।

দলে দলে গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোক ছুটিয়া আসিতেছিল। খোল-করতালের ধ্বনির সহিত হরিনাম আকাশ স্পর্শ করিতেছিল। সাধুবাবার সংকার হইবে।

মহাপীঠে জঙ্গলের ও-প্রান্তে নির্জন প্রান্তরে তখন কাঁদিতেছিল একজন, সে ট্যারা। একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া সে আকুলভাবে কাঁদিতেছিল, গোঁছাই-বাবা, গোঁছাই-বাবা গো—

এই গাছটার তলে বসিয়া সে গরু চরাইত। গরুগুলি দ্বিপ্রহরে আসিয়া এরই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া নিমীলিত চোখে রোমন্থন করিত। নদীর কূল হইতে বকের সারি দূরান্তরে যাইবার পথে এই গাছটির উপর বসিত।

সেদিনও তখন কয়টা বক এই শূন্য স্থানটায় কয়টা পাক মারিয়া শূন্যপথে রব করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কোন্ অদৃশ্য অন্তরালে বসিয়া মঞ্চশিল্পী আলোকধারার রূপ পরিবর্তন করিতেছিলেন। গাঢ় ছায়ালোকের নিবিড়তার মধ্যে সেই প্রান্তরের বুকে ট্যারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাখাল বাঁড়ুজ্জে

রাজস্ব বাকির দায়ে জমিদারী সম্পত্তি নিলামের দিন।

সদরের আদালত-কাছারির চারিদিকে যেন দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। উকিল, মোক্তার, মহাজন, দালাল, ক্রেতা, বিক্রেতা, সরকারী আমলা, জমিদারের নায়েব, সমস্ত লইয়া সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য - জনতার সমারোহ, হাট, শোকসভা, যাহা বলা যায় তাহাই। হাসি কান্না কলহ কিছুরই অভাব নাই।

একজন পল্লীবাসী অবাক হইয়া শুনিয়া বলিল, ভাগাড় রে বাবা! শ্যাল-কুকুব-শুকুনি-গিধিনী-কাক-চিল সব ছেঁড়াছেঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছে! হ-হ-রে পয়সা— নামেও গোল, কাজেও গোল।

একটা বটতলায় মহাজন জ্ঞানাঞ্জন দত্ত বচসা করিতেছিল, হাজাব খানেক টাকা আয়ের মেলানপুরেব জমিদাব রাখাল বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে।

দেখ দিকি, শালা বামুনেব গরজ দেখ দিকি! টাকা দিয়ে সম্পত্তি ডাক— ডেকে ওকে ওর অংশ ছেড়ে দাও। এমন ছ্যাঁচড়াও তো আমি দেখি নাই।

অভ্যাসমত টানিয়া টানিয়া বাখালবাবু বলিল, শুনলে সব, আজকালকার গন্ধবণিকদের কথা শুনলে তোমরা? আমার ভাইয়ের অংশটা, বিবেচনা কব, তুমি যে ছ কডা ন কডায় পাবে হে বাপু, সেটা যে আমি ক'রে দিলাম তোমাকে। সে কথা বলে কে বল দেখি! অ্যাঁ, বলি সেটা বিবেচনা ক'রে দেখ একবাব।

জ্ঞানাঞ্জন দত্ত ঘন ঘন ঘাড নাড়িয়া বলিল, হবে না। পথ দেখ বাছা, মানে মানে পথ দেখ। বেটা বামুন—অযাত্রা—সাক্ষাৎ যোগিনী।

রাখালবাবু বলিল, তুমি তো বাবা মূর্তিমান সংক্রান্তিপুরুষ। বেশ, কিন্তু ব'লে রাখলাম আমি, ইয়ের পরে যেন ঢুষো না আমাকে বাপু। বিবেচনা ক'বে দেখ, আমি চললাম তোমার যমের কাছে, নাম করব না ইয়ে বাঁড়ুজ্জের কাছে। প্রাচীন জমিদার-বংশ, বিবেচনা কর, তাব ওপর ব্রাহ্মণ, তা বেশ, চললাম আমি।

রাখাল বাঁড়ুজ্জে সত্য সত্যই পথ ধরিল। দত্ত বলিল, দেখ দিকি শালাব কাণ্ড! শালার কাছে হাজার-বারোশো টাকা পাব আমি, সে টাকা ছেড়ে দাও, ওর সম্পত্তির অংশ ছেড়ে দাও, ছোট ভাইয়ের অংশটা যোগাযোগ ক'রে নিলেম করিয়ে দেবেন উনি আমাকে।

আর একটি ভদ্রলোক বলিলেন, আমাকে একটা খোলসা কথা ব'লে দেন দত্ত মশায়।

দত্ত একজনকে বলিল, ডাক তো বেটা বামুনকে। বেটা আবার সত্যি গেল নাকি বাঁড়ুজ্জেদের কাছে।

ফৌজদারী আদালতের পিয়নটা হাঁকিতেছিল, রহমৎ সেখ রহমৎ সেখ, আজেমা বিবি—আজেমা বিবি—হাজির হো—

রহমৎ দাঁড়াইয়া ছিল মোক্তারের কাছে; সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, বাবু!

মোক্তার বলিল, ফোর রুপীজ চার টাকা, আজ আর চার টাকার কমে হবে না। দরখাস্তে সই করলেই আজ টাকা, দেখছ না?

জুনিয়র উকিল একজন ফিটফাট পোশাক পরিয়া খটখট করিয়া একরূপ লাফ দিয়া সিঁড়ি অতিক্রম করিতে করিতে চলিয়াছিল সাহেবকে সেলাম দিতে। ওদিকে সেই বটগাছটার এক পাশে তখন নিভৃতে বসিয়া দত্ত ও রাখাল বাঁড়ুজ্জে ফিস ফিস করিয়া পরামর্শ করিতেছিল।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, বিবেচনা কর, এই রাজদরবার আর ব্রাহ্মণ বট সাক্ষী রইল—বুড়রো গাঁয়ের কাজ যদি হয় তবে পুকুর তুমি পাবে, পাবে, পাবে। নিষ্কর পুষ্করণী বিবেচনা কর উত্তম সম্পত্তি, তাই দেব আমি।

দত্ত বলিল, তা নইলে কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেব আমি। মাগীকে সব ব'লে দেব।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, দুটো টাকা দাও দেখি সন্দেশ কিছু, বিবেচনা কর, ছেলে-পিলে আছে ঘরে।

পকেটে হাত দিয়া দত্ত বলিল, সাধে কি তোমাকে ছ্যাঁচড় বলি আমি। এই কিন্তু খুচরো বারো টাকা হ'ল।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, এক কলমে, বিবেচনা কর, বারো শো টাকা শোধ গেল তো? চার হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি পেলে তো তুমি? বিবেচনা কর, আমা থেকেই তো? আমার ঘরেরই সম্পত্তি সে বিবেচনা ক'রে দেখ, অ্যাঁ!

সদর হইতে বাড়ি ফিরিবার পথে রাখাল বাঁড়ুজ্জে স্টেশনে নামিয়া দেখিল, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যারও বিলম্ব ছিল না। বাঁড়ুজ্জের বাড়ি এখান হইতে ক্রোশ দেড়েক দূর, মধ্যে আবার একটা নদী। বাঁড়ুজ্জে এই গ্রামের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িল। গ্রামখানি বর্ধিষ্ণু লোকের গ্রাম, রাস্তার দুই পাশে পাকা ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন কাঁচা বাড়ির সারি। কাঁচা বাড়িগুলিও এমন শ্রীসম্পন্ন যে কাঁচা বাড়ি বলিয়া চেনা যায় না, মাটির দেওয়ালের উপরেই পলেস্তারা-করা কলিচুনের দুধের মত সাদা রঙ ধবধব করিতেছে।

বাঁড়ুজ্জে আপন মনেই বলিল, বলিহারি মাটি রে বাবা ! এখানকার মাটি আর বেটি ডাকসাইটে যে বলে, তা মিছে নয় দেখি।

কিছুদূর আসিয়া একটি বাড়িতে উঠিয়া জলসিক্ত পাকা উঠানে পা ঘষিতে ঘষিতে বলিল, তারা - তারা ! বলি, ভাগ্নে রয়েছ নাকি গো ?

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল, কে ?

হাসিতে হাসিতে রাখাল বলিল, হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা বেরিয়ে এসেই দেখ বাপজান। বলি, কে এল - তা দেখ।

গৃহস্বামী হারাণ মুখুজ্জে বাহিরে আসিয়া দেখিল, তাহার মামার 'গোলাপ-জল' রাখাল বাঁড়ুজ্জে।

রাখাল বলিল, নামলাম ইষ্টিশানে। তা বলি, দেখে যাই ভাগ্নেকে একবার। স্নেহ নীচগামী, বিবেচনা কর, তোমাদের তো মামাকে দেখতে সাধ হয় না।

হারাণ সন্তুষ্ট হয় নাই, সে কোন উত্তর দিল না। রাখাল নিজেই বলিল, জল-টল দে রে, কে রে বেটা চাকর আছিস ? আর বাবাজী, এই ঠাণ্ডা, বিবেচনা কর, চা করতে বল দেখি।

তারপর চারিদিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তোমার বাবা থাকতে, বাপ রে বাপ রে, সে কি আমোদ, আর বিবেচনা কর, কি খাতিরই আমার ছিল, ওঃ। বুঝলে কিনা, কারণ ক'রে একদিন পড়লাম এইখানে দড়াম ক'রে। তোমার বাবা ওইখানে পড়ে একটা কুকুরের গলা ধরে। বলিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া ভদ্রলোক আকুল হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ হাসি থামাইয়া আবার বলিল, এইখানেই আজ রাত্রের মত, বিবেচনা কর, আগে থেকেই বাড়িতে বলা ভাল অ্যাঁ না কি গো ? ধরগা যেঁয়ে চালটাল নেবে তো আবার।

অতঃপর বাঁড়ুজ্জে চাপিয়া বসিল। চা-পানান্তে হাত দুইটি বাড়াইয়া বলিল, জল।

তারপর তামাক খাইতে খাইতে বলিল, বলি হ্যাঁ গো ভাগ্নে, বলি, মাতুলের ক্রিয়াকলাপের কথা জানা আছে তো সব, না ভুলে গেলে, অ্যাঁ ?

হারাণ বলিল, কি বলুন ?

ধরগা যেঁয়ে আমরা আবার পূর্ণাভিষিক্ত লোক, বিবেচনা কর, সন্ধ্যা-আহ্নিক, তোমরা সব ছেলেমানুষ, বিবেচনা কর, বলাই ভাল।

হারাণ চাকরটাকে বলিল, ওরে, সন্ধ্যে করবেন বাবু আসন, গঙ্গাজল, কোশাকুশি এনে দে তো।

রাখাল ব্যস্ত হইয়া বলিল, শোন শোন বাবাজী। তারপর মৃদুস্বরে বলিল,

আমাদের আবার তর্পণ আছে, সুধা বিবেচনা কর—

হারাণ বিরক্ত হইয়া বলিল, মদ? এই রাত্রে মদ কোথায় পাব?

রাখাল বলিল, রাগ ক'রো না বাবাজী, রাগ করতে নেই, বিবেচনা কর, আমরা হলাম গুরুজন; তারপর ধরগা যেঁয়ে, মেলানপুরের বাঁড়ুজ্জেরা সম্ভ্রান্ত প্রাচীন ঘর।

হারাণ লজ্জিত হইয়া বলিল, না না, আমি বলছি সন্ধ্যের সময়েই তো আবগারি বন্ধ হয়।

রাখাল বলিল, আট আনা পয়সা আর বোতল দিয়ে লোক পাঠিয়ে দাও। আমি বরং একখানা রোকা লিখে দি বেটা শুঁড়ীকে।

সন্ধ্যা তর্পণ শেষ করিয়া রাখাল বলিল, তুমি মনে করলে বাবাজী, মামা বেটা বুঝি খেতেই এল। একটা দায় তোমার আমি—ধরগা যেঁয়ে, সৎ-ভগ্নী হ'লেও তো, বিবেচনা কর, তোমারই দায়—অ্যাঁ?

হারাণ বলিল, হ্যাঁ, আমারই দায় বইকি?

অ্যাই, তোমারই দায়। তা আমি মনে করছি, বলি, ভাগ্নেরই তো আমার দায়, দিই উদ্ধার ক'রে।

হারাণ একটু সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল, রাখালের অবস্থা মন্দ নয়, জমিদারি সামান্য আছে, মোটা জোতজমা, মোটের ওপর অন্নবস্ত্রের সংস্থান তাহার আছে। এদিকে তাহার বৈমাত্রেয় ভগ্নীটিও বড় হইয়া উঠিয়াছে। রাখাল হাসিয়া বলিল, বাবাজীর মন এইবার ভিজেছে! তা ভগ্নীটী তো তোমার সংমায়ের এক সন্তান?

হারাণ বলিল, হঁ্যা।

তোমার বাবা, ধরগা যেঁয়ে, মহৎ লোক ছিল গো বাবাজী। এ চাকলায় নামজাদা মহৎ বংশ বলতে দুটি, বিবেচনা কর, মেলানপুরের বাঁড়ুজ্জেরা আর তোমরা। তোমার সংমাকে তো সব আলাদা সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন তোমার বাবা?

হঁ্যা।

তা আমার বড় ছেলে—

বাধা দিয়া হারাণ বলিল, তার তো বিয়ে হয়েছে।

রাখাল বলিল, মধ্যম ছেলের সঙ্গেই দিতাম, তা ধরগা যেঁয়ে, বুহুরোতে তার সম্বন্ধ হয়ে আছে। বাত দেওয়াতে, বিবেচনা কর, আর জাত দেওয়াতে সমান,

অ্যাঁ ? তা ছাড়া বিবেচনা কর, মেয়েটির মা হ'ল বিধবা, ধরগা যেঁয়ে, ওই একমাত্র মেয়ে, আপনার লোকও কেউ নাই, কোথা খুঁজবে এখন আর ? ইদিকে বড় ছেলে, ধরগা যেঁয়ে, ধরেছে, ও বউ নেবে না। আর বাবাজী, বউমাটির আমার চালচলন বেশ ভালও নয়। ধরগা যেঁয়ে, সম্ভ্রান্ত ঘর আমাদের, অ্যাঁ !

হারাণ বলিল, সে হবে না রাখালমামা, আমার বিমাতা সে দেবেন না।

রাখাল বলিল, তা বেশ, তা কন্যার তো, ধরগা যেঁয়ে, অভাব তো নাই। তবে আমি বলি, তোমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতে একটা, বিবেচনা কর, ভাবলাম, ভাগ্নেরই তো আমার ঝঞ্ঝাট, তা বেশ।

হারাণ চুপ করিয়া রহিল, কথা বাড়াইতে প্রবৃত্তি তাহার ছিল না।

রাখাল চাকরটাকে ডাকিয়া বলিল, ওরে ও কি নাম রে তো বেটা চাষার ? তামাক-টামাক দে রে বাপু।

তামাক খাইতে খাইতে সে আবার আরম্ভ করিল, তা শিকার-টিকাব তো আর করতে যাও না ভাগ্নে ?

হারাণ এবার একটু সজাগ হইয়া বলিল, শিকার-টিকাব আছে নাকি আ'নাদের ওদিকে ?

বিস্তর, বিস্তর, তা ধরগা যেঁয়ে, এক এক ঝাঁকে দু-তিন শো সরাল।

হারাণ বলিল, কিন্তু এ যে ওদের ব্রিডিং সিজন, ডিম পাড়বে সব।

রাখাল বলিল, তা পাড়ুক কেন, সব তো আর, বিবেচনা কর, মারছ না তুমি। যে কটা মারবে, বিবেচনা কর, সেটা বাঁজাও তো হতে পারে।

হারাণ উৎসাহিত হইয়া বলিল, তা বেশ, যাব একদিন।

যাবে -থাকবে আমার বাড়িতে, ধরগা যেঁয়ে, আমাব বাড়িঘর দেখাও হবে, ছেলেকেও দেখবে আমাব। বিবেচনা কর, মামা যে তোমাব কি মানের লোক দেখে আসবে। তবে টোটা যেন বেশি ক'রে নিয়ে যেও, মামাকে দিতে হবে হবে বাপু দশটি টোটা।

হারাণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, ওরে, খাবার জায়গা করতে বল্। উঠুন, মুখ-হাত ধুয়ে ফেলুন।

হাত-মুখ ধুইতে ধুইতে রাখাল বলিল, দুধ আবার আমার একটুকুন চাই-ই বাবাজী, বাল্যকাল হতে, বিবেচনা কর, এক রকম দুধেরই শরীর আমার।

হারাণ বলিল, দুধ হওয়াই তো মুশকিল, ছেলেপিলের দুধ ছাড়া -

রাখাল তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, তাই দেবে গো আমাকে আজ বাবাজী। ছেলেরা তো দুধ, বিবেচনা কর, রোজই খায়, একদিন না হয়, ধরগা

যেঁয়ে, নাই খেলে।

রাখাল বাঁড়ুজ্জে মিথ্যা কথা বলে নাই, সত্যই বুড়রো গ্রামের কন্যাটির মাতা নিতান্তই অভিভাবকহীনা, দেখিয়া শুনিয়া দিবার আপনার জন কেহ নাই। কন্যাটির পিতা ভুবন চাটুজ্জে নিতান্ত অল্প বয়সে মারা গিয়াছেন। তখন বিধবা পত্নীটির বয়স মাত্র বাইশ আর কন্যার বয়স ছিল ছয়, সে আজ দুই বৎসরের কথা। চাটুজ্জেরা ক্রিয়াকর্মপরায়ণ বংশ, তাঁহাদের খ্যাতি বহুদিনের, নবাবী আমল হইতেই বহু ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি তাঁহারা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। এক শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি, কয়েকটি পুষ্করিণী বাগান; অভাব কিছুর ছিল না। কিন্তু বংশটি কেমন ক্ষয়রোগগ্রস্ত বংশের মত। ধারাবাহিক রোগ কাহারও কিছু ছিল না, তবু কয়েক পুরুষেই বিপুল পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া এক ভুবনেশ্বরে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সম্পত্তিও আসিয়া আবার একত্রিত হইয়াছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা হৈম বড় বিপদে পড়িয়া গেল। চারিদিক হইতে সবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সম্পত্তিগুলি তাহার হাত হইতে যেন বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। পাশের গ্রামের একটা পুষ্করিণী দাবি করিয়া বসিল ও-গ্রামের জমিদার ও নাম-করা মহাজন জ্ঞানাঞ্জন দত্ত। সে বলিয়া বসিল, এ ব্রহ্মত্র নয়। পুরনো কাগজে দেখছি, এ হ'ল জমিদারের খাস পুকুর।

হৈম ভ্রূকুটি করিয়া বলিয়া পাঠাইল, আদালতে আগে তার মীমাংসা হোক, তার পর তাঁর হয় তিনি নেবেন। এখন আমার দখলে আছে, পুকুর আমার।

দত্ত আরও একটু অগ্রসর হইয়াছিল। সে জোর করিয়া পুষ্করিণী দখল করিবার আয়োজন করিল। বিধবা হৈম মেয়ের হাত ধরিয়া পুকুরের পাড়ের উপর গিয়া দাঁড়াইল। ও-পারে তখন জেলেরা জাল গাঁথিতেছিল। কয়জন বরকন্দাজও দাঁড়াইয়া ছিল। হৈম উচ্চকণ্ঠেই বলিল, অনাথা ব্রাহ্মণকন্যার সম্পত্তি যে অন্যায় ক'রে বে-দখল করবে কি করতে সাহায্য করবে, আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি, তার মাথায় বজ্রাঘাত হবে, সে নির্বংশ হবে।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত থাকিয়া অবশেষে জেলেরা জাল গুটাইয়া লইয়া উঠিয়া গেল, বরকন্দাজেরাও চলিয়া গেল। চাটুজ্জেদের ব্রাহ্মণত্বের খ্যাতি এখানে কয়েক পুরুষ ধরিয়াই প্রসিদ্ধ। হিন্দু-মুসলমান সকলেই চাটুজ্জে বংশকে সভয়ে ভক্তি করিয়া থাকে। জ্ঞানাঞ্জন দত্তের অর্থের প্রতাপও সে ভয় ও ভক্তিকে বিচলিত করিতে পারিল না।

দত্তকে হৈম পরাভূত করিল বটে, কিন্তু মনে মনে সে একটি বেদনাদায়ক ক্লান্তি অনুভব না করিয়া পারিল না। সজল নেত্রে বিস্তৃত পৃথিবীর সর্বস্থান অনুসন্ধান করিয়াও সে কোন আত্মীয়ের সন্ধান পাইল না।

এই সময়ে ঘটকী মোক্ষদা-ঠাকরুন আসিয়া একদিন উপস্থিত হইল। মোক্ষদা এ চাকলার নাম করা ঘটকী, ঘোটকের পেশা তাহার তিন পুরুষের। আধুনিক যুগের শিক্ষিতা মেয়ে নয় মোক্ষদা, তবু সে লেখাপড়া জানে। পায়ে তাহার ক্যাম্বিসের জুতা, এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে থাকে ক্যাম্বিসেব ব্যাগ, লোকে তাহাকে ডাকে—ঘটকী মশায়, ছেলেরা ডাকে মিস্টার ঘটকী।

মোক্ষদা বহু স্থান ঘুরিয়াছে, সে উত্তব দেয়, ইয়েস, ম্যাবেজ ম্যাবেজ—কববি? নেম কি বল্—নাম নাম। লিখে নিই নোট-বুকে।

যাক, মোক্ষদা আসিয়া চাপিয়া বসিয়া বলিল, ম্যারেজ লক্ষ্মীব বিয়ে ঠিক করে এলাম বউ। বিয়ে দিয়ে জামাই আন্, যার ধন-সম্পত্তি সে দেখে নেবে। ডোণ্ট কেয়ার হারামজাদা দত্তকে।

হৈম যেন মনে মনে এই যুক্তিটি খুঁজিয়াই সারা হইতেছিল। সে সাগ্রহে বলিল, তাই ক'রে দাও দিকি দিদি। ভাল পাত্র। আমি তোমাকে খুশী কবব।

ঘটকী বলিল, যুগল মূর্তি—লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তি হবে। তোব লক্ষ্মী যেমন ছোট কচি মেয়ে, ছেলেও তেমনই তোব তেরো বছরের। বুটের বিউক্সিব মত রঙ, বাপ জমিদার, দত্ত শুয়োরটার দাঁত ভেঙে দেবে, বনেদী বংশ।

প্রবল আগ্রহে সে প্রশ্ন করিল, কে দিদি, কে?

ঘটকী বলিল, পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে কিন্তু আমাকে, আব গবদ একখানা। কত ক'রে আমি রাজী করিয়ে এসেছি। এখন কি বিয়ে দিতে চায় তারা!

হৈম এবার বিরক্ত হইয়া বলিল, নামটাই বল গো শুনি, তোমাকে খুশী কবব তো বললামই।

ঘটকী বলিল, অল্রাইট, খুব কাছে-পিঠের লোক, ই-বেলা উ-বেলা খবর পাবি তুই মেয়ের। বনেদী ঘর, বাপও মাথাওয়ালা জমিদার লোক, আবার ওলা-ঘোলা মানুষও বটে। কেমন কুটুম তোর হয় দেখবি বউ।

হৈমর মুখ দেখিয়া সে এবার হাসিয়া বলিল, আমাদের মেলানপুরের বাবুদের বাড়িতে, রাখালবাবুর মধ্যম ছেলে।

অতি-সাধারণ গৃহস্থপ্রধান এই অঞ্চলটির মধ্যে মেলানপুরের বাঁড়ুজ্জেদের নামডাক আছে। বুতুরে। গ্রামের পাশেই একখানা গ্রামের সিকি রকমের জমিদার বাঁড়ুজ্জেরা। রাখাল বাঁড়ুজ্জের মেজো ছেলেটিকেও হৈম দেখিয়াছে,

প্রায়ই সে এই পথ দিয়া মাসীর বাড়ি যায়। ছেলেটি সত্যাই ফুটফুটে।

হৈম সাত-পাঁচ ভাবিতেছিল। ঘটকী বলিল, বিয়ে তুই দিয়ে ফেল্ বউ। ঘর-বর ফাষ্টো-কেলাস, তার ওপর বাঁড়ুজ্জে মশায় তোর সহায় হ'ল, বেটা বেনে ল্যাজকুঁকুড়ি ক'রে ঘর পালাবে।

হৈম তখনও ভাবিতেছিল। ঘটকী আপন মনেই বলিয়া গেল, বেটা কুকুরের জাত শুধুহাতে দেখলেই তেড়ে আসবে, আর খেঁটে দেখলেই তখন পালাবে, আর বলবে যাস শালা যাস, আমাদের পাড়া দিয়ে যাস।

এতক্ষণ ধরিয়া হৈম যে চিন্তা করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতার একান্ত অভাব ছিল, সমস্ত চিন্তা জুড়িয়া বসিয়া ছিল এই জ্ঞানাঞ্জন দত্ত। আক্রোশে বার বার চিত্ত তাহার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সে এবার বলিল, দেরী করলে হবে না কিন্তু, এই মাসের মধ্যেই হওয়া চাই শুভকাজ।

ঘটকী বলিল, অল্রাইট, ভেরি গুড, বউ।

লক্ষ্মী ওপাশে খেলা করিতেছিল তাহাদের পোষা বিড়ালটাকে লইয়া। দুধের মত সাদা রঙের বিড়ালটা তাহার ছেলে, সে তাহাকে লইয়া যথেচ্ছ আদর ও নির্যাতন করিতেছিল। বিড়ালটা নিরাপত্তিতে চোখ বুজিয়া সব উপভোগ করিতে করিতে ঘড়ঘড় শব্দ করিতেছিল। সে এবার বিড়ালটাকে নামাইয়া দিয়া মাকে প্রশ্ন করিল, কবে বিয়ে হবে মা?

কিন্তু একটু বাধা পড়িল। লক্ষ্মীর কোষ্ঠী আনিয়া দেখা গেল, যোটক বেশ ভাল হয় না। বাঁড়ুজ্জে বলিল, বিবেচনা কর মোক্ষদা, কি ক'রে কি হয়?

ঘটকী বলিয়া উঠিল, নন্‌সেন্স কোথাকার! ছেলের কুষ্ঠী পাল্টে দাও।

কোষ্ঠীবিচার রাজযোটক হইয়া গেল। দেনা-পাওনা কিছুতেই বাধা পাইল না, হৈম সবেই রাজী হইল। সবই তো তাহার মেয়ে-জামাইয়ের, আপত্তি করিবার সে কে?

বাঁড়ুজ্জে এবার নিজে আসিল দিন স্থির করিতে। বারান্দায় গালিচার আসনের উপর জাঁকিয়া বসিয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল, বেয়ান যে আমার কনে-বউ হয়ে ঘরে ঢুকে বসলে গো—অ্যাঁ! বেয়াইয়ের খাতির হ'ল কই সুচির ভেতর ন্যাকড়া নাই, ধরগা যেঁয়ে, পানের ডিবেতে আরসুলাও পেলাম না, অ্যাঁ, কি বলে জলের ঘটিতে মাড়, তাও নাই। বিবেচনা কর, হবু বেয়াই।—বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ঘরের চৌকাঠের নীচেই বসিয়া ঘটকী হৈমর কথা বহন করিয়া বাঁড়ুজ্জেকে বলিতেছিল, সে বলিল, হবে হবে সে হবে, তখন সহ্য করতে পারলে হয়।

বাঁড়ুজ্জে এবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কত ধুমধাম এই বাড়িতে, বিবেচনা কর, বারো মাসে তেরো পাব্বণ লেগেই আছে, লেগেই আছে। বলে যে সেই—সে রামও নাই, সে অযুধ্যেও নাই।

আবার একটু নীরব থাকিয়া বলিল, ই-চাকলায়, বিবেচনা কর, বংশ বলতে দুটি—মেলানপুরের বাঁড়ুজ্জেরা আর এই বুহুরোর চাটুজ্জেরা। ই বলে আমাকে দেখ্, উ বলে আমাকে দেখ্। তা ধরগা যেঁয়ে, আবার সব হবে, হরন্দ বড হয়ে সব করবে, তার ওপর, ধরগা যেঁয়ে, জমিদারের ছেলে, দাবড়িয়ে সব ঠিক ক'রে দেবে।

হরন্দ ওরফে হরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জের মেজো ছেলে।

ঘটকী বলিল, বউ বলছে, সেই ভরসা ক'রেই তো পিতৃহীন অনাথা মেয়ে—

বাঁড়ুজ্জে বাধা দিয়া বলিল, দত্ত শালার কান কেটে দোব।

ঘটকী হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল। বাঁড়ুজ্জে বলিল, দেখে নিও তুমি। তার পরে যা বলছি শোন, আমার, ধরগা যেঁয়ে, বড বড জায়গায় যাওয়া-আসা, বন্ধু-বান্ধব তো যেনাতেনা নয়, বিবেচনা কর, এখন ধরগা যেঁয়ে, গোলাপজল আমার রায়-বাহাদুর—মটর কি, ইয়া মটর! তাব পরে, ধবগা যেঁয়ে, সব-রেজেস্টার, সে হ'ল হাকিম লোক—দারোগা, ই-সব, বিবেচনা কর, ইয়ার-বকসি বন্ধুনোক। তা ছাড়া জজ-মেজেস্টার, ধবগা যেঁয়ে, তাদিগে না হয় সব ছেড়েই দিলাম। তা ইয়েরা, বিবেচনা কর, আসবে, তাদেব মতন খাতিব--যত্ন—আঁা?

ঘটকী বলিল, হৈম বলছে, যেমন আপনি বলবেন, তেমনই হবে, আব আপনাকেই সব দেখে-শুনে, কিনে-কেটে—

আঁা—আঁাই, দেখে-শুনে কিনে-কেটে সব, ধরগা যেঁয়ে, আমাকেই ক'বে দিতে হবে! বেয়ান টাকা দিয়ে খালাস!

এই সময়ে কোথা হইতে লক্ষ্মী আপনার বিডাল-সন্তানটিকে কোলে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁডাইল। ঘটকী হাসিয়া বলিল, তোর শ্বশুর লো, পেন্নাম কর্।

বিডালটাকে নামাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ঠক করিয়া প্রণাম করিয়া দিল। বাঁড়ুজ্জে বলিল, বা-বা-বাঃ, ইয়ে ভারি সোন্দর মেয়ে গো—আঁা, ধরগা যেঁয়ে, নামেও লক্ষ্মী, কাজেও লক্ষ্মী!

তারপর হাসিয়া বেশ সরসভাবেই বলিল, তা ধরগা যেঁয়ে, বেয়ান তো মুখ আমাকে দেখালে না, নইলে শুনতে তো পাই, বেয়ান যে আমার ভারী

সুন্দরী গো। বিবেচনা কর, মায়েরই তো মেয়ে !

ঘটকী চোখ টিপিয়া নিষেধ করিল, হৈমর ললাটে তখন বিরক্তির ভ্রূকুটি-রেখা সারি সারি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, তা হ্যাঁ মা লক্ষ্মী, বিড়েলটি তোমার কে গো ? ছেলে নাকি ? বাঃ, বিড়েলটি তো বেশ !

সে বিড়ালটাকে কাছে ডাকিল, আঃ আঃ পুসি, আঃ।

বিড়ালটা কিন্তু ফুলিয়া এতখানি হইয়া গর্জন করিয়া উঠিল। রাখাল বাঁড়ুজ্জে বলিল, ও বাবা রে ! ই যে ফোঁস-ফোঁস করছে গো ! ধরগা যেঁয়ে, ই তো আচ্ছা বিড়েল, ও বাবা রে ! হেট্ হেট্, ওই ওই, বলি, ইয়ের রোক যে বাড়ছে গো ! বাঁড়ুজ্জে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মী বিড়ালটাকে টানিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া তুই চড় বসাইয়া দিয়া তিরস্কার করিল, পোড়ারমুখী, আমার শ্বশুর - চিনতে পারছ না তুমি ?

ঘটকী বলিল, লক্ষ্মী, ওটাকে নিয়ে যা তুই এখান থেকে, তোর মা বলছে।

বিবাহ নির্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল, কিন্তু হৈম অনুতপ্ত না হইয়া পারিল না। পণ্ডিতের ঘরের কন্যা, পণ্ডিতের ঘরের বধূ সে, লেখাপড়াও জানে, একবার ভুল করিলেও দ্বিতীয়বার ভুল তাহার হইল না।

বিবাহের পরই সে ঘটকীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেয়াই তোমাকে কত টাকা দেবে ?

ঘটকী দেশের লোক চরাইয়া খায়, সে হৈমর কথার সুরের ঝাঁজেই চমকিয়া উঠিয়াছিল। সে নিরীহের মত প্রশ্ন করিল, কি, হ'ল কি তোর ?

হৈম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাঘের হাত থেকে তুমি শেষে কুমিরের হাতে ফেলে দিলে আমাকে !

ঘটকী বলিল, ভারি ঝগড়াটে বাপু তুমি। বাঁড়ুজ্জে বার বার আমাকে বলেছিল, তা কেবল আমার কথায়—

হৈম সোজা তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, হুঁ।

ঘটকী এবার কেমন হইয়া গেল, অবশেষে কহিল, কি, হ'ল কি বউ ?

হৈম বলিল, কিছু হয় নাই, তুমি যাও।

বিবাহের বাজার দেখিয়া হৈম প্রথম চমকিয়া উঠিয়াছিল। তারপর বিবাহের রাত্রে বর-কন্যা বাসরে যখন গেল তখন তাহার অশ্রু উথলিয়া উঠিয়াছে, সে চলিয়াছিল স্বামীর জন্য কাঁদিতে। অকস্মাৎ পিঠে একটা ঢেলা খাইয়া সে

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, অদূরে দাঁড়াইয়া রাখাল হাসিতেছে। হাসিতে হাসিতেই রাখাল বলিল, পান, বলি, ধরগা যেঁয়ে, দুটো পান দাও দেখি বেয়ান, তোমার নিজের হাতে সেজে।

সামান্য কয়েক মুহূর্ত সে বেয়াইয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর একটা ঘর খুলিয়া কতকগুলি পান একখানা রেকাবিতে সাজাইয়া আনিয়া নামাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

কয়দিন পরের কথা।

ইতিমধ্যে মেয়ে ও জামাই অষ্টমঙ্গলা উপলক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছে। হৈম জামাইটিকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল ছেলেটির চেহারাই শুধু মিষ্টি নয়, কথাবার্তাও মিষ্টি, স্বভাবখানিতেও একটু মাধুর্য আছে। সেদিন জামাই মেয়ে ও মা তিনজনে কড়ি লইয়া দশ-পঁচিশ খেলিতেছিল। সহসা বাহিরের দরজায় বাঁড়ুজ্জের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া হৈম চমকিয়া উঠিল।

বাঁড়ুজ্জের কেমন ভীতিত্রস্ত কণ্ঠস্বর। হৈম হরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া আসিল। বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া ত্রস্তভাবে বাঁড়ুজ্জে বলিতেছিল, ওই, ই তো ভারি বিপদ করলে গো! ই যে গোঁ-গোঁ করে! ফুলে উঠেছে দেখ! ওই, এগিয়ে আসছে যে! লাফ-টাফ দেবে নাকি?

সম্মুখেই বিড়ালটা সর্বাঙ্গ ফুলাইয়া ক্রুদ্ধ বিক্রমে গর্জন করিতেছিল।

লক্ষ্মীও পিছনে পিছনে আসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, বিড়েলটি, বিবেচনা কর, একেবারেই ভাল লোক নয় বেয়ান। ধরগা যেঁয়ে, যে রকম গোঁ-গোঁ করছে, কোন্ দিন হয়তো বিপদ করে বসবে। বাঘের মাসী ওরা, ধরগাঁ যেঁয়ে, গলার নলিটিতে যদি লাফ দিয়ে ধরে, তা হ'লে, বিবেচনা কর, একেবারে দুফাঁক ক'রে দেবে। ওকে তাড়াও তুমি।

হরেন বলিল, আমাকে কিছু তো বলে না বাবা। দিব্যি আমার কোলে শুয়ে থাকে, ঘড়ঘড় করে।

শিহরিয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল না বাবা, হাত-টাত দিও না। বিবেচনা কর, দাঁতাল-মাতাল-শিঙে বিশ্বেস নেই তিনে। ধরগা যেঁয়ে, ওরা হ'ল দাঁতাল, তার ওপর, ধরগা যেঁয়ে, বাঘের মাসী ওরা। তাড়াও তুমি বেয়ান ওকে, তাড়াও তুমি।

লক্ষ্মীর মুখ শুকাইয়া গেল।

কোন উত্তর না পাইয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল, সে বিবেচনা কর, যা হবার হচ্ছে, এখন বেয়ানের দরবারে বেয়াইয়ের আগমনের কারণ শোন। ধরগা যেঁয়ে, যেদিন থেকে তোমাদের ভার নিয়েছি, সেদিন থেকে আমার, ধরগা যেঁয়ে ঘুম নাই। বলি, আর তো, ধরগা যেঁয়ে, সে বামুন-পণ্ডিতের ঘর নয়, এখন ধরতে হবে হরন্দর ঘর, বিবেচনা কর, মেলানপুরের জমিদার-বংশের। তা ধরগা যেঁয়ে, তার যা মান-খাতির, উ তোমার লোক-লৌকুতো—সবই, বিবেচনা কর, বজায় রাখতে হবে। অ্যাঁ, না কি বলছ বেয়ান? ধরগা যেঁয়ে, শৈলজাবাবুর লাতি রাখালবাবুর ছেলে—অ্যাঁ! বলি, কি বলছে রে তোর শাশুড়ী হরন্দ?

হরেন্দ্র শাশুড়ীর কথা শুনিয়া বলিল, তা বটে বইকি।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, অ্যা—অ্যাই, তা বটে বইকি। ধরগা যেঁয়ে, বেশি তো কিছু বলতে হবে না, বিবেচনা কর, উনি তো তোমার বুদ্ধিমান মেয়ে। তা হ'লে, ধরগা যেঁয়ে, খান তিরিশ গাড়ি হ'লেই হবে। না কি গো বেয়ান?

হৈম এ কথার মর্ম কিছু বুঝিতে পারিল না। হরেন্দ্র বলিল, তুমি কি বলছ বাবা, বুঝতে পারছেন না উনি। গাড়ি কি হবে?

বাঁড়ুজ্জে বলিল, উঁহু, তিরিশখানাতে হবে না। দুটো বাখারে ধানই, ধরগা যেঁয়ে, দশ পৌটি, তা খুব। বিবেচনা কর, পঞ্চাশ মণে পৌটি, তা হ'লে হ'ল, ধরগা যেঁয়ে, পাঁচশো মণ। ওইখানেই তো বিবেচনা কর, তিরিশখানা বত্তিরিশখানা লাগবে। তারপরে বিবেচনা কর, বাসন-কোসন, তাও খান পাঁচেক, ধরগা যেঁয়ে, যেনাতেনা ঘর তো নয়, বুনেদী পণ্ডিতের ঘর, দানের ঘড়াই তো, বিবেচনা কর, পাঁচ গাড়ি হবে। তা, তোমার না হয় খান-আষ্টেক। এই তো, ধরগা যেঁয়ে, বত্তিরিশ আর আষ্টে হল, ধরগা যেঁয়ে, চল্লিশ। মনে রাখিস হরন্দ, চল্লিশ। তারপরে ধরগা যেঁয়ে—

মধ্যপথেই হরেন্দ্র বলিল, গাড়ি-টাড়ি চাই না বাবা, উনি কোথাও যাবেন না, বলছেন।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, তা তো বলবেনই উনি গো। বিবেচনা কর, ঘর ছেড়ে যেতে কি মন চায় নাকি সহজে? ধরগা যেঁয়ে, এতদিনের ঘর-দুয়োর তোমার মহামায়ার মায়া, ধরগা যেঁয়ে, কাটানো কি সোজা কথা নাকি! কিন্তু না গেলে, বিবেচনা কর, দু তরফা খরচ, লোকসান তো তোমারই বাবা হরন্দ। উনি কে, উনি তো ধরগা যেঁয়ে, খাবার পরবার মালিক।

এ কথার কোন জবাব আসিল না। হৈম স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, শরীর যেন দুর্বল হইয়া গিয়াছে। এ কথা সত্য

এবং হৈমরও এ সত্য অজানা নয়; কিন্তু এমন ক্রূর মূর্তিতে সে কথা কেহ কোন দিন তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করে নাই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাঁড়ুজ্জে বলিল, তোমারই কন্যে, ধরগা যেঁয়ে, তোমারই জামাই, বিবেচনা কর, আমরা তো পর গো। এখানেও যেমন সর্ব্বময়ী কত্তা, ধরগা যেঁয়ে, সেখানেও সেই তাই! অ্যাঁ? বলি হরন্দ, কি বলছে রে তোর শাশুড়ী?

হরেন্দ্র একবার শাশুড়ীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, কিছুই বলছেন না বাবা!

বাঁড়ুজ্জে বলিল, বলবে আর কি! বেশ বেশ, তাই হবে! বলি, তা হলে গাড়ি কখানা হ'ল মনে আছে তো তোর হরন্দ? চল্লিশখানা। আর, ধরগা যেঁয়ে, ইদিক উদিক সেও খান পাঁচেক, আর ধরগা যেঁয়ে, পালকী একখানা—বেয়ান যাবেন। আমি একটা লাল পাগুড়ি মাথায় বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে যাব।—বলিয়া আপন রসিকতায় সে হাসিয়া সারা হইল।

এ কথারও কোন জবাব আসিল না। বাঁড়ুজ্জে আবার বলিল, বলি, তোর শাশুড়ী কি বোবা হয়ে গেল নাকি রে হরন্দ – অ্যাঁ?

হরেন্দ্র ঠিক বালক নয়, কৈশোরত্ব তাহার শুরু হইয়া গিয়াছে। প্রথমটা না বুঝিলেও, শাশুড়ীর নির্বাক স্তব্ধ ভাব দেখিয়া ক্রমশ সে অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করিতেছিল। আর, একটা কথা তাহাকেও বড় বাজিয়াছিল, ওই – উনি কে, উনি তো শুধু খাবার পরবার মালিক। সে ম্লানমুখে শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বাপের কথার কোন উত্তর দিল না।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, দুটো মেথি-খোল-বচ-একাঙ্গী ভেজে দিতে বল্ তো তোর শাশুড়ীকে হরন্দ, মাছ একটা বড় দেখে মারি। হুইল তগী সঙ্গে নিয়েই এলাম; বলি, ধরগা যেঁয়ে, লিখিবি পড়িবি মরিবি দুখে, মচ্ছ ধরিবি খাইবি সুখে। তা বিবেচনা কর, রেতে যখন থাকতে হবে, বলি, তরকারিটা—না কি রে হরন্দ? আয় আয়, আমি হুইল ধরব, তুই বসবি তগীর ধারে।

মাছ একটা বাঁড়ুজ্জে মারিয়াছিল। সেটাকে দড়াম করিয়া উঠানে ফেলিয়া দিয়া বলিল, অ্যাই লাও বেয়ান, ভারি শিকেরী বেয়াই তোমার হে। লাও, ভাল ক'রে, ধরগা যেঁয়ে, তোমার রাঙা হাতে বেশ ভাল ক'রে রান্নাবান্না কর।

দাওয়ায় দুইজন নিম্নশ্রেণীর লোক বসিয়া ছিল, একজন উঠিয়া আসিয়া মাছটা তুলিয়া লইয়া বলিল, আর দেরি করলে রাত অনেক হয়ে যাবে বাবু।

বাঁড়ুজ্জে লোকটার মুখের দিকে চাহিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, তুমি বাড়ি যাও বাবা, ওরা তোমাকে রেখে আসবে।

বাঁড়ুজ্জের বিস্ময় ক্রমশ বাড়িতেছিল, সে ঘোর কাটাইয়া উঠিবার পূর্বেই আবার হরেন্দ্র বলিল, আর শাশুড়ী বলছেন, কোথাও যাবেন টাবেন না, গাড়ি তুমি পাঠিও না।

কিছুক্ষণ পর বাঁড়ুজ্জে বলিল, তা হ'লে তোমার জামা-কাপড় বার ক'রে আন বাবা হরন্দ। ধরগা যেঁয়ে, তোমার বাবা, বিবেচনা কর, জন্মদাতা পিতা, তার যেখানে অপমান হয়—অ্যাঁ, বলি শুনছ?

বাঁড়ুজ্জে ছেলেকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার ছইল তগী পড়িয়া রহিল. মাছও সে লইল না।

আশ্চয মেয়ে হৈম। বেয়াই রাগ করিয়া জামাই লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু সে এক বিন্দু দমিল না। অন্তত বাহ্যিক ব্যাকুলতা এক বিন্দু কেহ দেখিতে পাইল না। দিন কয়েক পর এক ছই-বাঁধা গাড়ি লইয়া একজন লোক আসিল লক্ষ্মীকে লইতে। হৈম বলিয়া দিল, মেয়ে আমি এখন পাঠাব না। ছোট মেয়ে, থাকতে পারবে কেন? বেয়াই না বোঝেন, বেয়ানকে বুঝিয়ে ব'লো তুমি বাবা, তিনিও তো মেয়ের মা।

হৈম পত্রও একখানা লিখিয়া দিল, বলিয়া দিল, বেয়ানকে মুখেও ব'লো বাবা তুমি, আর পত্রখানি যেন তাঁরই হাতে দিও।

আরও দিন কয়েক পর।

হৈম ঘরের বারান্দায় বসিয়া কবিকঙ্কণের মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান পড়িতেছিল। অকস্মাৎ পদশব্দে মুখ তুলিয়া সে দেখিল, হরেন্দ্র উঠানে দাঁড়াইয়া। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, এস বাবা আমার, এই রোদে! এস এস, উঠে এস!

কিন্তু বহির্দ্বারে বেয়াইয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। বাঁড়ুজ্জে ডাকিয়া বলিতেছিল, হরন্দ, বলি, বিড়েলটা রয়েছে নাকি বাবা? থাকে তো তাড়িয়ে দাও। ধরগা যেঁয়ে, ভারি পাজি ওটা।

হরেন্দ্র বলিল, না বাবা, নাই।

বাঁড়ুজ্জে বাড়ি ঢুকিতেই, হৈম ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। বাঁড়ুজ্জে হরেন্দ্রকে বলিল, বলেছ বাবা হরন্দ, তোমার শাশুড়ীকে? ধরগা যেঁয়ে, ঝগড়া-বিবাদ, বিবেচনা কর, শেষ পর্যন্ত আইন-আদালত কুটুমের সঙ্গে, সে তো, ধরগা যেঁয়ে, ভাল নয়।

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। বাঁড়ুজ্জে আবার বলিল, আমিই বলি, বউমাকে পাঠিয়ে দিতে হবে বেয়ান।

কেহ কোন উত্তর দিল না। বাঁড়ুজ্জে বলিল,শোন্ কেনে রে হরন্দ, কি বলছে তোর শাশুড়ী ?

হরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া গেল, কিন্তু সেও কোন উত্তর দিল না। বাঁড়ুজ্জে বলিল, ই তো, ধরগা যেঁয়ে, যে-সে ঘরে বিয়ে হয় নাই, বুনেদী জমিদারের ঘরের বউ, বিবেচনা কর, মেলানপুরের শৈলজাবাবুর লাত-বউ। ধরগা যেঁয়ে, রীত-করণ চাল-চলন, বামুন-পণ্ডিতের চাল-কলা-বাঁধা ঘরে—

এবার অর্ধপথেই হরেন্দ্র উত্তর দিল, বড় হ'লে আপনিই শিখবে। ছেলেমানুষ এখন গিয়ে থাকতে পারবে না। আর সে সব শিখিয়ে দেবেন উনি।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, হুঁ। তা হ'লে, ধরগা যেঁয়ে, বলতেই হ'ল, আমার বউ আমি যদি—

এবার ঘরের ভিতর হইতে হৈমর কণ্ঠস্বরই ভাসিয়া আসিল, আমারও মেয়ে, আমি মেয়ের বিয়েই দিয়েছি, বিক্রি করি নাই।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, বলি, দান তো করেছ গো, বিবেচনা কর, দত্তা ধনে—

হৈম বলিল, না, স্বত্ব থাকবে না—এমন দানও আমি করি নাই। সম্পত্তিতেও এখন জীবনভোর স্বত্ব আছে আমার, দত্ত আমাকে ব'লে পাঠিয়েছে। ওসব মতলব আপনি ছাড়ুন।

বাঁড়ুজ্জে হতবাক্ হইয়া গেল। দত্তের নাম শুনিয়াই সে বুঝিল, এ জ্ঞানাঞ্জন দত্তের কীর্তি। দত্ত স্থযোগ ছাড়ে নাই; এখানে তাহার একটু ভুল হইয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর সে বলিল, হুঁ, ধরগা যেঁয়ে, মনে করেছিলাম, আসল কথা আর বলব না, বিবেচনা কর, আপন জন, হরন্দর এক রকম মা, শাশুড়ীও তো, ধরগা যেঁয়ে, মা। তা ধরগা যেঁয়ে, কোন রকমে থাপথুপ ক'রে দেব। তা ধরগা যেঁয়ে, বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। এই ধরগা যেঁয়ে, মুনিষ-মান্দের ছোটলোক, ছোটজাত, ওদিকে নিয়ে ই তো ভাল লয়। আর ধরগা যেঁয়ে, কথাও তো গোপন নাই।

ঘরের মধ্য হইতে তীব্রকণ্ঠে ভাসিয়া আসিল, বেরিয়ে যান, আপনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, থাকতে তো আসি নাই গো। এসেছি, ধরগা যেঁয়ে, আমার বউ নিতে। তা আমি গাঁয়ের ভদ্রলোক ডাকি, তারা যদি বলে, তবে চ'লেই যাব আমি। আমার, ধরগা যেঁয়ে, চারিদিকে নামডাক, দারোগা হাকিম রায়বাহাদুর আমার বন্ধুলোক। আমাকে তো তুমি যেনাতেনা পাও নাই

বাপু। কলঙ্ক, ধরগা যেঁয়ে, আমার বেয়ান এই রকম—

আরও কঠিন কণ্ঠে হৈম বলিল, বেরিয়ে যান বলছি।

বাঁড়ুজ্জে বেশ জাঁকিয়া বসিল। হরেন্দ্রকে লইয়া বহির্বাটিতে আসন পাতিয়া সে বসিয়া রহিল, কাল সকালে ভদ্র লোকজন ডাকা হইবে।

হৈমর চোখে ঘুম ছিল না, জল ছিল না, ছিল জ্বালা। লক্ষ্মী কোলের কাছে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অকস্মাৎ একটা চিৎকারে সে চকিত হইয়া উঠিল।

বাঁড়ুজ্জে চিৎকার করিতেছিল।

সে দরজা খুলিল না, উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

লোকজন বোধ হয় জমিয়া গিয়াছে, সমষ্টিভূত কণ্ঠস্বরের গুঞ্জন শোনা যাইতেছে।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, চিনতে পারলাম না, অ্যাই কালো জোয়ান। হরন্দ বাইরে উঠেছিল—

হৈম দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল, আর সে থাকিতে পারিল না। তাহারই উঠানে দাঁড়াইয়া জনতার মধ্যে বাঁড়ুজ্জে বলিতেছিল, হরন্দ গিয়ে ঘর ঢুকল, আমি একা দাঁড়িয়ে, অ্যাই কালো জোয়ান, ধরগা যেঁয়ে, আঁধার রাত, চিনতে পারলাম না। বললে বিবেচনা কর, আমি শুনতে পেলাম বললে—বেয়ানের কথা নিয়ে যদি গোল করবি, কেটে ফেলাব। ধরগা যেঁয়ে, ওই যে—দাঁড়িয়ে রয়েছে, জিজ্ঞেস কর কেনে ওই নচ্ছার মাগীকে, কে বটে সে?

হৈম স্তম্ভিত হইয়া অনবগুণ্ঠিত মুখে স্থির দৃষ্টিতে জনতার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাঁড়ুজ্জে বলিল, আর লয় বাপু, এখুনি বাড়ি যাব আমি। ওরে, তোল্ রে, আমার গাড়ি তোল্। বিছেনা তুলে পাত্ গাড়িতে। ধরগা যেঁয়ে, এই দেখ, দড়িটে আবার পাচ্ছি না। ভাল দড়ি, সুতোর দড়ি, জেলখানা থেকে এনেছিলাম, বিবেচনা কর, ওই দড়িতে জেলে ফাঁসি দেয়। গলায় দিয়ে ঝুলে পড়লেই, ব্যাস, এক মিনিটে। তা থাক্ বাপু, ধরগা যেঁয়ে, ওই ঘরেই তো রইল, একদিন, ধরগা যেঁয়ে, লোক পাঠিয়ে—

দিন দুই পর। একটি লোক সঙ্গে করিয়া বাঁড়ুজ্জে একরূপ ছুটিতে ছুটিতে বেয়ানের বাড়িতে আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না, তাহার পূর্বেই সব শেষ হইয়া গিয়াছে। হৈম জ্ঞানাঞ্জন দত্তকে সমস্ত সম্পত্তিতে তাহার জীবন-স্বত্ব বিক্রয় করিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া কাশী চলিয়া গিয়াছে। শূন্য ঘর-দুয়ার

পড়িয়া আছে। বাঁড়ুজ্জে বাহিরের ঘরে মিথ্যা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ঘরখানার সম্মুখেই একটা পেরেকে তাহার সেই ফাঁসির দড়িটা ঝুলিতেছে। একটা তাকের উপর তগীটা পড়িয়া আছে, কোণে হুইলগাছি ঠেসানো রহিয়াছে।

বাহিরের ঘর হইতে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া বাঁড়ুজ্জে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। শূন্য বাড়িটার দাওয়ার উপর কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে -সেই বিড়ালটা। তাহাকে দেখিবামাত্র বিড়ালটার এক মুহূর্তে রূপ পরিবর্তিত হইয়া গেল, ক্রুদ্ধ বিক্রমে ফুলিয়া উঠিয়া হিংস্রভাবে সে গর্জন করিয়া বাঁড়ুজ্জেকে যেন আক্রমণের উদ্যোগ করিল। বাঁড়ুজ্জে দ্রুতপদে আসিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দরজা অল্প ফাঁক করিয়া দেখিতে লাগিল। বিড়ালটা যেন আজ উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে। সে ছুটিয়া দরজার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিল। সেই মুহূর্তে বাঁড়ুজ্জে আপনার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া দরজা দুইখানা চাপিয়া ধরিল, তখন হতভাগ্য পশুটার মাথাটা ঘরের মধ্যে, দেহখানা বাহিরে। দুইখানা দরজার পেষণে তাহার কণ্ঠদেশটা বাঁড়ুজ্জে চাপিয়া ধরিয়াছে। প্রথমেই হিংস্র ও যন্ত্রণাকাতব একটা অদ্ভুত শব্দ পশুটার মুখ হইতে একটুখানি বাহির হইয়া অসমাপ্ত থাকিয়া গেল । দেখিতে দেখিতে চোখ দুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিল , একটা চোখ অকস্মাৎ ছিটকাইয়া বাহির হইয়াও গেল। কঠিন কাঠের সবল পেষণে কণ্ঠদেশটা তখন পাতলা চেপ্টা হইয়া গিয়াছে। তারপর বাড়িখানা নিস্তব্ধ। ঠিক নিস্তব্ধ নয়, কোন্ অন্ধকার কোণে একটা ঝিঁঝিপোকা ডাকিয়া ডাকিয়া যেন কাহারও সাড়া না পাইয়া মধ্যে মধ্যে নীরব হইতেছিল।

নারী ও নাগিনী

ইটের পাঁজা হইতে খোঁড়া শেখ ইট ছাড়াইতেছিল। খোঁড়া শেখের নাম যে কি তাহা কেহ জানে না, বোধ করি খোঁড়ার নিজেরও মনে নাই। কোন্ শৈশবে তাহার বাঁ পাখানি ভাঙার পর হইতেই সে খোঁড়া নামেই চলিয়া আসিতেছে। শুধু পাখানিই তাহার খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে—সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর। তারপর হয় তাহার বসন্ত, সেই বসন্তের দাগে কুৎসিত খোঁড়া দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার মনেই খোঁড়া ইট ছাড়াইতেছিল।

অদূরে অদাই ওরফে ওয়ায়েদ শেখ গাড়ি লইয়া আসিতেছিল। গরু দুইটার লেজ দুমড়াইয়া সে গান ধরিয়া দিল—একটা অশ্লীল গান। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার তাল ভঙ্গ হইয়া গেল। গরু দুইটা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অদাই একটা ঝাঁকানি খাইয়া গান ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, শালার গরু, কিছু না বলেছি—

প্রচণ্ড ক্রোধে পাচন-ছড়িটা সে তুলিল গরু দুইটার অবাধ্যতার শাস্তি দিতে। গরু দুইটাও ক্রমাগত ফোঁস ফোঁস করিয়া গর্জন করিতেছিল। অদাইয়ের কিন্তু আর প্রহার করা হইল না, চিৎকার করিয়া উঠিল, খোঁড়া, খোঁড়া, সাপ - সাপ!

অদাইয়ের গাড়ির সম্মুখেই একটি কিশোর সাপ ফণা তুলিয়া অল্প অল্প দুলিতেছিল। অদাই গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটা ইট উঠাইল।

ওদিকে খোঁড়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, মারিস না অদাই, মারিস না। যাই, আমি যাই।

অদাইয়ের হাতের ইট তোলাই রহিল, সে বলিল, কি বাহারের সাপ মাইরি! মুখখানা সিঁদুরের মত টকটকে লাল! মাথার চক্করই বা কি বাহারের! কিন্তু পালাল—পালাল যে, শিগগির আয়।

সাপটা এইবার দ্রুতবেগে পলাইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু চলিয়াছিল খোঁড়ার দিকেই, অদাইকে পিছনে ফেলিয়া পলায়নই তাহার উদ্দেশ্য। খোঁড়াকে সে দেখে নাই।

খোঁড়া হাঁকিল, দে তো অদাই তোর পাচনখানা ছুঁড়ে। যাঃ রে, ঢুকে পড়ল পাঁজার ভেতরে! উদয়নাগ রে সাপটা, এ সাপ বড় পাওয়া যায় না।

ধরতে পারলে কিছু রোজগার হ'ত রে।

খোঁড়া সাপের ওঝা। শুধু ওঝা নয়, সাপ লইয়া খেলাও সে করে। ঘরের চালের কানাচে বড় বড় মুখ-বন্ধ হাঁড়ি তাহার খাটানোই আছে। তাহার মধ্যে সাপগুলোকে সে বন্দী করিয়া রাখে। জীর্ণ হইলে দূর মাঠে গিয়া তাহাদের ছাড়িয়া আসে। কত সাপ মরিয়াও যায়। সাপ যখন থাকে, তখন খোঁড়া মজুর খাটে না। তখন দেখা যায়, বিষম-ঢাকি ও তুবড়ি-বাঁশী লইয়া খোঁড়া সাপের খেলা দেখাইতে চলিয়াছে। রোজগারও মন্দ হয় না। কিন্তু গাঁজা-আফিমের বরাদ্দ তখন বাড়িয়া যায়। কখনও কখনও মদও চলে। ফলে সাপ-গুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়া আবার ঝুড়ি ও বিড়া লইয়া বাহির হয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে বীভৎস মুখখানি ঈষৎ বাড়াইয়া বলে, মজুর খাটাবে গো মজুর?

তোষামোদ করিয়া সে হাসে, বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ আরও বীভৎস আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে; মজুরি মিলিলে সে প্রাণপণে খাটে, সেখানে সে ফাঁকি দেয় না। যে দিন না মেলে, সেদিন ঝুড়ি কাঁধেই ভিক্ষা আরম্ভ করে। যাহা পায়, তাহা দিয়াই খানিকটা গাঁজা-আফিম কেনে। কিনিয়াও যদি কিছু থাকে, তবে খানিক পচাই মদ গিলিয়া বাড়ি ফিরিয়া জোবেদা বিবির পা ধরিয়া কাঁদিতে বসে, বলে, আমার হাতে প'ড়ে তোর দুদ্দশার আব সীমা থাকল না! না খেতে দিয়ে তোকে মেরে ফেললাম।

জোবেদা হাসিতে হাসিতে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলে, লে —লে, লে, খেপামি করিস না, ছাড়্ আমাকে—দুটো চাল দেখে আনি।

খোঁড়ার কান্না বাড়িয়া যায়, সে এবার জোবেদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, একজেরা নতুন কানি কখনও দিতে লারলাম। পুরনো তেনা প'রেই তোর দিন গেল।

যাক ওসব কথা। পরদিন অতি প্রত্যূষে খোঁড়া ইটের পাঁজাটার কাছে আসিয়া হাজির হইল। হাতে ছোট একটা লাঠি। বগলে একটা ঝাঁপি। সম্মুখে পূর্ব-দিক্‌চক্রবালে সবে রক্তাভা দেখা দিতে শুরু করিয়াছে। গাছের বুকের মধ্যে বসিয়া পাখিরা মুহুর্মুহু কলরব করিতেছিল। গ্রামের মধ্যে কোন হিন্দু-দেবমন্দিরে মঙ্গলারতির শঙ্খঘণ্টা বাজিতেছে। একটা উঁচু ঢিপির উপর বসিয়া খোঁড়া চারিদিকে সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল।

পূর্বাচলের রাঙা রঙ ক্রমশ গাঢ় হইয়া পরিধিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। সে রঙের আভায় পাঁজার পোড়া ইটগুলা আরও রাঙা হইয়া উঠিল। খোঁড়ার

ময়লা কাপড়খানায় পর্যন্ত লাল রঙের ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। খোঁড়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওই—ওই না?

ঈষদ্দূরে প্রান্তরের বুকে বোধ হয় সেই কিশোর সাপটিই পূর্বাকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ফণা নাচাইয়া খেলা করিতেছিল। প্রাতঃসূর্যের রক্তাভায় তাহার রঙ দেখাইতেছিল যেন গাঢ় লাল। সেই লাল রঙের মধ্যে ফণার ঘন কালো চক্রচিহ্ন অপূর্ব শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতির রাঙা পাখার মধ্যে কালো বর্ণলেখার মতই সে মনোরম। খোঁড়া মুগ্ধ হইয়া গেল। আপনার মনেই মৃদুস্বরে সে বলিয়া উঠিল, বাঃ!

তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সর্পশিশু উদীয়মান সূর্যের অভিনন্দনে এত মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, খোঁড়ার পদশব্দেও তাহার খেলা ভাঙিল না। অতি সন্নিকটে আসিতেই সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। পর-মুহূর্তেই সে গর্জন করিয়া ছোবল মারিল। কিন্তু ফণা আর সে তুলিতে পারিল না। খোঁড়া ক্ষিপ্রহস্তে বাঁ হাতের লাঠিখানি দিয়া তখন তাহার মাথা চাপিয়া ধরিয়াছে। ডান হাতে সাপের লেজ ধরিয়া গোটা-তুই ঝাঁকি দিয়া খোঁড়া বেশ করিয়া সাপটিকে দেখিয়া বলিল, সাপিনী।

মাস ছয়েক পর। গাঁজার দোকান হইতে ফিরিয়া খোঁড়া জোবেদাকে বলিল, কি এনেছি দেখ্।

উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে বুলাইতে জোবেদা বলিল, কি?

কাপড়ের খুঁট খুলিয়া খোঁড়া ছোট চিকচিকে একটি বস্তু বাহির করিয়া হাতের তালুর উপর রাখিয়া জোবেদার সম্মুখে ধরিল। বস্তুটি ছোট একটি মিনি - নাকে পরিবার অলঙ্কার।

জোবেদা প্রশ্ন করিল, এত ছোট মিনি কি হবে?

হাসিয়া খোঁড়া বলিল, বিবিকে পরিয়ে দেব।

জোবেদা অবাক হইয়া গেল। হাসিতে হাসিতে খোঁড়া ঘরে প্রবেশ করিল। তারপর গলায় একটি সাপ জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। সেই সাপটি। এতদিনে আরও একটু বড় হইয়াছে। কিন্তু সে তেজ নাই। শান্ত আক্রোশ-হীন ভাবে ধীরে ধীরে মুখটি ঈষৎ তুলিয়া খোঁড়ার গলায় কাঁধে ফিরিতেছিল। জোবেদা বলিল, দেখ, ও ক'রো না। যতই তেজ না থাক, ও জাতকে বিশ্বাস নাই।

হাসিয়া খোঁড়া বলিল, বিশ্বাস নাই ওদের বিষ-দাঁতকে। নইলে ওরাও তো

ভালবাসে জোবেদা। বিষ-দাঁতই নাই, কিন্তু আর দাঁত তো রয়েছে, কই, আমাকে তো কামড়ায় না। কেমন ভাল মেয়ের মত বিবি আমার ফিরছে বল্ দেখি বলিয়া সে সাপটির ঠোঁট দুইটি চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে একটা চুমা খাইয়া বসিল।

জোবেদা বিস্মিত হইল না, কারণ এ দৃশ্য তাহার নিকট নূতন নয়। কিন্তু সে বিরক্তিভরে বলিল, ছি ছি ছিঃ! তোমার কি ঘেন্না পিত্তিও নাই? কত বার তোমাকে বারণ করেছি, বল তো?

সে কথায় খোঁড়া কানই দিল না। সে বলিল, দেখ্, দেখ্, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ্ দেখি! জানিস, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে, তখন ঠিক এমনই ক'রে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস কখনও? আঃ সে যে কি বাহারের খেলা মাইরি!

জোবেদা বলিল, দেখে আমার কাজ নাই, তুই দেখেছিস সেই ভাল। কিন্তু তোর খেলাও ওই শেষ করবে, তা বুঝিস!

খোঁড়া তখন একটা সূচ লইয়া বিবির নাক ফুঁড়িতে বসিয়াছে। পায়ের আঙুল দিয়া সাপটার লেজ চাপিয়া ধরিয়াছে, আর বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়াছে মুখটা। ডান হাতে সূচ ধরিয়া নাক ফুঁড়িয়া মিনি পরাইয়া দিয়া সাপটাকে ছাড়িয়া দিল। যন্ত্রণায় ক্রোধে গর্জন করিয়া বিবি বারংবার খোঁড়াকে ছোবল মারিতে আরম্ভ করিল। ঝাঁপির ডালাটা ঢালের মত সম্মুখে ধরিয়া বিবির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে সে বলিল, রাগ করিস না বিবি, রাগ করিস না। দেখ্ তো কেমন খুবসুরৎ লাগছে তোকে। দে তো জোবেদা, আয়না দে তো। দেখুক একবার নিজের চেহারাখানা।

জোবেদা বলিল, লারব আমি।

দে দে, তোর পায়ে পড়ি, একবার দে। দেখি না, নিজের চেহারা দেখে ও কি করে!

জোবেদা স্বামীর এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আয়না আনিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।

খোঁড়া বলিল, একজেরা সিঁদুরও আনিস তো মেহেরবানি ক'রে।

জোবেদা ঘর হইতেই প্রশ্ন করিল, কি, হবে কি?

পরম কৌতুকে হাস্য করিয়া খোঁড়া বলিল, দেখবি কি হবে। আগে হতে বলছি না।

জোবেদা আয়না সিঁদুর লইয়া আসিয়া ঈষদ্দূরে নামাইয়া দিল। খোঁড়া

সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটি কাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপটির মাথায় একটি লাল রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হ'ল।

পরে বিবিকে বলিল, দেখ্‌, দেখ্‌, বিবি, কি বাহার তোর খুলেছে দেখ্‌, দেখি! সাপটাকে ছাড়িয়া দিয়া সে আয়নাটা বিবির সম্মুখে ধরিল। তারপর বিষম-ঢাকিটা বাজাইয়া কর্কশ অনুনাসিক স্বরে গান ধরিল—

জানি না গো এমন হবে
গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরা যাবে
ও জানি না গো—

আরও মাস কয়েক পর।

বর্ষার মাঝামাঝি একটা দুরন্ত বাদলা করিয়াছে। খোঁড়া কোথায় গিয়াছে, বাদলে দুর্যোগে ফিরিতে পারে নাই। জোবেদা অনুভব করিল, ঘরের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ উঠিতেছে—গন্ধটা ক্ষীণ! কিন্তু মিষ্ট এবং কেমন নূতন রকমের। এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না।

দিন দুই পরে খোঁড়া ফিরিল, জলের দেবতাকে একটা অশ্লীল গালি দিয়া বলিল, কিছু খেতে দে দেখি জোবেদা, বড়া ভুখ লেগেছে।

জোবেদা ঘরের মধ্যেই একটা থালায় পান্তাভাত বাড়িয়া দিল। পায়ের কাদা ধুইয়া ফেলিয়া খোঁড়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, গন্ধ কিসের বল্‌ দেখি জোবেদা?

জোবেদা বলিল, কে জানে বাপু, আজ কদিন থেকেই ঘরে এমনই গন্ধ উঠেছে।

খোঁড়া কথা কহিল না, সে শুধু ঘন ঘন শ্বাস টানিয়া গন্ধটার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল। এদিক ওদিক ঘুরিয়া সে বিবির ঝাঁপির কাছে দাঁড়াইল। মানুষের পদশব্দে ঝাঁপির ভিতর নাগিনীটা গর্জন করিয়া উঠিল।

খোঁড়া বলিল, হুঁ।

জোবেদা ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করিল, কি বল্‌ দেখি?

খোঁড়া বলিল, বিবির গায়ের গন্ধ। সাপিনী তো, সাপের সঙ্গে দেখা হবার সময় হয়েছে তাই। ওই গন্ধেই সাপ চ'লে আসে।

জোবেদা অবাক হইয়া গেল। বলিল, কে জানে বাপু, তোদের কথা তোদেরই ভাল। নে, এখন পান্তি কটা খেয়ে ফেল্‌।

ভাত খাইতে খাইতে খোঁড়া বলিল, ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে মাঠে। এ সময় ধ'রে রাখতে নাই।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কথাটা শেষ করিল।

জোবেদা পরম আশ্বাসের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সেই ভাল বাপু, ওটাকে আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। এত সাপ মরে, ওটা মরেও না তো!

ভাত খাইয়া খোঁড়া ঝাঁপি হইতে বিবিকে বাহির করিল। মুখটি চাপিয়া ধরিয়া সে কত আদরের কথা কহিল।

জোবেদা বলিল, এই দেখ্, কদিন ওকে কামানো হয় নাই, ওর দাত গজিয়েছে। আর মায়াই বা কেন বাপু, যা না, ওকে ছেড়ে দিয়ে আয়।

খোঁড়া বলিল, দেখ্ দেখ্, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ্।

অপরাহ্নে খোঁড়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়া ছিল। বিবিকে পার্শ্বের জঙ্গলটায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

জোবেদা বলিল, এমন ক'রে ব'সে কেন বল্ তো ? গাঁজাটাজা খা কেনে।

খোঁড়া কহিল, বিবির লেগে মন কি করছে রে!

জোবেদা হাসিয়া বলিল, মর্, মর্। তোর কথা শুনে কি হয় আমার!

না রে জোবেদা, মনটা ভারি খারাপ করছে।

জোবেদা এবার স্বামীর পাশে বসিয়া আদর করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কেনে রে, আমাকে তোর ভাল লাগে না ?

সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া খোঁড়া বলিল, তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। তু আমার জানের চেয়ে বেশি।

জোবেদা বলিয়া উঠিল, দেখ্ দেখ্, বিবি ফিরে এসেছে। ওই দেখ্ নালার মধ্যে।

জলনিকাশী নালার মধ্যে সত্যই বিবি ফণা তুলিয়া বেড়াইতেছিল।

খোঁড়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, ধ'রে আনি দাঁড়া।

জোবেদা স্বামীকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না।

তারপর কর্কশকণ্ঠে বলিল, বেরো, বেরো, হেট্, হেট্।

বাঁ হাতে করিয়া একখানা ঘুঁটে ছুঁড়িয়া সে বিবিকে মারিল। সাপটা সক্রোধে মাটির উপর কয়েকটা ছোবল মারিয়া ধীরে ধীরে নালা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর বোধ হয়, জোবেদা চিৎকার করিয়া উঠিল, ওঠ্, ওঠ্,

কিসে আমায় কাটলে!

খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিল, সত্যই জোবেদার বাঁ পায়ের আঙুলে এক ফোঁটা রক্ত জলবিন্দুর মত টলটল করিতেছে।

জোবেদা আবার চিৎকার করিয়া উঠিল, বিবি—তোর বিবি আমাকে কেটেছে, ওই দেখ্।

একটা হাঁড়িতে বেড় দিয়া নাগিনী ধীরে ধীরে চলিয়াছিল। খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাপটাকে ধরিয়া ঝাঁপিতে বন্দী করিয়া বলিল, জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করব আমি।

জোবেদা কিন্তু বাঁচিল না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইল। মাথার চুল টানিতেই খসখস করিয়া উঠিয়া আসিল। ওঝারা চলিয়া গেল। বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ সকরুণ করিয়া শিয়রে খোঁড়া বসিয়া রহিল।

একজন ওস্তাদ বলিল, তুইও যেতিস খোঁড়া, খুব বেঁচে গিয়েছিস। ভারি আক্রোশ ওদের, হয়তো তোকে কামড়াতেই এসেছিল।

সাশ্রুনেত্রে খোঁড়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

খোঁড়া ফকিরি লইয়াছে। তাহার ভিটাটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। খোঁড়ার বাড়ির পাশ দিয়াই একটা পায়ে-চলা পথ ছিল, সেটা এখন বন্ধ, সে দিক দিয়া এখন কেহ হাঁটে না। বলে, বড় সাপের ভয়। সাপগুলা বড় খারাপ সাপ উদয়নাগ। প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সময় দেখা যায়, রাঙা রঙের সাপ ফণা দুলাইয়া খেলা করিতেছে।

বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধু তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।

—০—

প্রাসঙ্গিক তথ্য

"জলসাঘর"-এর গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—

রায়বাড়ি	... ..	ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩
জলসাঘর	... .	বঙ্গশ্রী, বৈশাখ ১৩৪১
পদ্মবউ	... ...	শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪২
ডাক-হরকরা	... ...	প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৩
প্রতীক্ষা	... ..	কেশরী শারদীয়া, ১৩৪৩
মধুমাস্টার	... ...	বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ ১৩৪০
তারিণী মাঝি	...	আনন্দবাজার, শারদীয়া ১৩৪২
খাজাঞ্চিবাবু	... .	নতুন পত্রিকা, মাঘ ১৩৪২
টহলদার	. . ..	বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৪১
ট্যারা	... ...	প্রবাসী, মাঘ ১৩৪০
রাখাল বাঁড়ুজ্জে	... ...	দেশ, আশ্বিন ১৩৪২
নারী ও নাগিনী	...	দেশ, শারদীয়া ১৩৪১

"জলসাঘর" বই হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয়—শ্রাবণ ১৩৪৪ সালে

"আমার সাহিত্য-জীবন (প্রথম ভাগ)"-এ তারাশঙ্কর লিখেছেন—"সেবার পূজোর সময় যে কটি গল্প লিখেছিলাম, তার মধ্যে "রায়বাড়ি" গল্পটি অন্যতম। "রায়বাড়ি" গল্পটি আমার খুব প্রিয় গল্প। তাব কারণ পরে বলব। গল্পটি লেখার ছোট্ট ইতিহাস বলব। পূজোর আগে দেশে গিয়েছি, আমার বন্ধু জগবন্ধু ডাক্তার এসে একখানা ছাপা কাগজ আমার হাতে দিলেন। বললেন, তাঁদের গ্রামের আমাদেরই বন্ধু শরৎচন্দ্র চন্দ মাস্টারের পুরনো ঘরের মেঝে বাঁধাবার জিনিষপত্র বের করা হয়েছে, তার মধ্যে এটা ছিল। দেখ, এটা কি বল দেখি! সত্যই কাগজখানা বিচিত্র। একটা ছাপানো ফর্দ।***

দেখে আমি বললাম, এ কোন বিরাট ক্রিয়ার ফর্দ। এটুকুতে যা আছে, তা দেখে মনে হচ্ছে, সে ক্রিয়া অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ নয়, হয় শ্রাদ্ধ, নয় দেবপ্রতিষ্ঠা, যাতে বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।" (তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খণ্ড. আমার সাহিত্য-জীবন (প্রথম ভাগ)। প ৪১৪, কলকাতা চৈত্র ১৩৪৩)।

একটু পরে লিখছেন, "কর্দটি আমি রেখে দিলাম। মনের মধ্যে দেবপ্রতিষ্ঠার কথাটা বড় হয়ে উঠল না, শ্রাদ্ধের কথাই ঘুরতে লাগল।** এর সঙ্গে যোগ দিল "জলসাঘরে"র সুর। সেই বছরেই গত বৈশাখে "জলসাঘর" বের হয়েছিল, এবং "জলসাঘর"ই আমাকে পরিচিত করে দিয়েছিল পাঠক-সমাজের মধ্যে। বহুজনের অভিনন্দন পেয়েছিলাম। কে বলেছিলেন মনে নেই, বলেছিলেন— "জলসাঘরে"র ভাঙনের কথা লিখলেন; গড়নের কথা লিখুন। তখন থেকেই কল্পনা ছিল—আরও দুটি গল্প লিখে "জলসাঘর" নাম দিয়েই একটা বই প্রকাশ করব। প্রথম জলসাঘর গড়ে ওঠা, দ্বিতীয় জলসাঘরের পরিপূর্ণ জৌলুস, তৃতীয় এবং শেষেরটি আগেই লেখা হয়ে আছে সেই কল্পনা নিয়েই এই কর্দটিকে উপলক্ষ্য করে "রায়বাড়ি" লিখলাম—লিখলাম—জলসাঘর গড়ে ওঠার গল্প। জলসাঘরের ভাঙনের কথা মনে রেখেই লিখলাম "রায়বাড়ি"। প্রজাদের অভিসম্পাত থাকল। "রায়বাড়ি"র বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্র চোখে দেখিনি, কিন্তু এমন চরিত্রের কথা গল্পে আমি শুনেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে শুনেছি এবং এমনি কঠিন চরিত্রের মানুষের ছায়া আমার পিতৃপুরুষদের মধ্যে, পিতৃপুরুষদের সমসাময়িকদের মধ্যে দেখেছি বলেই এ চরিত্র এত সজীব, এত বাস্তব আমার কাছে।** সে জমিদারটির নাম আমাদের ও-অঞ্চলে আজও লোকের কাছে গল্পের কথা হয়ে আছে। তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের নিমতিতার জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী।*** (ঐ, পৃ ৪১৫)

"জলসাঘরে"র মাঝের গল্প আর লেখা হয়নি। লিখিনি। এর এক বৎসর পরই "জলসাঘর" বই প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত জলসাঘরের "জলসাঘর" প্রকাশ করবেনই। সেই কারণে ওই দুটিকে এক করেই জলসাঘরের পালা শেষ করলাম।" (ঐ, পৃ ৪১৬)।

রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে কলকাতা এসেছিলেন, তখন তারাশঙ্কর "জলসাঘর" বইটি তাঁকে দেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে ফেরার পথে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হ'লে বইটির খোঁজ পড়ে। কিন্তু বইটি পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একটি বই পাঠাতে অনুরোধ করেন তারাশঙ্করকে। তারাশঙ্কর আবার "জলসাঘর" বইটি পাঠান।

রবীন্দ্রনাথ বইটির বেশ প্রশংসাই করেছিলেন, সে-কথা "আমার সাহিত্য-জীবন (প্রথম ভাগ)"-এ তারাশঙ্কর জানিয়েছেন আমাদের, "শ্রীযুক্ত সুধীর করই আমাকে জানিয়েছিলেন, চেতনা ফিরে পেয়ে কবি চেয়েছিলেন তাঁর

বিজ্ঞানের বইয়ের প্রুফ আর চেয়েছিলেন "জলসাঘর" বইখানি। ওই "রায়বাড়ি" গল্পে, গেরুয়া পরে সর্বস্ব ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে, গঙ্গার ঘাটে নৌকোয় উঠতে গিয়ে বিশ্বম্ভর রায় বারেক ফিরে তাকিয়ে যে দেখলেন, অন্ধকার রায়বরাড়ির জলসাঘরে আবার জ্বলে উঠেছে আধ-নেবানো বাতিগুলি এবং সেই আকর্ষণে যে আবার তিনি ফিরে এলেন, এরই মধ্যে অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে চৈতন্যের দীপ্তির মধ্যে তাঁর নিজের ফিরে আসার একটি মিল পেয়েছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে।" (ঐ, পৃ ৪১৭)

রবীন্দ্রনাথ বোধহয় স্বর্গত সুরেন্দ্র মৈত্রকে এ-বিষয়ে এক চিঠি লেখেন, "আমার সম্পর্কে কিছু বলতে হলেই বলতেন, রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করকে চিনিয়েছিলেন আমাকে।" (ঐ, পৃ ৪১৭)

এই সব কারণেই "'জলসাঘরে'র 'রায়বাড়ি' আমার খুব প্রিয় গল্প।" (ঐ, পৃ ৪১৭), যদিও গল্পটি মাসিকপত্রের কর্তৃপক্ষের কাছে সাদর অভ্যর্থনা পায়নি। তবু লাল ঢেড়া চিহ্ন দেগে দেওয়া অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের কাছে বাতিল হয়ে যাওয়া গল্পটি "পরের মাসেই ছাপা হল। তখন আমি দেশে। একটু বিস্মিত হলাম।" (ঐ, পৃ ৪১৮)

"জলসাঘর" বইটির প্রথম সংস্করণের জ্যাকেটে একটি পরিচায়িকা ছিল, সেটি লিখেছিলেন সজনী কান্ত দাস:

"'জলসাঘরে'র চরিত্রগুলি কল্পনার ঊর্ধ্বলোক হইতে মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসে নাই—মাটির পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমশ কল্পনার ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়াছে। তারাশঙ্করের ইহাই বিশেষত্ব। নিছক কল্পনা বিলাসে তারাশঙ্করের আলেখ্যগুলি প্রাণহীন নয়—শক্ত, সমর্থ, জীবন্ত মানুষের স্পর্শে সজীব; এবং সজীব বলিয়াই বিচিত্র।"

(তারাশঙ্কর-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৩৪৩, পৃ ৪৭৫ থেকে উদ্ধৃত)।

প্রসঙ্গ জলসাঘর

বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি অজস্র গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন; লিখেছেন নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজীবনীমূলক রচনা, শেষ বয়সে এঁকেছেন ছবি। অথচ সাহিত্যে তাঁর হাতে-খড়ি কবিতায়। সে ঘটনাটি চমকপ্রদ। তখন তাঁর বয়স সবে মাত্র আট। একটা পাখির ছানার মৃত্যুতে পাখির মায়ের শোকাবহ করুণ অবস্থা দেখে খড়ি দিয়ে বৈঠকখানার দরজায় খড়খড়ির গায়ে লিখে ফেলেন চার লাইনের কবিতা। তাঁর ভাষায় "আমার সাহিত্য-সাধনা শুরু হয়ে গেল সেই দিন।" [তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা (প্রথম খণ্ড), আমার কালের কথা, কলকাতা, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ১১২]। শোক থেকেই কেবল শ্লোকের জন্ম হয় কিনা, তা খুব নির্দিষ্ট ভাবে বলা মুশকিল, কিন্তু আমাদেব আদি কবি বাল্মীকির কবিত্ব লাভ ঘটে এমনই এক শোকাবহ অথচ নিষ্ঠুর ঘটনায়।

অবশ্য কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু করেন নি, বাংলা সাহিত্যের এমন লেখকের সংখ্যা খুবই কম, তারাশঙ্করও জানতেন সাহিত্যের হাতে-খড়ি কবিতায় "সবাই নিয়ে থাকে"। তবু তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ত্রিপত্র" সমাদৃত হয় নি, তাঁর প্রথম নাটকও আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করেন, এমন কি প্রথম উপন্যাস "দীনার দান" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় না। একজন উঠতি লেখকের পক্ষে এমন অভিজ্ঞতা নিশ্চয় সুখকর নয়। সেজন্য হয়ত তারাশঙ্কর সাময়িকভাবে রাজনীতির দিকে বেশী ঝুঁকেছিলেন। তবু সাহিত্যজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও চলছিল। লাভপুর থেকে প্রকাশিত "পূর্ণিমা" পত্রিকার তিনি ছিলেন সহকারী সম্পাদক। ঐ পত্রিকায় স্বনামে ছদ্মনামে "কবিতা-গল্প-সমালোচনা-সম্পাদকীয়—অনেক লিখে যাই।" [তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খণ্ড, আমার সাহিত্য জীবন (প্রথম ভাগ), পৃ ৩০২]। আর "পূর্ণিমা"র সঙ্গে যুক্ত থাকার কালেই তারাশঙ্কর হঠাৎ পেয়ে যান নিজের পথ—

"এমন অবস্থায় হঠাৎ হাতড়ে মিলল একখানা মলাটছেঁড়া "কালিকলম" পত্রিকা।

আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটা লেখা এবং লেখকের নামটা অদ্ভুত না হলেও বিচিত্র।

"'পোনাঘাট পেরিয়ে, লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।" (ঐ, পৃ ৩০২) গল্পটি পড়ে বিস্মিত হলেন। বিস্ময়ের বোধহয় আর কিছু বাকি ছিল, "ওলটালাম পাতা। আবার পেলাম একটি গল্প। গল্পটির নাম মনে নেই। লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।" (ঐ, পৃ ৩০২) গল্প দু-টি পড়ে তারাশঙ্কর যথার্থ গল্প লেখার বিষয় ও দিশা পেয়ে গেলেন, "ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা—তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হেরেছে।" (ঐ, পৃ ৩০৩)। বিশেষ করে শৈলজানন্দর গল্প পড়ে তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, "বীরভূমকে এমনি করে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওয়া যায়!" (ঐ, পৃ ৩০২)

এই বোধের ফলে তারাশঙ্কর যে গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, সেই সব লেখা অচিরেই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে। "শৈলজানন্দ নিয়েছিলেন কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবন এবং উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের প্রতিবেশ; তারাশঙ্কর নিলেন দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের স্বল্পপরিচিত অঞ্চল, এবং উভয়েই সাধারণ মানুষকে উপজীব্য করলেন তাঁদের রচনায়, ঐ মানুষদের প্রায় আদিম উদ্দাম জীবন, কারণ তারা যেন প্রকৃতির সামনে অরক্ষিত অনাবৃত ছিল।" (কার্তিক লাহিড়ী, সৃজনের সমুদ্র মন্থন, কলকাতা ১৩৪৩, পৃ ১১১)।

তারাশঙ্কর লিখে ফেললেন "রসকলি"। লিখলেন—

"গল্প পেলাম।

আমার নায়িকা মঞ্জরী, জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মতো জীবন নিয়ে ফুটল। শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জরীই ফুটল না—আমার মনে হল, আমি কেমন করে আচম্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম। যার স্পর্শে অসাড় মানুষ ঘুম ভেঙে ফুটে ওঠে ফুলের মত।" (তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খণ্ড, আমার সাহিত্য জীবন, প্রথম ভাগ, পৃ ৩০৪) সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেয়ে তারাশঙ্কর "পূর্ণিমা"র স্থানীয় গণ্ডি পেরিয়ে সাহিত্যের মহাদেশে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সাহিত্য জীবনের সূচনাপর্বে তিনি অনেক অবজ্ঞা ও অবহেলা সহ্য করেছেন, সেটা ছিল তাঁর নিঃসঙ্গতার কাল। খুব কম লেখকেরই অবশ্য তাঁর সূচনা-পর্ব সৌভাগ্য-পর্ব হয়ে ওঠে। অবহেলা, অবজ্ঞা, নিঃসঙ্গতা কোন কোন লেখককে বাধা-বিপত্তি

অতিক্রম করার অদম্য সাহস যোগায়, আর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অফুরন্ত হলে অবহেলা-অবজ্ঞাকে দূরে ঠেলে দেওয়া যায় সামান্য চেষ্টায়। তারাশঙ্কর হার মানেন নি, তিনি অবহেলা ও অবজ্ঞাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বেগে। তিনি রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, "দেশসেবার বাতিক যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাতে আর কৃত্রিমতা থাকে না।** আগুন, ঝড় এবং কলেরা—এই তিনটাই আমাদের অঞ্চলে সব চেয়ে বড় বিপদ। এরই মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা ছিল।" (ঐ, পৃ ৩০৯) তাই তিনি বহু মানুষের সংস্পর্শে আসেন, আবার সক্রিয় ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে কারারুদ্ধ হন, ফলে জেলেও তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়েও তাঁর স্বস্তি ছিল না—একদিকে জেলাশাসকের জামানত দাবি। অন্যদিকে পুলিস সুপারের উৎপাত। আর এর সঙ্গে মিশে গেল রাজনৈতিক দলাদলির উৎকট তাণ্ডব। তাই অচিরে তারাশঙ্কর তথাকথিত রাজনীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন, যদিও দেশসেবার কাজে তিনি আগের মত অটল থাকেন, কেবল বদলে যায় ধরন। সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে দেশসেবা করা যায়—এই চেতনা তাঁকে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কিন্তু তারাশঙ্করকে বোধহয় আর একটা মর্মান্তিক আঘাতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কন্যা বুলুর মৃত্যু—"আমার সমগ্র জীবনে এই আঘাত একটা পরিবর্তন এনে দিলে। জীবন প্রবাহের মোড় ফিরে গেল। আমার জীবনে চলার পথে যে দু-নৌকায় দু-পা রেখে চলা তাতে ছেদ পড়ল। একখানা নৌকাকেই আশ্রয় করে হাল ধরলাম। এই মর্মান্তিক আঘাত না এলে বোধহয় তা হত না।" (ঐ, পৃ ৩৩৭)

পারিবারিক, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত তারাশঙ্কর অভিজ্ঞতার অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিজয়-অভিযান শুরু করেন, যদিও তা শুরু হয়েছিল জীবনে মর্মান্তিক আঘাত পাওয়ার বেশ কিছু দিন আগে 'কল্লোল' পত্রিকায় "রসকলি" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। 'কল্লোল', 'কালিকলম'-এ তারাশঙ্করের "রসকলি", "হারানো সুর", "স্থলপদ্ম", "শ্মশানের পথে" প্রভৃতি গল্প প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল'-এ গল্প প্রকাশিত হওয়ায় তিনি খুবই উৎসাহিত হন, কারণ গল্পলেখক হিসেবে এই স্বীকৃতি তাঁর জীবনে একটা বড় পাওয়া, "'কল্লোল', 'কালিকলম'—এমনি ভাবে গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় না দিলে আমি চলতাম অন্য পথে।" (ঐ, পৃ ৩১৪) তারাশঙ্কর লিখেছেন, "১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের কল্লোলে আমার প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫ সালের বৈশাখে 'হারানো সুর' ।** তখন সম্পাদক জানালেন,

আমাকে আর কল্লোলের জন্ম মূল্য দিতে হবে না, কল্লোল আমি নিয়মিত পাব এর পর থেকে। স্থতরাং এই ১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের কাল গণনা শুরু করব।" (ঐ, পৃ ২৯৩) যদিও এর আগে তিনি গল্প লিখেছেন, তবু 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প থেকে তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু বলে মনে করেছেন। অথচ তিনি কল্লোল-লেখকদের সমগোত্রীয় ছিলেন না। 'কল্লোল'-এর লেখা ছিল প্রধানত শহরকেন্দ্রিক, মূলত বুদ্ধি-আশ্রয়ী, তাতে বুদ্ধিজীবীদের হতাশা-ব্যর্থতা এবং তা থেকে মুক্তির একটা ভাবালু চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বস্তিজীবন নিয়ে তাঁরা লিখেছিলেন, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা চলে, "বস্তিজীবন এসেছে কিন্তু বস্তি-জীবনের বাস্তবতা আসে নি—বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসে নি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয় নি। ওই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।" [লেখকের কথা, (কলকাতা ১৩৪৩) পৃ ৩০] অন্যপক্ষে তারাশঙ্করের গল্প ছিল পল্লীকেন্দ্রিক, মনোভঙ্গির দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত "কল্লোল যুগে" তারাশঙ্কর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"আসলে সে বিদ্রোহেব নয়, সে স্বীকৃতির সে স্থৈর্যের।" এর উত্তরে তারাশঙ্কর বলেন, "আমি বিদ্রোহেব ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙে চুরে তাকে অগ্রাহ্য কবে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনোদিন হয় নি। আমার বচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা বোধ হয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল।" [তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা (প্রথম খণ্ড), আমার সাহিত্য জীবন (প্রথম ভাগ), পৃ ৩৫২] তিনি "মাটির পৃথিবীতে জীবনেব বন্যার" কথাই লিখতে চেষ্টা করেছিলেন, "ভাবের আকাশের ঝড"-এর সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলেন নি। তাই তাঁর রাস্তা কল্লোল-দের থেকে বাঁক নিয়ে অন্য দিকে চলে যায়, বোধহয় সেই রাস্তা তাঁকে মরুভূমিতে নিয়ে হাজির করে নি।

"রসকলি" তারাশঙ্করকে সাহিত্যিক স্বীকৃতি দেয়, আর "'জলসাঘর'ই আমাকে পরিচিত করে দিয়েছিল পাঠক-সমাজের মধ্যে। বহুজনের অভিনন্দন পেয়েছিলাম।" (ঐ, পৃ ৪১৫)

॥ ২ ॥

"ছোট জমিদার বংশে আমার জন্ম—আবার কংগ্রেস কর্মী এবং আমার মা দিয়েছিলেন এক বিচিত্র ন্যায়-অন্যায় বোধের ধারণা ; তাই গ্রামে গ্রামে

কখনও খাজনা আদায় উপলক্ষে, কখনও সেবাধর্ম উপলক্ষে ঘুরবার সময় গ্রামের অবস্থা আমার চোখে বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল।" [তারাশঙ্কর স্মৃতি-কথা, প্রথম খণ্ড, আমার সাহিত্য জীবন (প্রথম ভাগ), পৃ ৩২৮]

"পরবর্তী জীবনে তখন আমি প্রায় গ্রাম্য পরিব্রাজক, পিঠে বোঁচকা বেঁধে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই। মেলা বেড়ানো একটা রোগ দাঁড়িয়েছিল।" (তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খণ্ড, আমার কালের কথা। পৃ ২৮)

সঙ্গতভাবে আশা করা যায়, জমিদারীর কাজে, সেবাধর্ম উপলক্ষে ঘোরার সময়, বা পরিব্রাজকের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ায় তারাশঙ্কর নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। এ-ছাড়া ছিল পারিবারিক অভিজ্ঞতা, "মায়ের শিক্ষা এবং বাবার গম্ভীর ও গভীর তত্ত্বসন্ধানের আকৃতি থেকে আমি পেয়েছিলাম আমার পথ" (ঐ, পৃ ৫২), তাছাড়া লাভপুরের বিচিত্র জীবন, আর তিনি দু'চোখ ভবে দেখেছিলেন, "সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব**" (ঐ, পৃ ৮), এবং "সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।" (ঐ, পৃ ৮)

সমস্ত মিলিয়ে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অফুরান হয়ে ওঠে। সেই ভাণ্ডার নিয়ে তিনি অবতীর্ণ হলেন সাহিত্যে। একজন কথাসাহিত্যিকের পক্ষে এমন অভিজ্ঞতা থাকা কেবল দরকারীই নয়, অনিবার্যও বটে। এর ফলে তাঁর গল্প-উপন্যাস এত বৈচিত্র্যে ভরা। জমিদার, উচ্চবর্ণের মানুষ থেকে শুরু করে নীচুতলার কাহার, বাউরি, বাগ্দী, ডোম, এমনকি চোর, গুণ্ডা, খুনী প্রভৃতি অবলীলায় তাঁর গল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। জমিদারের প্রাসাদ থেকে দরিদ্রতমের কুঁড়েঘর—কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তারাশঙ্করের গল্প পড়ে মনে হয় এ যেন একেবারে আকাঁড়া অভিজ্ঞতার প্রতিলিপি সব।

"রায়বাড়ি" ও "জলসাঘর" একটি দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার-বংশের গড়া ও ভাঙার গল্প, "'রায়বাড়ি' লিখলাম—লিখলাম জলসাঘর গড়ে ওঠার গল্প। জলসাঘরের ভাঙনের কথা মনে রেখেই লিখলাম "রায়বাড়ি"। [তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খণ্ড, আমার সাহিত্য-জীবন (প্রথম ভাগ), পৃ ৪১৫] কিন্তু গড়া ও ভাঙার মধ্যবর্তী অংশ "জলসাঘর" গ্রন্থে নেই; তাই মনে হয়, গল্প দুটি একটি বড় কাহিনীর প্রথম ও শেষ অংশ, যার মধ্যবর্তী অংশ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তবু এই গ্রন্থেই দুটি অংশের মধ্যে একটা যোগসূত্র রাখতে চেষ্টা করেছেন লেখক—

"তিন পুরুষ ধরিয়া রায়েরা করিয়াছিলেন সঞ্চয়। চতুর্থ পুরুষ করিয়া-

ছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণসমুদ্রে তলাইয়া গেলেন।" (জলসাঘর, পৃ ২৪)

"রায়বাড়ি" গল্পে রাবণেশ্বরের প্রতাপ ও বিক্রমের ছবি তুলে ধরা হয়েছে, "গিন্নী, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের।" রাবণেশ্বরের এই উক্তির মধ্যে নিহিত আছে তিনি কি ভাবে প্রজা শাসন করেন, নিজের প্রতিপত্তি অটুট রাখেন। কিন্তু সেকালের জমিদার কেবল শাসকই ছিলেন না, "জমিদার তখনও ভূস্বামী, এবং তাঁহাদের সে স্বামিত্বের সত্যকার অর্থ তাঁহারা বজায় রাখিয়াছিলেন।" (ঐ, পৃ ১)। তাই যিনি গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না, তিনি বন্যার সময় প্রজাদের জন্য দ্বার খুলে দেন। এগিয়ে আসেন গাঙ্গুলীর মেয়ের বিয়ের আয়োজন করতে। সেদিক থেকে রাবণেশ্বর রায় দয়ালু স্বৈরতন্ত্রীর মত একদিকে নিষ্ঠুর, নির্মম: অন্যদিকে দয়ার সাগর। তবু লেখক রাবণেশ্বর রায়কে যতই মহিমান্বিত ভাবে আঁকতে চেষ্টা করুন না কেন তাঁর আচরণে সেই মহিমময় রূপ কখনো কখনো বেশ চাপা পড়ে যায়। কালা বাগ্দীর সাহায্যে প্রজাদের সুপ্তি ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় রাবণেশ্বরের কাপুরুষতা প্রকাশ না পেলেও বীরত্ব প্রকাশ পায় না, একজন নিছক ষড়যন্ত্রকারীর মত মনে হয় তাঁকে, যিনি প্রকাশ্যে কাজ করতে ভরসা পান না। আবার সমস্ত সম্পত্তি দেবত্রে অর্পণ করে সংসার ত্যাগের সংকল্পে তিনি অটুট থাকতে পারেন না, ফিরে আসেন। এই ফিরে আসা তাঁর ব্যক্তিত্ব-উত্থিত হলে নিশ্চয় তা যথোপযুক্ত হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু "রায় আবার জলসাঘরের দিকে চাহিলেন। দেওয়ালে বিলম্বিত তাঁহার পূর্বপুরুষগণের প্রতিকৃতিগুলি সজল বাতাসে মৃদুমৃদু দুলিতেছিল। এ কি, ভুবনেশ্বর রায়, ত্রিপুরেশ্বর রায় কি তাঁহাকে ডাকিতেছেন?" (ঐ পৃ ১৮)। এখানে রাবণেশ্বরের তেজস্বিতা ও অমিত বিক্রমও তাঁকে সিদ্ধান্তে অটুট থাকতে দেয় না, পূর্বপুরুষের স্মৃতি ও আহ্বান তাঁর সমস্ত শৌর্যবীর্য হরণ করে নেয়, যেন তিনি তাঁদের আহ্বানের ক্রীড়নকমাত্র। ফলে রাবণেশ্বর চরিত্র লেখকের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার আদিস্থানে অটল থাকে না। বরং খুব অল্প আয়োজনে রায়-গিন্নীর চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রজাদের প্রাণরক্ষার জন্য তার দৃঢ় প্রতিবাদ, আবার "লোকের দীর্ঘশ্বাসকে তুমি ভয় কর না? আমার ওই একটি সন্তান—" উক্তির মধ্যে মায়ের ভীরু আশঙ্কার প্রকাশ তাঁকে রাবণেশ্বরের বিরাটত্বের পাশে অনেক বেশী মানবিক করে তোলে।

রাবণেশ্বর স্মৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন ফেরার সময়, আর "জলসাঘর"-

এর গল্পটি এক নিঃশেষিত জমিদারের স্মৃতিভারে পড়ে থাকার কাহিনী। গৌরব লুপ্ত, তবু তার ছটা মোহ বিস্তার করে আছে। ফলে সমস্ত গল্পটি একটা দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসের মত মনে হয়, "বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিলেন।" (ঐ, পৃ ২৪)। বিশ্বম্ভরের কোনও উদ্যম নেই, কারণ ঋণ-সমুদ্র থেকে ভেসে ওঠার শেষ চেষ্টাটুকুতে বাদ সেধেছে হালে বড়লোক মহিম গাঙ্গুলি।

"বসন্ত সমারোহ করিয়া রায়বাড়িতে আসে না। তাহার পাদ্য-অর্ঘ্য দিবার মত শক্তিও রায়বংশের নাই। মালীর অভাবে ফুলের বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। আছে মাত্র কয়টা বড়গাছ—মুচকুন্দ, বকুল, নাগেশ্বর, চাঁপা। সেগুলিও এই বংশেরই মত শাখা-প্রশাখাহীন, এই প্রকাণ্ড ফাটল-ধরা প্রাসাদখানার মতই জীর্ণ।" (ঐ, পৃ ১৯)। এ বর্ণনা শুধু রায়বাড়ির বাইরের বর্ণনাই নয়, এ বিশ্বম্ভর রায়ের মানসিক অবস্থারও প্রতিচ্ছবি। বিশ্বম্ভর দর্শক চরিত্র হওয়ার ফলে সে কেবল অবস্থার দাসে পরিণত হয়েছে, উদ্যমের মধ্যে আপন পৌরুষকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। বোধহয় তা সম্ভবও ছিল না, কেননা নবীন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তখন জমিদারতন্ত্রের হারাব পালা শুরু হয়েছে। আর ইতিহাসও তাই বলে। তারাশঙ্কর বিলক্ষণ জানতেন, জমিদারতন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু—সেই তন্ত্র নতুন দ্বন্দ্বে পরাস্ত হবে। তবু এই সত্যটি জানার পরও লেখক অন্তর দিয়ে তা মেনে নিতে পারেন নি, তাই গল্পের শেষদিকে মহিমের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সূত্র ধরেই তিনি তুলে ধরেন বিশ্বম্ভরের বিলাস-বিহ্বল স্মৃতি, প্রদীপ নিবে যাওয়ার আগে জ্বলে ওঠার ছবি। কিন্তু এ যে এক মস্ত বিভ্রম বিশ্বম্ভরের মত লেখকও মনে করেন নি, তাই "হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল"-র মধ্য দিয়ে বিশাল মহীরুহ পতনের এক শোকাবহ হাহাকার ছড়িয়ে দিতে চান পাঠকের মনে, এবং তারাশঙ্কর সেই অনুভূতি জাগানোয় সফলও হয়েছেন বলা যায়। রাজা মারা গেছেন, রাজা দীর্ঘজীবী হন—"জলসাঘর" গল্পে সেই ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর প্রাচীন সম্পর্কে আমাদের এক অদ্ভুত মোহ গল্পটিকে প্রিয় করে তোলে।

"রাখাল বাঁড়ুজ্জে" গল্পে অবশ্য তারাশঙ্কর জমিদার-চিত্র চিত্রণে নির্মম হয়েছেন। রাখাল "হাজার খানেক টাকার আয়ের মেলানপুরের জমিদার"। কিন্তু তার লোভের অন্ত নেই, এই লোভ তাকে হিংস্র করে তোলে, পর-সম্পত্তি গ্রাসের জন্য সে যে-কোনও স্তরে নেমে আসতে পারে। সেই লোলুপ হিংস্রতার সঙ্গে তার কথার মধ্যে মুদ্রাদোষ ঢুকিয়ে লেখক তাকে প্রায় নিম্নস্তরের জীব হিসেবে আঁকেন। রাখাল পুরোদস্তুর গেঁয়ো এবং লোলুপতা ছাড়া যেন তার

আর দ্বিতীয় কোনও ইন্দ্রিয় নেই। তাই সম্পত্তি আত্মসাতের লোভে হৈমর একমাত্র সন্তান লক্ষ্মীকে ছেলের বউ করে আনে ঘরে। কিন্তু চোরের উপরও বোধহয় বাটপাড় থাকে, তাই রাখালের ইচ্ছাপূরণের আগেই হৈমর বুদ্ধির কাছে সে প্রচণ্ডভাবে হেরে যায়। গল্পটি সাদামাটা। কিন্তু লক্ষ্মীর বেড়াল শেষ পর্যন্ত গল্পটিকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। বেড়াল রাখালের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। রাখালকে দেখলে বেড়ালটা রাগে গরগর করতে থাকে। যেন রাখাল কোন অশুভ আত্মা, রাখাল তাকে ভয়ও পায়। এই বেড়ালের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হয় রাখালের। হৈমর পরিত্যক্ত বাড়িতে বেড়ালটা কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, অথচ রাখালকে দেখামাত্র বেড়ালটা তার শোক মুহূর্তে ভুলে মারমুখী হয়ে ওঠে। রাখাল কোনমতে বাইরের ঘরে ঢুকে দরজা অল্প ফাঁক করে দেখতে থাকে। "বিড়ালটা যেন আজ উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে।** সেই মুহূর্তে বাঁড়ুজ্জে আপনার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া দরজা দুইখানা চাপিয়া ধরিল, তখন হতভাগা পশুটার মাথাটা ঘরের মধ্যে, দেহখানা বাহিরে। দুইখানা দরজার পেষণে তাহার কণ্ঠদেশটা বাঁড়ুজ্জে চাপিয়া ধরিয়াছে। প্রথমেই হিংস্র ও যন্ত্রণাকাতর একটা অদ্ভুত শব্দ পশুটার মুখ হইতে একটুখানি বাহির হইয়া অসমাপ্ত থাকিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে চোখ দুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিল ; একটা চোখ অকস্মাৎ ছিটকাইয়া বাহির হইয়াও গেল। কঠিন কাঠের সবল পেষণে কণ্ঠদেশটা তখন পাতলা চেপ্টা হইয়া গিয়াছে। তারপর বাড়িখানা নিস্তব্ধ।" (ঐ, পৃ ১৫৭)

রাখাল এইভাবে প্রতিশোধ নেয় নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর, এটা তার আহত অহঙ্কার, প্রচণ্ড লোভ ও হিংস্রতার উজ্জ্বল প্রকাশ। আসলে সে বেড়ালটাকে মেরে হৈমর উপরই প্রতিশোধ নেয় পরোক্ষভাবে। গল্পটি এই দৃশ্যে তার মামুলিত্ব পরিহার করে জটিল মানসিকতার আলেখ্য হয়ে ওঠে।

"পদ্মবউ" গল্পের পদ্মবউ-এর স্বামীভক্তি আদর্শস্থানীয়। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামী-সেবার মধ্যে সে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। ভেবেছিল, এই সেবা তাকে স্বামীর রোগ থেকে মুক্ত রাখবে। কিন্তু যেদিন তার ভুল ভাঙে, সেদিন পদ্মর বিদ্রোহ কোনও বাঁধ মানে না—ঠাকুর, দেবতা কিছুই তার হাতে রেহাই পায় না। অথচ তার মৃত্যুর পর জানা গেল, আসলে তার বেরিবেরি হয়েছিল। এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস! এই পরিহাসের জন্য তাকে জীবন দিতে হয়। অবশ্য পদ্মবউ প্রথমে তার রোগগ্রস্ত স্বামীকে সেবা করতে এগিয়ে আসে নি, বরং সে পালিয়ে যায় বাপের বাড়ি। বাবা তাকে পুরাণের উদাহরণ দিলে তার মন

পলে, স্বামীগৃহে ফিরে এসে পতিসেবায় মন প্রাণ ঢেলে দেয়। এমন পাতিব্রাত্য "প্রতীক্ষা" গল্পের নায়িকা পরীর মধ্যে দেখা যায় না। আসলে "মানুষের মন লইয়া সে খেলা করে।" কিন্তু নারী বলেই সে একদিন বাঁধা পড়ে, এবং রক্তের চাঞ্চল্যেই হয়ত ভবিষ্যতের কথা না ভেবে আখনাকে বিয়ে করে, নীড়ও রচিত হয় আখনা ও পরীর পরিশ্রমে। পরী পোষমানা পাখির মত আখনার বশীভূত হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে তার আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে, "পরী আলো নয়—আলেয়া; ভাস্বর প্রভায় রাত্রির পথিকের চোখ ধাঁধিয়া দেখা দেয়, ইশারায় ডাকে, কিন্তু ধরা দেয় না, নিঃসাড়ে সরিয়া যায়" (ঐ, পৃ ৬৮)। আখনার ভালোবাসার দান পায়ে ঠেলে বিলাসিনী পরী বেরিয়ে পড়ে। আখনা তাকে খুঁজে পায় না, যখন খুঁজে পায় তখন পরীর "রোগজীর্ণ শীর্ণ দেহ। দুরন্ত ব্যাধি সে যৌবন ও লাবণ্য জলৌকার মত প্রায় নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইয়াছে।"

পদ্মবউও পরীর মত গতর খাটিয়ে সংসার চালিয়েছে, কিন্তু তার বিশ্বাস ভাঙার একটা গভীর কারণ ছিল, সে জানতো—পতিসেবা তাকে ঐ রোগযুক্ত করবে না কোনদিন। পরীর তেমন বিশ্বাস ছিল না, সে প্রজাপতি ও ভ্রমরের মত, ফুলে ফুলে মধু খাওয়াই যার স্বভাব। প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয় বলেই তার পরিণতি এত করুণ হয়। সে মানুষের কৃপার পাত্র হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পদ্মবউ যে ন্যায়-বিচার আশা করে তা না পেয়ে সে মুখ বুজে বসে থাকেনি, প্রতিবাদ করেছে। এখানেই পদ্মবউ পরীর চেয়ে সদর্থক চরিত্র হয়ে ওঠে।

ডাকহরকরা দীনু ডোমের সঙ্গে টহলদার রামদাসের চরিত্রগত বেশ মিল আছে। দুজনেই কর্তব্যনিষ্ঠ—একজন ঠিক সময় ডাক পৌছে দেয়, দ্বিতীয় জন টহল দিয়ে বেড়ায় ও চোর ধরে। কর্তব্যে তাদের অবহেলা হয় না। দীনু তার ছেলের হাতে নিগৃহীত হয়, কিন্তু সে প্রথম জেরায় অপরাধীর নাম করে না, যদিও পুলিসী জেরার মুখে তাকে নামটি ফাঁস করতেই হয়। পক্ষান্তরে রামদাস চোর শশীর অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর তাকে আশ্বস্ত করে, অভয় দেয়—"ভাবিস না শশী, তোর কোনও ভয় নাই।" (ঐ, পৃ ১১৯)। কিন্তু এরপর "ডাকহরকরা" ও "টহলদার"-এর কাহিনী আলাদা বাঁক নেয়। ছেলে ফেরার হওয়ার পরও দীনু কর্তব্যনিষ্ঠ থাকে, কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার কি পুরস্কার পায় দীনু? পায় কোম্পানির পাঠানো টাকা, এবং ছেলে নিতাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ। একই সঙ্গে প্রাপ্তি ও হারানো সংবাদ, যে সংবাদ সে নিজেই

বহন করে এনেছে নিজের অজান্তে। আর তখুনি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় "এমন সংবাদ এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিত্য নিত্য কত সে বহিয়া আনিয়াছে! কত—কত—কত—সংখ্যা হয় না। মনে হইল, আজও পর্যন্ত যত রোদনধ্বনি সে শুনিয়াছে, সে সমস্ত দুঃসংবাদ সে-ই বহন করিয়া আনিয়াছে।" (ঐ, পৃ ৬৭)। দীনু কাজে জবাব দেয়। কর্তব্যনিষ্ঠ দীনুর এই পরিণতিতে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—তবে কি সংসারে ন্যায়বিচার নেই? কর্তব্যপালন কি কেবল দুঃখই ডেকে আনে? অবশ্য দুর্বৃত্তর হাত থেকে সরকারী ডাক বাঁচাবার জন্য দীনু পুরস্কার পায়। রামদাসও পুরস্কার পায়—শশীর তৈরী একতারা। পাপের ভাগী হবে জেনে রামদাস একতারা নিতে ইতস্তত করে। আর তা নিলে কোন রন্ধ্র দিয়ে চোরের দেওয়া যন্ত্রটি চোরাই রঙে বাণিশ হয়। শেষে চোর ধরা যার কাজ ছিল, সে নিজেই চোর হয়ে যায়। বেহালা চুরি করে অবশ্য সে নিজের কাছেই ধরা পড়ে যায়। দীনু আর রামদাসের পরিণতি এক না হলেও এরা উভয়েই নিজের অজান্তে এক ফাঁদে ধরা পড়ে, যে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসাব পথ তাদের জানা নেই।

অন্যদিকে নিজের কাজ সম্বন্ধে বেশী মনোযোগী হয়ে পড়লে সেই সব চরিত্র সাধারণ মাপে একটু অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে—মধুমাস্টার ও খাজাঞ্চিবাবু তাব প্রমাণ। মধুমাস্টার আত্মভোলা, উদাসীন, আবেগপ্রবণ অথচ জ্ঞানস্পৃহ—প্রায় শরৎচন্দ্রের চেনা চরিত্রের মত। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি দারুণ মমত্ব তাকে একজন বিদেশীর ভারতবিরুদ্ধ কুৎসাকে আক্রমণ করতে প্রণোদিত করে। সমস্ত কিছু ভুলে তিনি বই লিখতে শুরু করেন। জ্ঞানদাবাবুর উৎসাহ ও আর্থিক অনুদানে কাজটি অগ্রসরও হয়, কিন্তু তার মৃত্যুর পর একালের সুরেন্দ্রনাথ মধুমাস্টারকে শুধু অনুৎসাহিতই করে না, অপমানও করে। খাজাঞ্চি-বাবুও তেমনি লাঞ্ছিত হন নতুন ম্যানেজারের কাছে। কোম্পানির কাজকে নিজের কাজ ভেবে বেশী তৎপরতা দেখালে সে বাধা পায় ম্যানেজারের কাছ থেকে। শেষে খাজাঞ্চিবাবুকে বিদায় নিতে হয় বার্ধক্যের জন্য। অর্থাৎ পরোক্ষ-ভাবে যেন বলা হয় মধুমাস্টার ও খাজাঞ্চিবাবুরা এযুগের প্রতিভূদের কাছে যোগ্য সম্মান তো পান-ই না, বরং লাঞ্ছিত হন। খাজাঞ্চিবাবুর বিদায়-দৃশ্যটি করুণ, মধুরও তাই। সারাজীবন পরিশ্রমের পর তাদের কপালে সুখকর কিছুই জোটে না। তবু মৃত্যুর পর মধু খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন, এবং স্ত্রীর সুপ্ত ভালোবাসা মৃত্যুর পর হলেও জেগে ওঠে। জীবনে না পেলেও মৃত্যুর পর মধুমাস্টার অনেক কিছু পায়। আর জীবনে সম্পূর্ণ একা খাজাঞ্চিবাবু বিদায়ের ক্ষণে আকাশং

দেখতে পায় না, "শুধু ধোঁয়া, ধোঁয়া আর ধোঁয়া—ওই কারখানার চিমনির উদ্‌গিরিত ধোঁয়ার আড়ালে আকাশ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" (ঐ, পৃ ১১৩)। "রায়বাড়ি" ও "জলসাঘর"-এর মত এ দুটি গল্পেও তারাশঙ্করের মমত্ব যেন ঝুঁকে পড়ে যা বিদায় নিচ্ছে তার দিকে।

তাঁর দুটি বিখ্যাত গল্প "তারিণী মাঝি" ও "নারী ও নাগিনী"র বিষয়বস্তু ও প্রকরণে কোনও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না, কেবল দুটি গল্প সমাজের নীচুতলার মানুষ নিয়ে লেখা হয়েছে—এ ছাড়া আর কোনও মিল সহসা নজরে পড়ে না। কিন্তু সামান্য মনোযোগী পাঠে বোঝা যায়—তারিণী-সুখী ও শেখ-জোবেদার দাম্পত্য জীবন মধুরই, জোবেদা খোঁড়ার কাছে "জানের চেয়ে বেশী।" এ ছাড়া উভয়ই দৈহিক ভাবে অন্যদের মত নয়, তারিণী "অস্বাভাবিক দীর্ঘ", এবং শেখ "খোঁড়া"। আর এদের জীবনে অতর্কিতে এসে পড়েছে এক তৃতীয় পক্ষ। তারিণী-সুখীর জীবনে ভয়াবহ বান, শেখ-জোবেদার জীবনে নাগিনী। বান দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তারিণীকে বিপন্ন অস্তিত্বের সামনে, নাগিনী খোঁড়ার অস্তিত্ব ধ্বস্ত করে দিয়েছে, "খোঁড়া ফকিরি লইয়াছে"। কিন্তু বান তারিণীকে যে কাজ করতে বাধ্য করায়, তা ন্যায় কি অন্যায়—এমন প্রশ্ন খুব বড় হয়ে ওঠে পাঠকের সামনে। অস্তিত্ব বিপন্ন হলে মানুষের কর্তব্য কি? সুখীকে গলা টিপে না মেরে, সুখীর সঙ্গে জলের অতলে তলিয়ে যাওয়াই কি তারিণীর উচিত ছিল? প্রেম ও আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে কোনটা বড়? তারিণীকে কি হত্যাকারী বলা চলে? এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজে হওয়ার নয়, আর এমন সত্তা নাড়ানো প্রশ্ন ওঠে বলে "তারিণী মাঝি" গল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে "নারী ও নাগিনী"তে মেয়েদের ঈর্ষাই প্রধান সমস্যা হয়ে উঠেছে, তার ইন্ধন যুগিয়েছে খোঁড়া শেখ। কিন্তু 'বিবি'-র সঙ্গে খোঁড়াব এই সখ্যতার হেতু কি? তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আদিম প্রবৃত্তি শেখকে এ ধরনের আচরণে প্রণোদিত করেছে, এ-ছাড়া অন্য কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়। তাই স্ত্রীঘাতিনী বিবিকে সে হত্যা করে না, ছেড়ে দেয়। 'শুধু তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।" শেখের এই উক্তিতে নারী জাতির প্রতি তার মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অথচ এর ভিত্তিভূমি দৃঢ় নয় বলে "নারী ও নাগনা তারাশঙ্করের লিপিকুশলতার উজ্জ্বল উদাহরণ হওয়া সত্ত্বেও মহৎ গল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয় না। নিয়তি তারিণী ও খোঁড়াকে অনিবার্য বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় গল্পে প্রবৃত্তি নিয়তির স্থান দখল করে নেয় বলে, ঐ গল্পে এমন এক অনুভবের জন্ম হয় পাঠকের মনে, যাকে আমরা খুব

সুস্থ অনুভব বলে ভাবতে পারি না, এখানেও গল্পটি "তারিণী মাঝি"র পর্যায়ে উঠতে অসফল হয়েছে।

"ট্যারা" কোন অসাধারণ গল্প নয়। তার দুষ্ট বুদ্ধি, আচার-আচরণ মধ্যে মধ্যে আমাদের পীড়া দিলেও শেষে মোহন্তর প্রতি ভালোবাসার মধ্যে মানবিক স্পর্শ অনুভব করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকে নিয়ে বা ধর্মস্থানে যে কাজ-কারবার চলে, অস্পষ্ট হলেও তার একটা ছবি বের হয়ে আসে গল্পটি পড়লে। ট্যারা বদমাশ হলেও অমানুষ নয়, গল্পে তেমন এক ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা আছে।

॥ ৩ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশীর ভাগ গল্প ঘটনা-প্রধান। "জলসাঘর"-এর গল্পগুলি সে ধারার ব্যতিক্রম নয়। প্রতিটি গল্পে মোটা দাগের ঘটনা ঘটে। "রায়বাড়ি" গল্পে প্রথমে হুদ্দা-শ্যামপুরের দুর্বর্ষ প্রজাদের সঙ্গে রাবণেশ্বরের সাক্ষাৎ, গোমস্তা ঠাকুরদাসকে গুড় তৈরীর উনুনে পুড়িয়ে ফেলার প্রতিশোধ হিসেবে কালা বা দীকে জমিদারের হুকুম, রাধারাণীর বিয়ে উপলক্ষে আমন্ত্রণ, বিয়ে উপলক্ষে যাওয়া, রায়বাড়ির পুণ্যাহ অনুষ্ঠান, জলসাঘরে মজলিস চলাকালে বজরাডুবির সংবাদ, স্ত্রী-পুত্রের শ্রাদ্ধের পর সমস্ত সম্পত্তি দেবত্রে অর্পণ, নন্দরাণীকে বিয়ে করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, দীঘলমারার বাঁধ ভেঙে বানের জল ছুটে আসা, বন্যার্তদের রায়বাড়িতে আশ্রয়দান, জলসাঘরে গাঙ্গুলী-কন্যার বিয়ের আয়োজন, রায়কর্তার ডিঙি-র কাছে যাওয়া, শেষে গৃহে প্রত্যাগমন ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক ঘটে যায়। তাই এতে "মনের আঁতের কথা" টেনে বের করার অবকাশ প্রায় থাকে না। এমন কি "জলসাঘর"-এর মত স্মৃতিকাতরতার গল্পে লেখকের দৃষ্টি থাকে কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার দিকে, তাই ঐ গল্পেও ঘটনাবাহুল্য এতটুকু শিথিল হয় না।

বোধহয় ঘটনার চাপ বেশী থাকে বলে গল্পের মধ্যে আকস্মিক ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া সুলভ হয়—"রায়বাড়ি"তে বজরাডুবি, "জলসাঘর"-এ বাড়িতে কলেরার প্রাদুর্ভাব, "ডাক-হরকরা" গল্পে হঠাৎ নিতাইয়ের ডাকাত রূপে আবির্ভাব ইত্যাদি।

গল্পের শেষে কখনো কখনো বা আরও দু-একটি অপ্রত্যাশিত মোচড় দেওয়া তারাশঙ্করের গল্পের একটি বৈশিষ্ট্য। "ডাক-হরকরা" গল্পে একই সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তি ও মৃত্যুসংবাদ, "মধুমাস্টার" গল্পে মধুমাস্টারের বই ছাপা হওয়া ও মরণোত্তর সম্মান পাওয়া, "টহলদার" গল্পে রামদাসের বেহালা চুরি ও নিজের ছায়া দেখে ভয় পাওয়া, "রাখাল বাঁড়ুজ্জে" গল্পে বেড়ালের সঙ্গে রাখালের যুদ্ধ ইত্যাদি

মোচড় পাঠকের মনে প্রার্থিত সমাপ্তির বদলে নতুন এক চমকের সৃষ্টি করে কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলে।

আকস্মিক ঘটনা ও মোচড় দেওয়ার জন্য তাঁর গল্পে এক ধরনের অতি-নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়। চরিত্রগুলি ঘটনার চাপে পরিস্ফুট হয়, সেইজন্য এবং কখনো কখনো (বিশেষ করে নিম্নবর্গের চরিত্রের ক্ষেত্রে) মানুষের প্রাথমিক আবেগ লেখকের উপজীব্য হয় বলে চরিত্রগুলি চড়া রঙে আঁকা হয়ে যায়—প্রায়ই একরঙা। তাদের অবস্থান আবেগের একেবারে বিপরীত বিন্দুতে স্থিত হয়—কখনো প্রচণ্ড ঘৃণা, পরক্ষণেই হয়ত তীব্র ভালোবাসা, কখনো নিদারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণ, কখনো দয়ার অবতার। এসবের ফলে তারাশঙ্করের ছোট গল্প অনেক সময় সংগঠনে শিথিল হয়, অনেক সময় তা গল্পের সীমা পেরিয়ে উপন্যাসের সারাংশ হয়ে ওঠে। হয়ত প্রচণ্ড অভিজ্ঞতার আবেগ কোনও সীমা মানতে চায় না, উপরন্তু আছে অফুরন্ত অভিজ্ঞতা রূপায়ণের ইচ্ছা। তাই হয়ত পরবর্তী সময়ে তারাশঙ্কর অনেক ছোট গল্পকে উপন্যাস ও নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস আলোচনায় আঞ্চলিকতার প্রশ্নটি বারবার ওঠে। বীরভূমের একটি বিশেষ অঞ্চল তাঁর অনেক রচনার বস্তুভূমি হওয়ার জন্য আঞ্চলিকতার প্রশ্নটি স্বাভাবিক ভাবে মুখ্য হয়ে পড়ে। সাধারণ ভাবে আঞ্চলিক রচনা তাকেই বলা হয়ে থাকে, যে রচনায় অবলম্বিত অঞ্চলের সামাজিক ভৌগোলিক সভ্যতা কৃষ্টি—অন্যকথায় সেই অঞ্চলের সার্বিক প্রভাব কাহিনী ও চরিত্রের উপর পড়ে। এই বিচারে প্রায় প্রতিটি প্রকৃত ও সফল গল্প-উপন্যাস আঞ্চলিক, কারণ সব কথাসাহিত্যিক একটি নির্দিষ্ট সমাজ—তার দেশ-কাল-এ কাহিনী ও চরিত্র স্থাপিত করেন। তবু তারাশঙ্করের বেলায় এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তিনি প্রথম দিকের রচনায় বীরভূমকে করে নিয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার বিচরণভূমি। "রায়বাড়ি", "জলসাঘর" বা "রাখাল বাঁড়ুজ্জে" গল্পের জমিদারদের বিশেষ করে বীরভূমের জমিদার বলে মনে হয়। "বীরভূমের জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাঁদের সংখ্যার বাহুল্য। দশ হাজার টাকা আয় যাঁদের, তাঁরা রাজতুল্য ব্যক্তি। আমাদের গ্রামের জমিদারের আয় পাঁচ থেকে সাত আট হাজার। তাতেই তাঁদের প্রবল পরাক্রম।" (তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খণ্ড, আমার কালের কথা, পৃ ৬)। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য কি কেবল বীরভূমের? সারা বাংলা দেশ জুড়েই তো এমন খুদে জমিদারের দেখা মিলত। আর তাঁদের দাপটও ছিল প্রচণ্ড। সেজন্য ঐ গল্পগুলিকে আঞ্চলিকতা-উত্থিত

বিশেষ গল্প বলে চিহ্নিত করা যায় না।

এ-ছাড়া মাঝি, ডাক-হরকরা, টহলদার, ওঝা প্রভৃতি নিম্নবর্গের চরিত্র কেবলমাত্র বীরভূম সমাজে লক্ষ্য করা যায়—এরকম সিদ্ধান্ত অতি সরল বলে মনে হয়। তবে এই সব চরিত্রের আবেগের তীব্রতা, চরিত্রের মধ্যে দোষ বা গুণের অতিরেক বীরভূমের রুক্ষ, কঠোর, দাবদাহ ও অন্যদিকে শস্যশ্যামল, সজল, উর্বর ভূ-প্রকৃতির প্রভাবজনিত কিনা—তা ভাবার বিষয়। কিন্তু "জলসাঘর"-এর গল্পগুলির চরিত্র ও কাহিনীতে এই দুই বিপরীত জলবায়ু, ভূগোলের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় না। এ ধরনের কাহিনী ও চরিত্র যে কোনও অঞ্চলেরই হতে পারে। কেবল উপভাষা প্রয়োগে কোন কোন গল্পে বীরভূমের ছোঁয়া পাওয়া যায়, যদিও তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিশেষ অঞ্চলের উপস্থিতি অনেক বেশী স্পষ্ট। কোন কোন সময় প্রকৃতি বর্ণনায় অবশ্য বীরভূমের নিসর্গ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেবল উপভাষার ব্যবহার ও প্রকৃতি বর্ণনায় সে অঞ্চলের বিরল রেখাচিত্র ফুটে উঠলে সে রচনাকে যথার্থ আঞ্চলিক অভিধায় বোধহয় চিহ্নিত করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। "জলসাঘব" তাই আঞ্চলিক গল্প নয় নিশ্চিত ভাবে সে বিচারে।

॥ ৪ ॥

"জলসাঘর"-এ বারোটি গল্প আছে। গল্পগুলিকে প্রধান পাত্র-পাত্রীর সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আমরা তিন থাকে সাজিয়ে নিতে পারি—উচ্চবর্গ কেন্দ্রিক, মধ্যবর্গ কেন্দ্রিক এবং নিম্নবর্গ কেন্দ্রিক।

উচ্চবর্গ কেন্দ্রিক : রায়বাড়ি, জলসাঘর, রাখাল বাঁড়ুজ্জে

মধ্যবর্গ কেন্দ্রিক : পদ্মবউ, মধুমাস্টার, খাজাঞ্চিবাবু

নিম্নবর্গ কেন্দ্রিক : ডাক-হরকরা, প্রতীক্ষা, তারিণী মাঝি, টহলদার, ট্যারা, নারী ও নাগিনী

মধ্যবর্গের পাত্র-পাত্রীরা মানসিকভাবে উচ্চবর্গ-অভিলাষী হলেও তারা আর্থিক ভাবে নিম্নবর্গেরই অন্তর্গত। উপরন্তু মধ্যবর্গের প্রধান চরিত্রগুলি শোষক বা শাসক নয়, তাদের মধ্যে কেউ চাকুরীজীবী, কেউ বা শুধুমাত্র পেট চলার জন্য পাঠশালা খোলে। তাই আমরা মধ্যবর্গকে স্বচ্ছন্দে নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এজন্য "জলসাঘর"-এ উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ কেন্দ্রিক কাহিনী ই মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে।

মাত্র পরিসংখ্যান সূত্রে জানা যাচ্ছে, তারাশঙ্করের পাল্লা নিম্নবর্গের দিকে ঝুঁকেছে বেশী। মধ্যবর্গকে নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত না করলেও নিম্নবর্গের গল্পের

সংখ্যা উচ্চবর্গ কেন্দ্রিক গল্পের সংখ্যার দ্বিগুণ। এতে লেখকের নিম্নবর্গের প্রতি পক্ষপাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্তত এ থেকে এটুকু বলা যায় যে, তিনি নিম্নবর্গ কেন্দ্রিক গল্প রচনায় বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। সেজন্যই কি বলা চলে তারাশঙ্কর উচ্চবর্গ সম্পর্কে অনীহ ছিলেন? প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য উচ্চবর্গ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কি ছিল, তা "রায়বাড়ি", "জলসাঘর" প্রভৃতি গল্প থেকে দেখা যেতে পারে—

ক. "রাবণেশ্বর রায় নামিতেছিলেন দোতলার সিঁড়ি বাহিয়া। নাটমন্দিরের আলোকমালার ছটার প্রাচুর্যে প্রজারা তাঁহাকে সভয়-বিস্ময়ে দেখিল। দীর্ঘাকার পুরুষ। খড়্গের মত দীর্ঘ নাসিকা, আয়ত চোখ, সর্বাঙ্গের মধ্যে স্থূলতার এতটুকু চিহ্ন নাই; কিন্তু সিংহের মত বলিষ্ঠ দেহ—প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটি। বয়স প্রায় চল্লিশ। পরিচ্ছদ ও ভূষণের মধ্যে পরনে গরদের কাপড়, কাঁধে নামাবলী, অনাবৃত বক্ষে শুভ্র উপবীত ও রুদ্রাক্ষের মালা, দক্ষিণ বাহুতে সোনার তাগায় একটা মোটা রুদ্রাক্ষ। হাতের অনামিকায় নবরত্নের একটি আংটি।" (জলসাঘর, পৃ ৪)

খ. "এদিকে নাটমন্দিরে আহার-তৃপ্ত ক্ষুধার্তেরা ঘন ঘন জয়ধ্বনি তুলিতেছিল—অক্ষয় হোক রায় হুজুরের রাজত্বি, অক্ষয় হোক; আমরা সুখে বেঁচে থাকি।" (ঐ, পৃ ১৮)

গ. "সেকালে—সেকালে কেন, দুই বৎসর পূর্বেও দেশ-দেশান্তরের পথচারী বাদশাহী সড়কের উপর প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়ার পিঠে মাথায় পাগড়ি-বাঁধা গৌরবর্ণ বীরবপু অশ্বারোহীকে দেখিয়া এ দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করিত, কে হে উনি?

লোকে বলিত, আমাদের রাজা উনি—বিশ্বম্ভর রায়। বড়দরের শিকারী, বাঘ মারা ওঁর খেলা।

অপরিচিত পথিক সসম্ভ্রমে চোখ তুলিয়া দেখিত, সাদা ঘোড়া তাহার আরোহীকে লইয়া দুরান্তরে মিলাইয়া গিয়াছে।..." (ঐ, পৃ ২০)

ঘ. "অতীতের স্মৃতি তারকারাজির মত বুকের আকাশে রায়বংশের মর্যাদার ভাস্কর প্রভায় ঢাকা পড়িয়া থাকে। আজ মমতার ছায়ায় সে ভাস্করে অকস্মাৎ সর্বগ্রাসী গ্রহণ লাগিয়া গেল।" (ঐ, পৃ ২১)

ঙ. "ঘরের মেঝের উপর রায়-গিন্নীর হাতবাক্সটা খোলা পড়িয়া ছিল। গর্ভ তাহার শূন্য। রায় নিজে ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন উন্নত শিরে। রায়বাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।** জলসাঘরের

আলোকের দীপ্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। আবার আসিয়া তিনি জলসাঘরে প্রবেশ করিলেন। শূন্য আসর। দেওয়ালের বুকে শুধু জাগিয়া আছেন রায়-বংশধরগণ।" (ঐ, পৃ ৩৭)

চ. "জানালা হইতে সে দেখিল—তুফানের পিঠে বিশ্বম্ভর রায়। পরনে চোস্ত, পায়জামা, গায়ে আচকান, মাথায় সাদা পাগড়ি। অন্ধকারে সম্পূর্ণ না দেখিলেও তারাপ্রসন্ন কল্পনা করিল—পায়ে জরিদার নাগরা। হাতে চামর দেওয়া চাবুক। তুফান নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল।" (ঐ, পৃ ৩৯)

চরিষ্ণু বিত্তশালী রাবণেশ্বর ও ক্ষয়িষ্ণু বিত্তহীন বিশ্বম্ভর—এই দুই জমিদারের আলেখ্য চিত্রণে সাধারণের মনে সম্ভ্রম জাগানোর চেষ্টা লক্ষণীয়, সেই সম্ভ্রম আবার ভয় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত সম্ভ্রম—"প্রজারা তাঁহাকে সভয়-বিস্ময়ে দেখিল", "অপরিচিত পথিক সসম্ভ্রমে চোখ তুলিয়া দেখিত"। সাধারণ মানুষের এই সভয়-বিস্ময়, সসম্ভ্রম হয়ত একজনকে বীর করে তোলে, যেন তিনি অন্য সকলের চেয়ে আলাদা উঁচু মাপের। রাবণেশ্বরের দৈহিক বর্ণনায় তো বটেই, এমন কি বিশ্বম্ভরের বর্ণনায় "গৌরবর্ণ বীরবপু" বলা হয়। মনে হয় এরা কোনও মহাকাব্যের নায়ক—যিনি ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন। আর এই বীরের পতন মহীরুহ পতনের মত করুণ বিহ্বল হয়ে ওঠে। এই কারুণ্য আরও তীব্র হয়েছে, যেহেতু শেষ পর্যন্ত রাবণেশ্বর ও বিশ্বম্ভর—উভয়েই একা। বজরাডুবিতে মারা গেছে রায়গিন্নী, বিশ্বেশ্বর, "গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে রব উঠিতেছিল, তারা—তারা—" (ঐ, পৃ ১৩), আর কলেরায় মারা গেল বিশ্বম্ভরের স্ত্রী পুত্র কন্যা কয়েক আত্মীয়, "শুধু বিশ্বম্ভর রায় বিন্ধ্যগিরির অগস্ত্য-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষার মত নতশিরে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।" (ঐ, পৃ ২৫)

পুত্রশোক, পারিবারিক শোকেও তাঁরা মুহ্যমান হন না, একা বট গাছের মত দাঁড়িয়ে থেকে সকল ঝঞ্ঝা বাত্যা সহ্য করেন। অন্য-আর এক ভাবে লেখক উচ্চবর্গের এক মহিমময় চিত্র তুলে ধরেন। রাবণেশ্বর বজ্রের মত কঠোর। তিনি বিনা দ্বিধায় "ছত্রিশ মৌজা কালো ক'রে" দিতে আদেশ করেন। অথচ তিনি-ই আবার ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাদের ক্ষতিপূরণ করতে এগিয়ে আসেন। "প্রজারা এবার সত্যই রাজার পায়ে গড়াইয়া পড়িল।" রাবণেশ্বরের মহিমা আবার প্রকাশ পায় বন্যার সময় সকলকে রক্ষা করার উদার আচরণে, জলসাঘরে গাঙ্গুলীর মেয়ের বিয়ের অনুমতি দেবার সময়। রাবণেশ্বর জমিদার হলেও তিনি প্রজাপালক, কঠোর হলেও কুসুমের মত কোমল! যথার্থ প্রজাপালক বলেই—"আহার-তৃপ্ত

ক্ষুধার্তেরা ঘন ঘন জয়ধ্বনি তুলিতেছিল—অক্ষয় হোক রায় হুজুরের রাজত্বি, অক্ষয় হোক ; আমরা সুখে বেঁচে থাকি।" আমরা টের পাই, তারাশঙ্কর উচ্চবর্গ জমিদারের প্রতি অনাহ তো ছিলেন-ই না। বরং সুযোগ পেলেই তাদের মহিমচিত্র তুলে ধরতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

এটা আরও স্পষ্ট হয় যখন তিনি বিশ্বম্ভরের বৈপরীত্যে স্থাপিত করেন মহিম গাঙ্গুলীকে—

ক. "আকাশের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শুকতারা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিম দক্ষিণ কোণে ওই তারাটির সহিত যেন দীপ্তির প্রতিযোগিতা করিয়াই এ অঞ্চলের হালে-বড়লোক গাঙ্গুলীবাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তিবিশিষ্ট একটি বিজলী-বাতি অকম্পিতভাবে জ্বলিতেছিল। ঢং-ঢং-ঢং করিয়া গাঙ্গুলীবাবুদের ছাদে তিনটার ঘড়ি এতক্ষণে পেটা হইল।" (ঐ, পৃ ১৯)

খ. "পূর্বে দুই শত বৎসর ধরিয়া এ অঞ্চলে ঘড়ি বাজিত রায়বাবুদের বাড়িতে, এখন আর বাজে না।" (ঐ, পৃ ১৯)

গ. "এ সমস্ত অতীত, কিন্তু স্মরণাতীত নয়। তাই এই জীর্ণ ফাটল-ধরা রায়বাড়ির নাম এখনও রাজবাড়ি, শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর রায়ের নামই এ অঞ্চলে রায়-হুজুর।" (ঐ, পৃ ২৫)

ঘ. "সেটুকুই হইল নূতন ধনী গাঙ্গুলীবাবুদের ক্ষোভের কারণ। তাহারা সোনার দেউল তুলিয়াছেন মরা-পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবী দেখে ওই মরা-পাহাড়কেই। সোনার দেউলের দিকে কেহ চায় না। তাঁহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধা হস্তিনীর খাতির বেশী।" (ঐ, পৃ ২৫)

ঙ. "গান শেষ হইবার মুখে মহিম ভদ্রতা করিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ-বাঃ ! নর্তকীর নৃত্যগতি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। গান শেষ করিয়া সে বসিয়া পড়িল। তরুণীটির সহিত মৃদু হাসিয়া কি কয়টা কথা বলিয়া এবার তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল।

দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। চপলগতির কণ্ঠসঙ্গীতে ও চটুল নৃত্যভঙ্গীতে যেন একটি পাহাড়ী ঝরনা আসরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারিফে তারিফে আসরের মধ্যে একটা কলরোল উঠিল। বিশিষ্ট শ্রোতামহল হইতে টাকা নোট রকশিশ আসিল।" (ঐ, পৃ ২৮-২৯)

চ. "রায় চোখ মুদিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। গানের দীর্ঘ মন্থর গতির সমতায় বিশাল দেহ তাঁহার ঈষৎ দুলিতেছে। থাকিতে থাকিতে তাঁহার বাম হাতখানি উদ্যত হইয়া পাশের তাকিয়াটির উপর একটি মৃদু আঘাত করিল।

ঠিক ওই সঙ্গে তবলাটির চর্মবাদ্য ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। রায় চোখ মেলিলেন. বাইজীর পায়ের ঘুঙুর মৃদু সাড়া দিয়াছে। নৃত্য আরম্ভ হইল।**

রায় বলিয়া উঠিলেন, বাঃ!

সঙ্গে সঙ্গে নর্তকীর নৃত্যমুখর চরণচাপল্য স্থির হইয়া গেল। ওদিকে তবলায় পড়িল সমাপ্তির আঘাত।" (ঐ, পৃ ৩৫)

ছ. "মহিম মুহুর্মুহু হাঁকিতে লাগিল, বহুৎ আচ্ছা।

রায়কর্তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিমের সঙ্গতি-ছাড়া উচ্ছ্বাস তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল।" (ঐ, পৃ ৩৬)

উদ্ধৃতিগুলি বিশ্বম্ভর ও মহিম সংক্রান্ত, সাজালে এ রকম হয়—

	বিশ্বম্ভর		মহিম
উদ্ধৃতি	খ	উদ্ধৃতি	ক
	গ		ঘ
	চ		ঙ

বিশ্বম্ভরের দিকে উদ্ধৃতিগুলির ভাষা মহিমের দিকের উদ্ধৃতি থেকে অনেক বেশী সহানুভূতিশীল, মনে হয় লেখক যেন লিখতে লিখতে নিমগ্ন হয়ে গেছেন। আর ছ উদ্ধৃতিতে স্পষ্টভাবে মহিমের চটুল আচরণের বিপরীতে বিশ্বম্ভরের সংযত আচরণের মধ্যে বংশপরম্পরাগত আভিজাত্যকেই শিরোপা দিয়েছেন লেখক। মহিমের হালকা চটুল আচরণ বিশ্বম্ভরের রাজোচিত গাম্ভীর্যের কাছে ম্লান হয়ে গেছে, আর আভিজাত্যহীন একপুরুষে বড়লোক ঐতিহ্যবাহী জমিদার-তনয়ের চেয়ে বিভবে সম্পদে অগ্রগামী হয়েও ধ্বস্ত হচ্ছে, ঈর্ষিত হচ্ছে। বিশ্বম্ভর যেন শুকতারা, তার পাশে মহিমের বিজলাবাতি কিংবা পেটা ঘণ্টার পাশে ঘড়ি, কিংবা হস্তিনী ছোটগিন্নীর পাশে দামী মোটরগাড়ি কেবল হেরে যাচ্ছে। তারাশঙ্কর নতুন উঠ্‌তি শ্রেণীকে ততটা সুনজরে দেখেন না বলে মহিমের চরিত্র হয়ে উঠেছে ভাঁড়ের মত—একরঙা। অথচ বাস্তবিক ভাবে মহিম-শ্রেণীর মানুষরা অনেক বেশী জটিল, কুশলী। একরঙা আঁকলে মহিমের চরিত্র তাই প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে না, বরং লেখকের পক্ষপাতের বিষয়টি প্রকট হয়ে ওঠে, বুঝতে অসুবিধে হয় না—তিনি কার পক্ষে। এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবে সুবোধ ঘোষের "ফসিল" গল্পটির কথা মনে পড়ে। "ফসিল"-এ সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শক্তির বিরোধের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে জটিল সূক্ষ্মতায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে। আর বিরোধের তীব্রতা শীর্ষে পৌঁছনোর মুখে উভয় শক্তির একটি সাধারণ সংকটে

উভয়ে কেমন অবলীলায় মিলিত হয়, তার ফলে কি ভয়ঙ্কর দুর্যোগ নেমে আসে সাধারণ মানুষের উপর, লেখক তা কৌশলে তুলে ধরেন। আর সমস্যাটিকে সমগ্রতায় দেখার চেষ্টায় সুবোধ ঘোষ অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেন, সেজন্য "ফসিল" তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী শিল্পীত আবেগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, উচ্চবর্গের প্রতি তারাশঙ্করের গভীর মমতা থাকলে তিনি কি করে রাখাল বাঁড়ুজ্জের মত লোভী শয়তান চরিত্র আঁকতে পারলেন, কারণ রাখাল জমিদার—হোক তার বার্ষিক আয় হাজার খানেক। কিন্তু রাখাল-কে হার মানতে হয় হৈমর কাছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েই হৈম বুঝতে পারে তার কোথায় ভুল হয়েছে, তাই দ্বিতীয়বার ভুল করার আগেই সে তার যাবতীয় সম্পত্তি মহাজন দত্ত-র কাছে বিক্রি করে দেয়। হৈমর যথারীতি জমিদারী না থাকলেও তার ছিল—"একশত বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি, কয়েকটি পুষ্করিণী বাগান" (ঐ, পৃ ১৪৬), তার উপর সে ব্রাহ্মণকন্যা। অতএব রাখাল হেরে যায় উচ্চবর্গের আর একজনের কাছে, যার ছিল প্রচুর জমি ও সম্পত্তি এবং উচ্চবর্ণের মেয়েও সে। হৈমর তেজ ও কৌশলের কাছে রাখালের পরাজয় তাই আমাদের সিদ্ধান্ত নাকচ করে না।

আমরা আগেই বলেছি, "জলসাঘর"-এ নিম্নবর্গ কেন্দ্রিক গল্পেরই সংখ্যাধিক্য। স্বাভাবিক ভাবে এ থেকে তারাশঙ্করের পক্ষপাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্ত্যজ, অচ্ছুৎ মানুষ তাঁর গল্পে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু নীচুতলার মানুষ গল্পের বিষয় হিসেবে গৃহীত হলেই যে লেখকের মমত্ব এদের প্রতি বেশী হবে, তা বোধহয় সর্বদা খুব সরলভাবে বলা যায় না। পরিসংখ্যান অনেক সময় বিভ্রমেরও সৃষ্টি করে।

তারাশঙ্কর নিম্নবর্গের কাহিনীতে যে সব প্রধান চরিত্র নিয়েছেন, তাদের দিকে একবার তাকানো যাক—

১. চন্দ্রমশায়—কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত (পদ্মবউ)
২. পরী—"আলো নয়—আলেয়া' (প্রতীক্ষা)
৩. মধুমাস্টার—আত্মভোলা, উদাসীন (মধুমাস্টার)
৪. তারিণী মাঝি—"অভ্যাস মাথা হেঁট করিয়া চলা। অস্বাভাবিক দীর্ঘ" (তারিণী মাঝি)
৫. খাজাঞ্চিবাবু—"চোখে ভাল দেখতে পান না" (খাজাঞ্চিবাবু)
৬. ট্যারা—"একটা চোখ ট্যারা আর অতি ক্ষুদ্র। দেখিয়া মনে হয় কানা। তাহার উপর জিহ্বার জড়তা (ট্যারা)

৭. খোঁড়া শেখ—"শুধু পাখানিই তাহার খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে—সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর !" (নারী ও নাগিনী)

উচ্চবর্গের তুলনায় এদের করুণ অবস্থার কথা স্পষ্ট হয়ে যায় সামান্য বর্ণনাতে। নিম্নবর্গের চরিত্রগুলি হয় মানসিক ভাবে না হয় শারীরিক ভাবে খর্ব এবং বিকৃত, যেন স্বাভাবিক হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, একটা খুঁত ঢুকে পড়ে কোনও এক রন্ধ্র দিয়ে তাদের শরীর বা মনে। অথচ তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দু-টি গল্প "তারিণী মাঝি" কিংবা "নারী ও নাগিনী"তে তার কোনও দরকার ছিল কি? তারিণী প্রেম ও আত্মরক্ষার যে অনিবার্য সংকটের মধ্যে পড়ে, তাতে অস্বাভাবিক দীর্ঘ হওয়ার কি কোনও প্রভাব আছে? বা, শেখের খোঁড়া হওয়া বিবির প্রতি ভালোবাসা বা জোবেদার মধ্যে ঈর্ষা জাগানোর কোনও অনুঘটক হয় কি? এদের দুজনে স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ হলে ক্ষতি ছিল কি?

অবশ্য সব গল্পেই এমন অ-স্বাভাবিক চরিত্র নেই। "টহলদার" গল্পের রামদাস সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ। সে দারুণ সদাচারী না হলেও অসৎ নয়। কিন্তু সে যে ভালো থাকতে পারে না—এমনই এক সিদ্ধান্ত উঠে আসে গল্প পাঠের পর। এতে অবশ্য আপত্তি করার কিছু নেই, কারণ মানুষ-ই অবস্থার চাপে বদলে যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যার কাজ টহল দেওয়া ও চোর ধরা, সে কেন চোরাই জিনিসের অংশীদার হয় জেনে শুনে? তার যন্ত্রটি পুরনো ও অকেজো হয়ে গেছে, তাই সে নতুন একতারা নিশ্চয় নিতে পারে। কিন্তু শশী চোরের কাছ থেকে তা নিলে তার অর্থ ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়, যেন সে শশীর কর্ম সম্পর্কে নীরব থাকবে বলে ঘুষ নিচ্ছে। আর রামদাস সেটা জেনে গ্রহণ করলে তাকে ঘুষখোরই বলা চলে। এবং তারই পরিণতি দেখি বেহালা চুরির ঘটনায়, অবশ্য এবার সে নিজের ছায়া দেখে ভয় পায়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, রামদাস চোরাই মালের অংশীদার হবে কেন? আর্থিক অভাব অনটন থেকে নিশ্চয় নয়, কারণ "এই টহলদারিতে রামদাসের চলিয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়িতে মাসিক একটা সিধার বন্দোবস্ত আছে।" আর রামদাস শশীকে স্পষ্টই বলে, "তোর পাপের ভাগ তো আমি নিতে পারি না।" তা সত্ত্বেও সে একতারাটি নেয়। তাহ'লে কি রামদাসের রক্তের মধ্যেই এক দুর্বলতা নিহিত আছে? এই দুর্বলতা সে অতিক্রম করতে পারে না কখনো? যেন লেখক বলতে চান, রামদাস-রা জন্মেছে লোভ, পাপ ইত্যাদি বুকে নিয়ে, যতই তারা চেষ্টা করুক, এ থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই।

তাই ট্যারাদের মধ্যে যতই মানবতাবোধ লেখক দেখান না কেন, মনে হয় এ যেন পিঠ চাপড়ানো ব্যাপার—আহা! কানা খোঁড়া হলে হবে কি, ওদের মধ্যেও মনুষ্যত্ব আছে! তথাকথিত সমালোচকরা এই সব গল্পে লেখকের নীচুতলার মানুষের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু তা যে কথার কথা সেটা উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের চরিত্র চিত্রণে লেখকের মমতার তর-তমে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। যে দরদ দিয়ে তারাশঙ্কর উচ্চবর্গদের আঁকেন, তার অনেকাংশই কোথায় হারিয়ে যায় নিম্নবর্গ চরিত্র চিত্রণের সময়।

আসলে তারাশঙ্কর যেখানে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন, সেখানে তিনি চরিত্রদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। নিজে জমিদার-সন্তান ও ব্রাহ্মণ, জমিদারী সংক্রান্ত কাজে তাঁর সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, অথচ সেই জমিদারী-প্রথা তখুনি ক্ষয়ের পথে। তিনি তা বুঝতে পেরেও নীল রক্তের আভিজাত্যকে ভুলতে পারেন নি, আর সেকাল সম্বন্ধে ছিল তাঁর এক অমানুষিক দুর্বলতা, "আমার কালের কথা"য় তিনি অকপটে সে কথা স্বীকার করেছেন। তাই জমিদারের চরিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি নিজেই ব্যক্তিগত ভাবে আলোড়িত মথিত হয়ে পড়তেন, চরিত্রর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে সর্বদা পেরে উঠতেন না। তাই সমস্ত আবেগ মমতা দিয়ে গড়ে ওঠে এই সব চরিত্র। ফলে তাঁর গল্পগুলি বিশেষ মুহূর্তে নাটকীয় না হয়ে অতিনাটকীয় হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে নিম্নবর্গদের তিনি দেখেছিলেন দূর থেকে—সেবাধর্ম কাজে, খাজনা আদায় করার সময় বা মেলায় ঘুরে ঘুরে। তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিশ্চয় দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের আত্মার আত্মীয় বা কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেন নি। তাই নিম্নবর্গ মানুষের প্রাথমিক আবেগই বেশী করে তাঁর চোখে পড়েছে—তাদের দুর্দান্ত আবেগ, যা প্রায় পশুর মত নির্বোধ, নিষ্ঠুর। হয়ত বীরভূমের রুক্ষ, রূঢ় মাটিতে জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে হলে এমন না হয়ে উপায় নেই, তবু ভাবতে ইচ্ছে করে এই সব ক্ষুধার্ত মানুষদের আরও অন্য পরিচয় আছে, যে পরিচয় খুব সরল ভাবে পাওয়া যায় না। কেন না তা প্রাথমিক পাশবতা অতিক্রম করে মানবিকতার আকাঙ্ক্ষা।

আবার সমাজও বদলে যাচ্ছিল, ফলে নিম্নবর্গের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সেই বদলের প্রভাব পড়তে থাকে। ভাগ্য মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষও পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। তাই খুব সহজ সরল ভাবে সেই আবেগ অনুভূতি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। তারাশঙ্কর জানতেন, দেশের দ্রুত পরিবর্তনের কথা, সেই সঙ্গে সমাজের পটভূমিতে গ্রামের পরিবর্তনের কথা। এমনকি পারিবারিক

জীবনে লাগে পরিবর্তনের ঢেউ। তা তিনি সঠিক বুঝেও ছিলেন। কিন্তু এ-সব বুঝেও "সে-কালকে শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নত-মস্তক" (তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খণ্ড, আমার কালের কথা, পৃ ১২২)—এই মনোভঙ্গীর মোহে তিনি পরিবর্তনকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন নি। একটা চলিষ্ণু সমাজ—তার ভাঙা-গড়ার কাহিনী কিংবা কেবলই তার ভেঙে-পড়ার কাহিনী তিনি প্রাক্তন ধারণা নিয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন—সেকালের চোখ দিয়ে একালের ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন, তাই সে ছবি বাস্তবের রক্তাক্ত তটে জীবন্ত হয়ে ওঠে না, বা গোটা অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দেয় না, অথচ নিম্নবর্গ কেন্দ্রিক গল্পগুলিতে তার দারুণ সম্ভাবনা ছিল।

তবু তারাশঙ্করের গল্প আমাদের নিবন্তর পাঠের বিষয় হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য নয়, তিনি গ্রামীণ সমাজের ভাঙা-গড়ার চিত্রটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন, আর নিম্নবর্গের মানুষদের গল্পের বিষয় করে তুলেছিলেন। তিনি অন্তত বুঝেছিলেন, এই মানুষরা আমাদের সভ্যতার পিলসুজ, এদের বাদ দিয়ে দেশকে বোঝা যায় না। অধুনা নিরক্ত শাহরিক গল্প-উপন্যাসের পাশে তাই তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও এখনও উজ্জ্বল লাগে।

কার্তিক লাহিড়ী